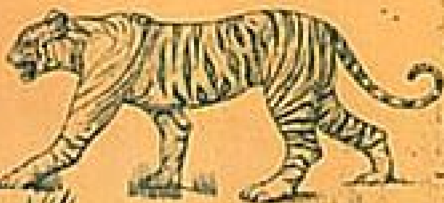
সুন্দরবনের আর্জান সর্দার

শিবশঙ্কর মিত্র



সুন্দরবনে আর্জান সর্দার

শিবশঙ্কর মিত্র

নাভানা

পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা ৭২

প্রকাশক :
শ্রী কুনালকুমার রায়
নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট
কলকাতা ৭২

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

মুদ্রক :
শ্রী রণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী

মুক্তি ও তান্তিয়াকে

এক

ভৈরব! নাম শুনলে এক সময় হয়ত আতঙ্ক জাগত। সে ভৈরব এখন আর নেই। ভৈরব নদ এখন শীর্ণকায়। খুলনা শহরের ঘাট থেকে ভৈরবে নৌকা ছেড়ে দিয়ে রোমাঞ্চ লাগছিল। এই রোমাঞ্চ নদীর জন্য নয়। নদীবহুল দেশের মানুষ আমরা। এই ভৈরবের কূলেই মানুষ হয়েছি। কাজেই এই নদীযাত্রায় কোনও ভয়, বিহ্বলতা বা রোমাঞ্চই ছিল না।

রোমাঞ্চের কারণ ছিল ভিন্ন। ইতিমধ্যে দেশের উপর দিয়ে বিদ্রোহের বন্যা বয়ে গেছে। বিদেশী ইংরেজদের মেরে তাড়াতে হবে এদেশ থেকে। তারই আগুন জ্বলে ওঠে ১৯৩০ সালে বাংলা দেশে। সেই আগুনে জড়িয়ে পড়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। তখন বয়স মাত্র বিশ বছর। সংসারের কোনও দায়-দায়িত্ব ছিল না, বললেই হয়। আট বছর পরে দেশে ফিরে দেখি, সংসারের সকল দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে। সেই সূত্রে খুলনা জেলার দক্ষিণে আবাদ অঞ্চলে আমাদের যে একখণ্ড পতিত জমি পড়ে ছিল, তারই আবিষ্কার ও উদ্ধারের কাজ এসে পড়ে।

এই জমিটুকু কোথায় তার ঠিকানা জানা ছিল, তার চৌহদ্দিও জানা ছিল। কিন্তু কোন্ পথে যেতে হবে, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আত্মীয়-স্বজন যাকেই প্রশ্ন করি, তাঁরা বলেন,—সে জমি তো সুন্দরবনে। তুমি পারবে না কুলকিনারা করতে!

পথের অনিশ্চয়তা, আর গন্তব্য স্থান সুন্দরবন,—এই দুইয়ে মিলে মনের মাঝে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে। আমাদের ছোট্ট নৌকাখানি ভাটির

টানে দক্ষিণমুখে এগিয়ে চলল। সঙ্গে আমার বৃদ্ধ খুল্লতাত, আর মাঝি ও তার বারো বছরের ছেলে! সঙ্গে সাত-আট দিনের চাল-ডাল নেওয়া আছে। কদিনে সেখানে পৌঁছব তার ঠিক নেই, কেউ বলল তিন দিন, কেউ বলল চার দিন ; আবার কেউ বা বলল, সাত দিন।

কদিন লাগবে তার কথা ভাবতে মন চাইছে না। আপাতত মনের মধ্যে শুধু চাল্‌না। চাল্‌না খুলনা শহরের সোজা দক্ষিণে। নামকরা বাজার। হাটের দিন এখানে নাকি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। চাল্‌না পরিচিত স্থান। ষ্টীমার ষ্টেশনও এখানে আছে। দূর দূরাঞ্চল থেকে এখানে লোক জমা হয়। মনে ভরসা —এখানে পৌঁছলে পথের সন্ধান নিশ্চয় মিলবে।

খুলনা আধুনিক শহর। তারই দশ মাইলের মধ্যে এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। নদীর দুপারে মাঠ আর মাঠ। সাত আট মাইল অন্তর ছোট ছোট এক একটা গ্রাম দেখা যায় কি যায় না। বহু কষ্টে হয়ত এক আধটা মানুষ চোখে পড়ে।

ভাটির টানে নৌকা ভৈরবের পর রূপসা নদী বেয়ে সাঁ সাঁ করে চলেছে। মাইলের পর মাইল চলেছি। সকাল থেকে নৌকা চলেছে। মাঝে জোয়ার এলে নৌকা এক ঘাটে থেমে থাকে। ভাটি আসতেই আবার যাত্রা শুরু হলো। সন্ধ্যা পার হলে আমরা চাল্‌নায় এসে যাই। পশর নদীর কূলে চাল্‌নায় আসতেই মনে নতুন করে ভরসা এলো।

আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে আছি : এমন দেশে দুএকজনকে মাত্র জিজ্ঞাসা করলে হবে না। ছেলেবেলা থেকে এদেশের ডাকাতির গল্প অনেক শুনেছি। এ পর্যন্ত যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে,— এই অঞ্চলে ডাকাতি করা অতি সহজ! চারদিকে নদী ও খাল,— মাঠ ধূ ধূ করছে। জনমানব নেই।

সেই জন্যই প্রায় দশজনকে জিজ্ঞাসা করলাম পথের কথা। যাতে কোনও ভুল পথে চালিত না হই। মোট কথা যা বুঝে নিলাম তাতে

আমাদের চুনকুড়ি দিয়ে ভদ্রা নদীতে পড়তে হবে, তারপর ঢাকি খাল দিয়ে শিবসা নদীতে পড়তে হবে। তারপর হড্ডা নদী।

ঢাকির কথা শুনতেই খুল্লতাত বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শুনেছি ঢাকির মুখে শিবসা 'নলছ্যাও' দিতে হয়।

কিন্তু তারপর! তারপর আর কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারে না। তবে 'ডাক্তারের আবাদে'র নাম বলতে বলল। এই আবাদের কাছে আমাদের গন্তব্য স্থান হবে বলে তাদের বিশ্বাস। সকলেই উপদেশ দিল, ভাটির স্রোতের যেটুকু বাকি আছে তাতে এখনই যাত্রা করে দাকোপে পৌঁছে থাকতে। দাকোপ পরবর্তী হাট। সেখান থেকে পরদিন জোয়ার ধরে এগিয়ে শিবসা নদী ভাটির টানে পার হতে হবে।

সকলের উপদেশ মেনে নিয়ে রাত্রে চুনকুড়ি ধরে এগিয়ে চললাম। সবাই ভরসা দিয়েছিল, কোন ভয় নেই। এই নদীতে প্রায়ই ষ্টীমার ও নৌকার দেখা পাবে। সুন্দরবন পথে যে-সব মালবাহী ষ্টীমার যাতায়াত করে, তারা এই ছোট নদী দিয়ে সোজা পথ ধরে।

ওরা ঠিকই বলেছিল। একের পর এক মালবাহী ষ্টীমার আসতে থাকে। তাদের প্রত্যেকের দুই পাশে দুই গাধাবোট বাঁধা। তাদের গতি মন্থর—তাই জল কেটে যাবার ঢেউ কম। কিন্তু আপাদ-মস্তক বোঝাই জাহাজকে ঠেলে নিতে ষ্টীমারের চাকা মাঝ-নদীর জল তোলপাড় করে চলেছে। ঘোড়ার খুরে ধুলো বেশি ওড়ে বটে, কিন্তু গজেন্দ্র গমনে পথ কেঁপে ওঠে। এও যেন তেমনি। তবুও কূল দিয়ে গেলে বিশেষ ভয় ছিল না।

তাহলে কি হবে! চুনকুড়ি যে বড়ই ছোট। কূলে কূলে সামাল দিয়ে চলেছি। ঘোর অন্ধকার অন্য নৌকা আশেপাশে একখানাও নেই। ভাটির সময়। নদীর জল বেশ নিচে নেমে পড়েছে। তীরে মাঠ কি গ্রাম, তা নৌকা থেকে কিছুই অনুমান করা যায় না। মাঝে মাঝে এক একখানা মাল বোঝাই জাহাজ তীব্র সার্চ লাইট ফেলে চলেছে। এদের ঢেউয়ে নৌকা দুলছিল। বেশ জোরেই দুলছিল। তবুও নিশ্চিন্ত

ছিলাম—মাঝি বৃদ্ধ হলেও ঢাকাই মাঝি। এরা এদেশে পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে এসেছে। ঢাকাই মাঝির হাতে হাল দিয়ে নির্ভয়ে থাকা যায়।

এমন সময়ে এক সঙ্গে দুদিক থেকে নৌকার উপর সার্চ লাইটের ঝিলিক দিল। সবাই প্রমাদ গণলাম। এতটুকু নদী, গাধাবোট বাঁধা দুই জাহাজ কি করে পাশ কাটিয়ে যাবে! মাঝি নৌকা বেশ কূলেই রেখেছিল। তবুও সাবধানীর মত আরও কূলে নেবার জন্য বললাম।

মাঝি বলল,—না বাবু, আর না। বেশি ধারে গেলে জাহাজের ঢেউ কূলে আছড়ে নৌকা ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে।

সোঁ সোঁ করে জাহাজ দুটি আমাদের কোনমতে পাশ কাটাল। প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল। বিনা সংঘর্ষে যখন পাশ কাটিয়ে গেল, নিশ্চিন্ত মনে নিঃশ্বাস ফেললাম—যাক্, বাঁচা গেল। কিন্তু…………

কিন্তু বলার অবকাশ রইল না। ষ্টীমার পাশ কেটে যেতে না যেতে তোলপাড় করা ঢেউ এসে নৌকার এক মাথা স্বর্গে তুলে ঝপাং করে আবার নিচে ফেলে দিল। তবু নৌকা ডোবে না। পদ্মানদীর মাঝি ঠিকভাবেই নৌকার মুখ রেখেছিল।

খুল্লতাত চিৎকার করে উঠলেন,—মাঝি নেই! মাঝি নেই!

সত্যই মাঝি নেই। চিন্তার অবকাশ না দিয়ে দ্বিতীয় ঢেউ এসে নৌকার উপর জলের ঝাপটা মারল। মাঝির ছেলে মরণ চিৎকার করে নৌকার ছই জাপটে ধরেছে। খুল্লতাত হতভম্ব। ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। আর বোধহয় রক্ষা নেই। নৌকা জলে ভর্তি। কোন রকমে ভাসছে। আর এক ঢেউয়ে নৌকা তলিয়ে যাবে।

ভরসা ছিল, নৌকা কূলের ধারে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকা সাঁতরে টেনে নিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পদ্মানদীর মাঝির কথাটাই মনে ছিল—নৌকাকে কূলে আছড়ে ভাঙতে দেব না।

পদ্মানদীর মাঝিই বটে! ঢেউয়ের তোলপাড় কমতে না কমতেই সাঁতরাতে সাঁতরাতে এসে হাজির।

কি হয়েছিলো, প্রশ্ন করলে মাঝি হাঁপ নিয়ে বলল,—আর বলেন কেন,—যেন কুলোতে টোকা দিয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল!

ধীরে ধীরে নদীর ঢেউ মিলিয়ে গেল। সবই ভিজে গেছে,—বিছানাপত্র, চাল ডাল সবই। নৌকার জল ছেঁচে সব ঠিকঠাক করে আবার আমরা যাত্রা করলাম দাকোপের উদ্দেশে।

দাকোপে কিছু লোকজন ও নৌকা ছিল। দুপুর রাত্রেই দাকোপে আসি। পরদিন সকালে রোদে বিছানাপত্র কাপড় চোপড় শুকিয়ে নিয়ে আবার রওনা হলাম শিবসা নদী পার হতে।

ভদ্রা ও শিবসাকে সংযোগ করেছে ঢাকি নদী। ভদ্রা নদী কুমিরের জন্য বিখ্যাত। সুনামটা যে মিথ্যা নয়, তা বুঝতে বাকি রইল না। দাকোপের লোকালয় ছাড়াতেই দেখি, চরের ওপর মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। নৌকা কাছে গেলেই তারা জলে নেমে পড়ে। বেশ বুঝলাম, সুন্দরবনের কাছে এসে পড়েছি।

ভদ্রার চার বাঁক এগুলে ঢাকি নদী। খালের মত ছোট নদী। খুবই শান্ত। দুপাশে মাঝে মাঝে সুন্দরবনের চাষীর ঘর। ঢাকি নদী শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এলো।

সামনে শিবসা। বিরাট এই নদী। এপার ওপার পাঁচ মাইলের বেশি। জলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনেই পদ্মানদীর মাঝি বলল,—বাবু! ভারি নদী! গহীন গাঙ!

এপার ওপার প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সূক্ষ্ম একটি মাত্র সবুজ রেখা দেখা যায়। কোনাকুনি 'নলছ্যাও' দিয়ে পার হতে হবে। ছোট্ট নৌকায় এই জলরাশিকে পার হতে আঁতকে উঠতে হয়।

পদ্মানদীর মাঝি শিবসা নদীর জল জোড় হাতে তুলে গলুইতে ছিটিয়ে 'বদর বদর' বলতে বলতে নৌকা স্রোতের টানে ভাসিয়ে দিল।

ওপারে যেখানে সুন্দরবন শুরু হয়েছে সেখানেই হড্ডা নদী। হড্ডা বরাবর সুন্দরবনের উত্তর সীমানা ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে।

শিবসা নদীর প্রায় মাঝখানে এলে সুন্দরবনের রেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। গাঢ় সবুজ রেখা।

এপারে দূরে 'নলেন' ফরেষ্ট আপিস দেখা যায়। ঘাটে তাদের সাদা সাদা বোট আর ছোট্ট একখানা লঞ্চ। দেখলেই চেনা যায়, এটি বন-আপিসের লঞ্চ। লাল্‌চে রঙ। এদের হুইসেল বাঘের মত ডেকে ওঠে। ছেলে বেলায় এদের ডাক শুনে কত মনে করেছি—এরা বাঘের রাজ্যে থাকে কিনা তাই বাঘের মত ডাকে।

দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল বন। নৌকার উপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। ছেলেবেলার কত স্বপ্ন, কত রোমাঞ্চ জড়িয়ে আছে এই বনের নামে। বাঘের গর্জন, হিংস্র সাপের উদ্যত ফণা, কুমিরের তীক্ষ্ণ দাঁতের বিরাট মুখ-ব্যাদান, হরিণের আর্তনাদ, মানুষের অসহায়তা—সবই যেন চোখের উপর ভেসে উঠল। এই কি সেই বন!

বিকেলের দিকে নৌকা বনের ধারে এলো। একেবারে কাছে। ব্যগ্র হয়ে দেখতে চাইলাম প্রতিটি গাছ। কি পরিষ্কার আর কি শান্ত এই বন। একটি পাতার শব্দ হলেও চম্‌কে উঠতে হয় হিংস্র বাঘের আশঙ্কায়।

হড্ডা নদী বেয়ে পশ্চিমে চলেছি। বাঁ দিকে সুন্দরবন আর ডানদিকে ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে দু-একখানা ঘরবাড়ি দেখা যায় কিন্তু কোনও মানুষের সঙ্গে দেখা নেই। হড্ডাকে নদী না বলে, বড় খালই বলা উচিত ছিল। খুবই ছোট নদী।

সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে বেয়ে চলেছি। কিসের ভয় করব, যেন জানি না। বাঘ, না কুমির, না সাপ, না ডাকাত, না খুনীর! তাই আমরা বেপরোয়া। বেপরোয়া না হয়েই বা উপায় কি!

কিছুক্ষণ পরে জলে ছপ্‌ ছপ্‌ করে কি যেন আসছে। সামনে নদীর একটি বাঁক। তারই ওপার থেকে শব্দ আসছে। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। সবাই প্রতীক্ষায় রইলাম।

বাঁক ঘুরতেই দেখি, একখানা ছোট ডিঙি করে কয়েকজন আসছে। খুল্লতাত চুপি চুপি বললেন,—আগুন চাইলে বলবি, নেই।

—বাড়ি কোথায় ?

উত্তর দিলে আবার ওরা প্রশ্ন করে,—কোথায় যাওয়া হবে ?

কথায় কৃষকের মমতা। উত্তর পেয়েই ওরা সোজা চলে গেল।

'ডাক্তার-আবাদ' কতদূর জিজ্ঞাসা করলে দূর থেকে চিৎকার করে জানায়,—বেনেখালি আপিস সামনেই।

এবার নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললাম,—কই ওরা তো আগুন চায়নি ?

খুল্লতাত অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া ডিঙির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সেই দিকেই মুখ রেখে বললেন,—ওরা ডাকাত না, তাই আগুন চায়নি।

কয়েক ঘণ্টা পরে বেনেখালি আপিসে আসতেই বুঝলাম, ডিঙির লোকেরা কেন বেনেখালির কথা বলেছে। এইখানেই আজ রাত কাটাতে হবে। কাল ভাটির টানে আবার মৈঁশেলী নদী ধরে এগুতে হবে। বেনেখালি খানিকটা জমাটি। বেশ কিছু লোকজন ও নৌকাও আছে।

রাতটা বেশ কেটে গেল। ওপারেই বন ; এপারেও কিছু গাছ-গাছড়া আছে, তবে ফাঁকা গাছের আড়াল থেকে খোলা মাঠের আকাশ দেখা যায়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাঘের ডাক শুনব আশা করেছিলাম। কিন্তু একবারও শুনতে পাইনি। তবে হরিণের ডাক অনেক শুনলাম।

পরদিন মৈঁশেলী নদী বেয়ে চলেছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এবার আমরা দক্ষিণমুখী। সুন্দরবন বাঁ-দিকেই আছে। বেনেখালির লোকের উপদেশ ছিল,—বরাবর বাঁ-দিকে সুন্দরবন রেখে এগিয়ে যাবে। মাঝ-পথে অনেক নদী-খাল এসে মিশেছে দেখবে। কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য দিও না, বাঁ-দিকে বন রেখে এগিয়ে গেলে ঠিক কয়রা নদীতে পড়বে। এই কয়রা নদীতেই ডাক্তারের আবাদ।

উপদেশমত বাঁ-হাতে বন রেখে এগিয়ে চলেছি। সন্ধ্যারাত্রের অন্ধকারে বনকে চিনে চিনে চলেছি। সব কিছু ভুলে গিয়ে একমাত্র

চিন্তা—বাঁ-হাতে যেন বন থাকে। এত পথ এলাম, কোথাও কোনও ঘাট বা বাজার পাইনি। নিশ্চিন্ত মনে রাত কাটাবার স্থান পাইনি। কাজেই রাত্রেই ডাক্তারের আবাদে পৌঁছতে হবে, এই আমাদের পণ।

চারদিকে অন্ধকার। নৌকাতেও ঢাকাই মাঝি আলো জ্বালাতে দেয়নি। নৌকায় আলো জ্বালালে দূরের কিছুই দেখা যায় না।

এমন সময় ব্যাঘ্র-গর্জন! মনে হল, আওয়াজ যেন পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরুচ্ছে। আওয়াজে দেহ কেঁপে উঠল। খুবই কাছে; মনে হল, আমাদের লক্ষ্য করেই যেন এই গর্জন!

—বা'জান্!—মাঝির ছেলে ডেকে ওঠে।

—ভয় নেই·· ··নৌকা ওপারে দিচ্ছি!—বুড়ো মাঝি সাহস দিয়ে বলে।

আমরাও নৌকার বাইরে এসেছি। এপারে নৌকা আসতেই আমিও ভয়ার্ত হয়ে বেশ জোরেই বললাম, —মাঝি! কি করেছ, ঐ যে এপারেও বন! দুপারে বন! কি করেছ! কোথায় চলেছ?

বলতে না বলতেই এই পারে একপাল জন্তু বনের মধ্যে ছুটে পালাল।

চিৎকার করেই বললাম, —শীগগির্ মাঝ-নদীতে চলো! দুপাশেই যে বন!

—কিন্তু,······মাঝি যেন কি বলতে চাইছিল। আমার ভয়ার্ত চিৎকারে পদ্মানদীর শান্ত মাঝি সে-কথা না বলেই নৌকা মাঝ-নদীতে নিয়ে এলো।

এবার তার কথা সে ধীরে ধীরে বলে,—কিন্তু বাবু! মাঝ-নদীতে স্রোতের টান বড় বেশি। স্রোতে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ঠিক নেই!

মানচিত্রের কথা মনে করে আরও আতঙ্কিত হলাম। সত্যিই তো বঙ্গোপসাগর এখান থেকে তো বেশি দূর নয়! লোকালয় ছাড়ালে বন; বনের পরেই সাগর!

মাঝি ততক্ষণে স্রোতের বিপরীতে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ধরেছে। বলল,—বাবু! আপনাকে দাঁড় ধরতে হবে।

মনে সংশয় নিয়ে বললাম,—কিন্তু এভাবে তুমি বে-গোনে কি করে এগুবে?

—নাই বা এগুলাম! আমাদের নৌকা অন্ততঃ সাগরের দিকে বেশি দূর ঠেলে নিতে পারবে না।

তারপর চললো আমার ও খুল্লতাতের পালা করে দাঁড় টানা। আমাদের সর্বশক্তি অগ্রাহ্য করে স্রোতের টান আমাদের দক্ষিণে নিয়েই চললো। ক্রমেই গভীর অরণ্যে চলেছি। তবে নৌকার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে চলেছি, বেশ অনুভব করলাম। বাঘের গর্জন এবার দুপাশেই শুরু হয়েছে। অন্য জীবজন্তুর বিশেষ সাড়া নেই। শুধু একবার বন্য শূকরের বিকট চিৎকার কানে এলো।

শীতের রাত্রি। তবুও পরিশ্রমে ও আশঙ্কায় সারা দেহে ঘাম ঝরছে। রাত্রি তখন দুটো। ভাটির টান পড়ে এসেছে। ভরসা এলো মনে। নদী ক্রমশঃ চওড়া হলেও দুপারে বনের স্পষ্ট রেখা বেশ আঁচ করা যায়। সাগরের মুখে এখনও আসিনি। ধীরে ধীরে জোয়ারের টান এলো। দাঁড় ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে যেন আরামে বসলাম। নৌকা এবার উত্তরদিকে আপনা থেকে এগিয়ে চলেছে। কয়রা নদীর মুখে কখন আসব, উৎসুক হয়ে তাই ভাবছি।

—বাবু! বাবু!—এবার পদ্মানদীর মাঝির মুখেও যেন ভয়-বিহ্বল সুর।

—এখনই আমাদের তীরে যেতে হবে। জোয়ার এসেছে! লোনা পানির জোয়ার!—আশঙ্কা-বিহ্বল-কণ্ঠে বলে ওঠে।

যে-মাঝি কোন দিন ভয়কে ভয় মনে করে না, তাকে ভীত হতে দেখে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। প্রতিবাদও না। এবার তীরে! বাঘের রাজ্যেই উঠতে হবে!

তীরে এসে নৌকা ভিড়তে না ভিড়তেই দেখি, দশ হাত পরিমাণ উঁচু হয়ে সাঁ সাঁ করে জোয়ারের জল ছুটে আসছে। লগি পুঁতে মাঝি নৌকা বাঁচাবার নানা কায়দা করল। বাঘ কাছে আছে কি না আছে, আক্রমণ করবে কি করবে না --সে-প্রশ্ন পরে। আপাতত জোয়ারের বান থেকে বাঁচতে হবে।

পরপর কয়েকটা বান এলো। আমরা বেঁচেই রইলাম। নৌকাও রক্ষা পেলো। তবে দেহের শক্তি একেবারে নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েছে।

শান্ত নদীতে এবার জোয়ারের টান। মাঝিও শান্ত হয়ে যেন বলে, —সবাই এবার আরামে বসতে পারেন। -ছেলেকে তামাক সাজতে বললো। তীরের বেগে নৌকা ছুটলো বাঘের রাজ্য ছেড়ে মানুষের রাজ্যে —বাদা ছেড়ে আবাদ অঞ্চলে।

ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। কি অপরূপ দৃশ্য বনানীর! যেন নদীর দুধারে সাজান বাগান। পশ্চিম পারে চরের উপর হরিণের পাল দেখা যায়। শীতের ভোরে তারা এসেছে রোদ পোয়াতে। গাছে গাছে বানরের দলও লাফালাফি শুরু করেছে।

'মা--ঝি!······মা —ঝি!'—গভীর অরণ্যে মানুষের গলা! তবে কি সুন্দরবনে বন্য-মানুষ আছে? আবার ডেকে ওঠে,- —মা —ঝি··· মা—ঝি!

দেখি, ছোট একটি মানুষ বনের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে হাত ইশারা করে ডাকছে। কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা মনে পড়ল। তবে কি সেই কাপালিক আজও বেঁচে আছে! আজও সে ঘুরে বেড়ায় সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে নরবলির সন্ধানে! নৌকা বেশ জোরেই চলছিল। ওর ডাকের কোনও সাড়া না দিয়ে সবাই মিলে তাকিয়ে দেখছিলাম।

কারও মুখে কোনও কথা নেই। মাঝি একবার আমার দিকে তাকাল, আমার মত জানবার জন্য। মনে মনে আমার ইচ্ছা ছিল, এড়িয়ে যাওয়া—কি জানি কি বিপদে পড়ি!

নৌকা ওকে ছাড়িয়ে চলে যায় দেখে বনের মানুষ নিচু

হয়ে কি একটা জিনিস তুলে নদীর চর ধরে নৌকার সঙ্গে এগুতে লাগে।

এবার তার গলায় আদেশের সুর। চিৎকার করে বললো, —নাও ভেড়াও !······ভেড়াবে না ?······শীগ্‌গির ভেড়াও।

ভাল করে চেয়ে দেখি, ওর হাতে বন্দুক ! মাঝি নৌকা ভিড়িয়ে দিলো। কাছে আসতেই দেখি, কাপালিকের চেহারার কোনই সাদৃশ্য নেই। রক্ত তিলক চিহ্নিত, দীর্ঘ কপাল সমন্বিত, প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, তেজদৃপ্ত চেহারা,—কিছুই না ! অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, সুন্দর শান্ত চেহারার মানুষ। মুখে বিরাট একজোড়া তামাটে গোঁফ। থুতনিতে ছোট করে কাটা পাতলা পাকা দাড়ি। মাথায় বড় বড় আধ-পাকা চুল। দীর্ঘ কপাল। অভিজ্ঞ জীবনের তিনটি স্পষ্ট বাঁকা রেখা যেন কপালে খোদাই করা। ছোট্ট দেহ। সুঠাম কিন্তু সবল নয়। চোখে কোনও চঞ্চলতা নেই, কোনও কপটতা, কোনও হিংস্রতা নেই। শান্ত স্থির দুটি বড় বড় চোখ। অপলক দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে না আছে শঙ্কা, না আছে বিস্ময়। গায়ে গামছা। পরনে লুঙি, আঁট করে পরা।

কথা নেই বার্তা নেই, নৌকার উপর বন্দুকটি রেখে এক ধাক্কা মেরে নৌকা ভাসিয়ে গলুইতে বসে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করল আমাদের,—কোথায় যাবেন ?

বললাম,—ডাক্তারের আবাদে।

শুনেই বলল,—ও ! আমিও তো সেখানকার লোক ! চলুন ! কিন্তু আপনারা এই বাদায় এলেন কি করে ?

আমাদের বিপদের কাহিনী সব বলে জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার নাম কি ?

—আর্জান সর্দার।

—বনে তুমি একা একা ছিলে ? তোমার দলে আর কেউ আছে ?

—না বাবু, আমি একাই।

—রাত্রে এমন ভাবে বনে কেন ?

—হবে বাবু, সে কথা পরে হবে !

এই ছোট শান্ত অথচ দুর্জয় মানুষটি চিনবার চেষ্টা করেছি এর পর দশ বছর ধরে। আর্জান আমার জীবনের এক আবিষ্কার। ধারণা ছিল, শিকারীর কাছে ভাল গল্প শোনা যায়। তাতে আবার বৃদ্ধ শিকারী,—গল্প বলতেই হয়ত ভালবাসবে। কিন্তু আর্জান গল্প করতেই জানে না। গল্প করার মত ঘটনাও সে মনে রাখে না। তবুও আর্জানের সঙ্গে ঘুরেছি দশ বছর, তার জীবনের কাহিনী শুনবার জন্য। ঘুরেছি তার সঙ্গে হাটে, মাঠে, ঘাটে,—ঘুরেছি বনে বনে—সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে। ঘুরে বেড়িয়েছি আর্জানের সঙ্গে হরিণ-শিকারে, বাঘের সন্ধানে। হয়ত বা, গভীর বনে ঘুরতে ঘুরতে তার কোন পরিচিত স্থানে হাজির হলে সেই বনের একটা পুরনো ঘটনা তার মনে পড়ে যায়। সরলভাবে বিনা আড়ম্বরে ঘটনাটি বলে।

হয়ত বা একটা হরিণ বা বাঘ নতুন করে শিকার করলে পুরনো একটা শিকারের অবাক্ করা ঘটনা তার মনে পড়ে যায়। আগ্রহ দেখালে ঘটনাটি তখন অল্প কথায় বলে যায়।

তারই বলা সেই সব বিক্ষিপ্ত কাহিনী একত্রিত করে আর্জানের এই জীবন-উপন্যাস। এই জীবন-উপন্যাসের কোনও ইতি টানতে পারিনি। আজও আর্জান জীবিত। আজও হয়ত সত্তর বছরের আর্জান নিঃশব্দ পদচারণে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় রাতে ও দিনে। হয়ত সুঠাম দেহে লোল চর্ম দেখা দিয়েছে, হয়ত তার নিশ্চিত পদক্ষেপ স্খলিত হয়ে এসেছে, হয়ত তার অব্যর্থ তর্জনি আজ কেঁপে ওঠে বন্দুকের ঘোড়ার সামনে, তবুও এই ছোট্ট দুর্জয় মানুষটি আজও হয়ত ঘুরে বেড়ায় মাথায় গামছা জড়িয়ে, হাতে বে-পাশী বন্দুক ঝুলিয়ে, স্থির সন্ধানী ও অপলক দৃষ্টিতে—সুন্দরবনের রন্ধ্রে, ব্যাঘ্রের 'আঁটি' ও ঘাটির সন্ধানে।

দুই

সুন্দরবনের চাষীর বাড়ি। গরীব চাষীর বাড়ি। গরীব হলেও অন্নের অভাব তখনও দেখা দেয়নি এই চাষীর বাড়িতে। শীতের সন্ধ্যায় গোবর দেওয়া ঘর ও উঠান তক্‌তক্‌ করছে।

এই উঠানের পাশে একটি বেশ পুরনো হেঁতাল গাছ। সন্ধ্যা হতেই মা এসে একটা প্রদীপ জ্বেলে দিলেন এই গাছের তলায়।

আর্জান পাশেই ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল। ছেলেবেলা থেকে আর্জান মাকে এমনি আলো দিতে বহুবার দেখেছে। নামাজ পড়াও যেমন রীতি ছিল তাদের সংসারে, তেমনি এই আলো দেওয়াও এই সংসারের রীতি। কিন্তু আর্জানের এখন প্রশ্ন করবার বয়স হয়েছে। মাকে সে শুধায়,...

—আম্মা, হেঁতাল গাছে রোজ বাতি দাও কেন ?

—তুই জানিস নে। না দিলে গুনা হয়।

—কিসের গুনা ?

—গুনা আবার কিসের ? গুনা হয়, তাই বাতি দিতে হয়।

—না আম্মা, তোমায় বলতে হবে। কই আর কোন বাড়িতে তো হেঁতাল গাছে বাতি দেয় না !

মা আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। কিন্তু আর্জান নাছোড়-বান্দা। শেষ পর্যন্ত তার মাকে রাত্রে শোবার সময় এই হেঁতাল গাছের কথা বলতেই হলো।

শীতের রাত্রি। ঘোর অন্ধকার। পাশের ঘরে চাচির মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে খামার ঘরে টেমি জ্বালিয়ে ধান মাড়াই হচ্ছে। সেখান থেকে গরু তাড়াবার আওয়াজ মাঝে মাঝে আসছে। এ ছাড়া এই কয়েক ঘর লোকের গ্রামে কোনও সাড়াশব্দ নেই। মাটিতে মাদুরপাতা বিছানায় আর্জান কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে আছে।

কাছেই মা কেরোসিনের কুপির পাশে বসে। মার ছায়া পড়ে বাকি ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মা আস্তে আস্তে আর্জানের মাথায় হাত দিয়ে বললেন :

—শুনতে চাস্ ? সে অনেকদিন আগের কথা,…দশ বছর আগের কথা। তোর বয়স তখন দুই বছর। তখন শীত শেষ হয়ে গেছে। ফাগুন মাস। মাঠে কোনও কাজ ছিল না। তোর বা'জান বলল: বসে বসে কি হবে ! বন থেকে কিছু মধু কেটে আনা যাক।—তোর মতই ঠিক একগুঁয়ে লোক ছিল। 'না' বলবার উপায় নেই। পরদিন বড়মেঞার বাড়ির রসিদ আর মোহন মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে গেল।

আর্জান চকিত হয়ে বলল,—তারপর !

—তারপর ! বলেই মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ

—তারপর ! রসিদ বললো, তোর বা'জান দূরে এক মধুর চাক দেখে খুশি হয়ে সেদিকে একাই ছুটে যায়। আমার মরণ ! মধুর চাকের কাছে যেতে না যেতেই বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোমরে কামড়ে ধরে। কি আর করবে তখন। হাতেও কিছু ছিল না। চিৎকার করতে থাকে আর হাত পা ছুড়তে থাকে।

আর্জান ততক্ষণে উঠে বসেছে। মায়ের কাঁধ চেপে ধরে বলে, —মোহন চাচা তখন কি করল ?

—কি আর করবে বাঘের সামনে !

—রসিদমামু কি করল ?

মা বলে চলেন,—বাঘে যখন মুখে করে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে লাগল. তখন তোর বা'জান চিৎকার করতে থাকে আর দুই হাত দিয়ে এমনি করে গাছপালা ধরবার চেষ্টা করতে থাকে—বলেই মা তাঁর সবল মুঠো দিয়ে মাদুরের কোণটা চেপে ধরলেন,—কিন্তু তাতে কি হবে ! হাতের মুঠো না খুললে কি হবে ! বাঘের মুখের টানে গাছের চারাগুলি উপ্‌ড়ে যেতে লাগল। মুঠোর গাছ তখন ফেলে দিয়ে তোর বা'জান আবার নতুন গাছ ধরতে লাগে। হাতের জোরও

বোধহয় ততক্ষণে কমে এসেছে। হিঁচ্ড়ে টেনে নিয়ে বাঘ বনের মাঝে চলে গেল!

আর্জান অন্ধকারে বড় বড় চোখে এক নজরে মায়ের চোখের কোণে তাকিয়ে বলল,--তারপর?

মা বললেন,—তারপর! তারপর সব শেষ।......হ্যাঁ, তারপর মোহন ও রসিদ মোল্লা বাউলে ডেকে নিয়ে বাঘের খোঁজে গিয়েছিল। সেদিনই বিকেল বেলা। বাঘের পায়ের দাগ আর রক্ত দেখে দেখে ওরা নাকি অনেক দূর গিয়েছিল। বাঘের পায়ের খোঁচ দেখে বাউলে বলল,—আঁধার হয়ে আসবে এখুনি; খোঁচ দেখে মনে হয়, বাঘটা খুব পুরনো ও বড়; সাঁঝেরবেলা এই পুরনো বাঘের পেছনে যাওয়া ঠিক না। ওরা তখন ফিরে আসে।

আর্জান চঞ্চল হয়ে ওঠে,- -ফিরে এলো!!

মা চুপ করেই আছেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন,—মোহন আসবার সময় একটা ছোট গাছের চারা নিয়ে আসে। এনে বলল,—এমনি ধারা অনেক ছোট চারা গাছ উপড়ে গিয়েছিল তোর বা'জানের হাতের টানে। সেই চারা গাছটার পাতায় তখনও এক ফোঁটা রক্ত লেগে ছিল।

আর্জান এবার চুপ হয়ে গেছে। কাহিনীর বাকিটুকু আর তার শুনতে হয়নি। ছেলেবেলা থেকে সে শুনে এসেছে—তার বা'জানকে বাঘে খেয়েছিল। কিন্তু এই দশ বছরের পুরনো হেঁতাল গাছটা তারই বা'জানের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে—এ-কথা তার আগে জানা ছিল না। তার ইচ্ছা হলো, সে একবার তখনই দেখে আসে,—সন্ধ্যায় হেঁতাল গাছটির তলায় আম্মার দেওয়া প্রদীপটি তখনও জ্বলছে কিনা। কিন্তু এই নিশুতি রাতের গভীর অন্ধকারে মাকে একা ফেলে সে যেতে পারল না।

পরদিন। সংসারের অনেক কাজ আর্জানের করতে হয়। গরু দেখা আছে; মাছ মারতে হয়; মাঠ থেকে ধানের আঁটি বয়ে আনতে হয়, কাছারি বাড়ি যেতে হয়,---এমনি অনেক কাজ। সারাদিন অবসর

মেলে না। তখন বেলা সবে পড়ে এসেছে। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। কাছারির খামারে আঁটি গুণবার কাজে খুব ব্যস্ত। আঁটি গুণে নায়েবকে হিসেব দিতে হবে। বিশ আঁটি ধান কেটে দিলে এক আঁটি ধান মজুরি পাওয়া যায়। গুণতে গুণতে হঠাৎ সে থেমে গিয়ে বলল :

—নায়েব মশায়, আজ থাক্, কাল গুণে দেব।

নায়েব হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—কাল কেন রে !!

—হ্যাঁ, কাল দেব, সকালে এসেই গুণে দেব···ঠিক দেব··· —বলেই আর্জান ছুটে বাড়ির দিকে গেল।

বাড়ির উঠানে এসেই অতি সন্তর্পণে এগিয়ে হেঁতাল গাছটির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে চিৎকার করে মাকে ডেকে বলল :

—আম্মা, আম্মা, কই প্রদীপ দিলে না !

মা তখন গোয়াল ঘরে বাছুরটাকে খোঁয়াড়ে পুরছিলেন। সেখান থেকেই বললেন,—দাঁড়া, সন্ধ্যা এখনও হয়নি।

হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে মার আসতে দেরি হল। শীতের সন্ধ্যা, বাতাসের লেশমাত্র নেই। গোয়ালের ধোঁয়াগুলিও থম্ মেরে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মা প্রদীপ হাতে এগিয়ে এসেছেন। আর্জান ছুটে গিয়ে প্রদীপ শিখার দুপাশে হাত দিয়ে আড়াল করে মায়ের সঙ্গে চলল।

মা বললেন,—ওরকম করছিস্ কেন ? কই, বাতাস তো নেই।

আর্জান শিখার দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি রেখে বলল :

—যদি নিবে যায় !

তিন

আর্জানের গ্রামের নাম কালিকাপুর। খুলনা জেলার সুদূর বন ও লোকালয়ের সীমান্তে এই গ্রাম। গ্রাম বললে হয়ত ভুল হবে। চারদিকে নদী নালা। তারই মাঝে মাঝে ধূ ধূ করছে মাঠ। নদীর লোনা জল থেকে শস্য বাঁচাবার জন্য মাঠগুলির চারদিকে দশহাত উঁচু মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা। এই বাঁধের ধারে ধারে মাটি উঁচু করে চাষীরা ঘর বাঁধে। কিছু গাছপালাও জন্মায়। কয়েক মাইল দূরে দূরে এই চাষীর পাড়া আছে। একেই এদেশের লোকে গ্রাম বলে।

মাত্র ষাট বছর আগে ভাটি অঞ্চলের মানুষ বাদা কেটে কালিকাপুরের আবাদ পত্তন করেছিল। কয়রা নদী সাপের মত বেঁকে কালিকাপুরকে তিন দিকে ঘিরে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে বয়ে গেছে। কয়রা নদী বরাবর এক পাশে বন। অন্যপারে লোকালয়। বাদা ও আবাদের সীমানা।

কয়রা অতি ছোট নদী। এপার থেকে ওপারের বনকে স্পষ্ট দেখা যায়। বাঘের রাজ্য আর মানুষের রাজ্যের এই সীমানা খুবই নগণ্য। মানুষের কাছেও এই সীমানা যেমন কোন বাধাই নয়, বাঘ ও হরিণের কাছেও এই সীমানা তেমনি কিছুই নয়। সুন্দরবন অসংখ্য নদীনালায় পূর্ণ। সুন্দরবনের জীবজন্তুকে অনবরতই এই নদীনালা পার হতে হয়। কয়রার এপার থেকে চাষীরা বাঘের আর হরিণের ডাক শুনে জল্পনা করে; বাঘ ও হরিণও ওপার থেকে মানুষের কোলাহলে চমকিত হয় না।

আর্জানের বাড়ি কালিকাপুরের দক্ষিণ প্রান্তে। খুলনা জেলার শেষ বসতি বলা যেতে পারে। বাঙলার লোকালয়ের শেষ সীমানা। বাঙলারই ভিটেমাটি—তবুও এই লোনাজল আর লোনামাটির দেশ, বাঙলার মিষ্টিজল আর মিষ্টিমাটির মানুষ থেকে যেন অনেক দূরে।

এদেশে পথ নেই বললেই হয়। তবে ঘাট আছে অজস্র, গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। অফুরন্ত নদ ও নদীর দেশ। কালিন্দী, রায়মঙ্গল, কপোতাক্ষী, মৈঁশালি, শিবসা, ভদ্রা, পশর, কয়রা, মার্জার—কি সুন্দর নামই না এই নদ ও নদীর!

এই সব নদীপথে দূর দূরান্ত থেকে বাঙলার মানুষ আসে লোনা দেশে। তারা আসে লাল, নীল, হলদে রঙের পাল টাঙিয়ে, জোয়ার আর ভাটির টানে নৌকা ভাসিয়ে,—লোনামাটির সোনার ফসল ও বন সম্পদ বয়ে নিতে।

সংসারের অনেক কাজ; তবুও তার মাঝে আর্জান গ্রামের ছেলেদের নিয়ে হুটোপাটি করে। ছেলেদের মাঝে কলিমের বড় ছেলে মাদার তার সব চেয়ে প্রিয়। আর্জান ও মাদার গ্রামের ছেলেদের নেতা বললেই হয়।

ওরা দল বেঁধে খেলা করে বেড়ায় নদীর ধারে ধারে বাঁধের উপর। খেলার জিনিসের ওদের অভাব নেই। টিয়া পাখির ঝাঁক ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে। বাঁদর দেখলে ওরা দল বেঁধে তাড়া করে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের বনের সঙ্গে কত কথাই না ওরা বলে। প্রতিধ্বনির আওয়াজ ওপার থেকে ভেসে আসে। শিষ দিলেও বনও শিষ দেয়। হেসে ওঠে ছেলের দল। বনও হেসে ওঠে। ভাবে কি মজা, বন কি মজার!

কিন্তু ওদের সব চেয়ে মজার খেলা 'বিদেশী' না'য়েদের সঙ্গে। কতদূর থেকে কত রকমের বড় বড় নৌকাগুলি আসে। বালাম, পান্‌সী, বাছাড়ী, ঢাকাই পলওয়ার—কত রকমারি না তাদের গড়ন! কয়রা নদীর স্রোতের টানে টানে তারা কালিকাপুরকে বেড় দিয়ে আবার চলে যায় কত দূর!

আজ সকালেই জোয়ার। একের পর এক রঙবেরঙের পাল টাঙিয়ে নৌকাগুলি চলেছে।

পূব দিকে দূরে গাছের মাথার উপর লাল রঙের পাল দেখে আর্জান বলল :

—এবার কিন্তু আমি ! দেখছিস্ কত বড় পাল ? খুব বড় নৌকা। এবার কিন্তু আমি !

সত্যিই বড় নৌকা। মোড় ঘুরতেই আর্জান চিৎকার করে বলে ঃ

—ও ! নাইয়ে ! তোমরা কোথায় যাবে ?

নাইয়ে কোন উত্তর দেয় না। আর্জান আবার চিৎকার করে, —ও নাইয়ে ! তোমরা কোথায় যাবে ?

ছেলেদের অতো উৎসাহ দেখে হালের বুড়ো মাঝি বলল,—ক—ল—কা—তা—য় !

মাদার যেন আর থাকতে পারে না। চিৎকার করে ওঠে :

—কলকাতা কতদূর !

—সে অ—নে—ক দূর। যেতে পাঁচ দিন। দশ জো'র পথ !

আর্জান অবাক হয়ে বলল,—পাঁ—চ দিন !

মাদার আবার মাঝিকে প্রশ্ন করল,—এত বোঝাই মরা গরুর হাড় কেন ?

—বিক্রি করব।

—কলকাতার মানুষ কি হাড় খায় ?

ততক্ষণে হাড়ের নৌকা সাঁ সাঁ করে ওদের ঘাট ছেড়ে চলে গেছে। বুড়ো মাঝি হেসে কি বলল তা শোনা যায় না।

আবার একখানি নৌকা আসছে। সাদা রঙের পাল। ছেঁড়া পাল। সাদা রঙ। আর্জানের ভাল লাগে না। মাদারের পালা এবার। পালখানা যেন ছুটে আসছে !

মাদার বলে,—দেখছিস্ কি জোরে আসছে? বল্‌তো কিসের নৌকা ?

কে আগে বলতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। বাঁধের উপর দিয়ে ওরা ছুটে গেল সামনের ঘাটে। মাদার আগেই গিয়েছিল। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েই বলল,—হাঁড়ি ! হাঁড়ি !

লম্বা পান্‌সী একটু কাছে আসতেই মাদার বলল,—ও কুমোর না—ই—য়ে ! তোমরা কোথায় যাবে ?

নিস্তব্ধ গহন অরণ্যের পাশে ছেলেদের আওয়াজ শুনে মাঝি-মাল্লার মজাই লাগে। দাঁড় থামিয়ে বলল,—কুমির যাবে বাঘের হাটে।

—তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

—খুলনায়।

—কত দূর ?

—চার ভাটি পাঁচ জো !

—কদিন লাগে যেতে ?

—হিসাব করে নাও !

মাদার ও আর্জান হিসাব করতে করতে হাঁড়ি-কলসীর পান্‌সী ওদের ঘাট পিছনে ফেলে কল্‌-কল্‌ করে কয়রা নদীর বাঁক ঘুরে চলে যায়।

চার

শীতের শেষ। নদীর ধারে গ্রামের সবাই বাঁধ বাঁধছে। ছেলে বুড়ো সবাই আছে। আর্জান আর মাদারও আছে। বর্ষার আগেই বাঁধ রিপু করার কাজ সেরে নিতে হয়। নইলে বর্ষা এলে সব জলে জলাকার হয়ে যায়; কোথায় পাওয়া যাবে মাটি তখন? তাছাড়া চৈত্রের রোদ খাইয়ে রিপু করা বাঁধও নতুন বর্ষার আগে শক্ত করে নিতে হবে।

বাঁধকে এদেশে ভেড়ি বলে। এরা দল বেঁধে ভেড়ির কাজ করে। তাছাড়া উপায়ও নেই। দশ বারো হাত নিচু থেকে মাটি তুলতে হবে ভেড়ির মাথায়। লাইন দিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় অনেকে—কোদালির কাছ থেকে ভেড়ির মাথা পর্যন্ত। তারপর হাতে হাতে চালান দিয়ে, প্রতি সেকেণ্ডে ঝপ্ ঝপ্ করে মাটির চাক ভেড়ির উপর ফেলে।

একটু দূরে কলিমের দশ বছরের মেয়ে ফতিমা একখানা গামছা পরে দাঁড়িয়ে। মুখে আঙুল দিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল এদের কাণ্ড-কারখানা।

—কিসের যেন হল্লা শোনা যায়!!—বলেই আর্জান নদীর ধারে ছুটে যায়। ভেড়ি থেকে নদীর কিনারা চল্লিশ হাত হবে। নদী বরাবর এই চরা প্রায় বনের মত জঙ্গলা।

নদীর ধারে গিয়েই আর্জান চিৎকার করে ওঠে,—বাঘ! বাঘ!

সবাই চকিত হয়ে কাজ ফেলে রেখে এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ে। ফতিমা এক ছুটে বাড়ি গিয়ে খিড়কির বাঁশ টেনে মাকে ডাকতে থাকে।

গ্রামের একচ্ছত্র নেতা ধনাই মামু ছুটে এগিয়ে যায়। নাম ধনাই মোড়ল, কিন্তু গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই তাকে 'ধনাই মামু' বলে ডাকে।

ধনাই মামু দেখে বলে,—দূর বোকা! এই বুঝি বাঘ? হরিণ সাঁতরে আসছে। বনে বাঘ তাড়া করেছে; পরাণের দায়ে এপারে আসছে।

চকিতে ধনাই মামুর মতলব খেলে যায়। সবাইকে আদেশ করল,—জলদি সবাই লাইন দিয়ে ভেড়ি বরাবর জঙ্গলটা ঘিরে ফেল্। হরিণ ধরতে হবে।

মামু আদেশ দিতে না দিতে সবাই মিলে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে জঙ্গলটা ঘিরে ফেললো।

আর্জানও একটা কোণে দাঁড়িয়েছে। ভেড়ির কিনারায় নরম মাটিতে এক পা ভাল করে বসিয়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছে,—ভয়! কিসের ভয়? এত লোক আছে! মামু বললো বটে, কিন্তু যদি এটা বাঘ হয়! আমি জলের উপর হলদে কান দুটো স্পষ্ট দেখলাম।

'ফস্-ফস্-ফস্' আওয়াজে আর্জানের কান খাড়া হয়ে যায়। 'ফস্-ফস্-ফস্'। আর্জান বিড়্ বিড়্ করে বলে—না, ধনাই মামু বুঝতেই পারেনি! কিছুতেই হরিণ নয়!

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের ভিতর হরিণ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দুজনে ঝোপে ঝাড়ে লাঠিপেটা করছে; তবুও কোনও সাড়া নেই।

হঠাৎ একজন 'ধর্ ধর্' করে চিৎকার করে উঠল। আর চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে—ধর্ ধর্!

আর্জান ভেড়ি থেকে বেশ নিচে দাঁড়িয়ে; ভেড়ির মাথা আর্জানের মাথা থেকেও তিন-চার হাত উপরে।

চিৎকারে চমকে উঠে আর্জান চেয়ে দেখে, তীরবেগে ছুটে এসে হরিণ চটাং করে তারই মাথার উপর দিয়ে ভেড়ি লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে! দিশেহারা হয়ে আর্জান শূন্যে হরিণের পেছনের একখানা পা ধরে ফেলে। পা ধরতেই হরিণ কাদায় পড়ে যায়। আর্জানও প্রাণপণে জোরে তাকে কাদায় চেপে ধরে। কাং হয়ে পড়ে গিয়ে

হরিণ ক্ষিপ্রবেগে বাকি পাগুলি ছুড়তে থাকে। ধারাল খুরের আঘাতে আর্জানের কপাল কেটে রক্ত ঝরে পড়ে।

ততক্ষণ হৈ চৈ করে সবাই ছুটে এসে হরিণকে চেপে ধরেছে। মাদার ছিল দূরে, ছুটে এসে আর্জানকে জোর করে টেনে নিল ; ঘাস চিবিয়ে গামছা দিয়ে তার ক্ষতস্থান জোরে বেঁধে দিল।

আর্জান ধনাই মামুর কাছে এসে বলল,—মামু, হরিণ কি 'ফস্ ফস্' করে ?

—কেন ?

—এই এদিকে এসো মামু! ঐ শোনো, শুনতে পাওনি ?

ধনাই কান পেতে একটু চুপ করে থাকে। তারপরেই চঞ্চল হয়ে উঠে বলে,—হৈ! ভেড়ির উপরে উঠে আয়! সব উঠে আয়! শীগ্‌গির আয়!

সবাই ইতিমধ্যে হরিণকে বেঁধে ফেলেছে। মামুর কথায় সবাই হরিণকে টেনে নিয়ে ভেড়ির মাথায় উঠল।

মামু পাগলের মত একাই ছুটেছে পাশের বাড়িটাতে। কি ব্যাপার সবাই বুঝতে না বুঝতেই দেখে, মামু পাশের বাড়ি থেকে দুখানা বাঁশ ক্রস্ করে গরুর দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে ছুটে আসছে। এই ভাবে বাঁধা বাঁশকে ওরা তেকাঠা বলে। তেকাঠা দেখে সবাই আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

আর্জান যাকেই সামনে পায় তাকেই প্রশ্ন করে,—কি হলো ?

—চুপ্ চুপ্ !—সবাই চুপ করতে বলে।

মাদারও কোন উত্তর দিতে পারে না। সবচেয়ে বলিষ্ঠ কলিমের ডাক পড়ল ; তাকে তেকাঠার একটা বাঁশের মাথা ধরতে বলে মামু নিজেই আর একটা বাঁশের মাথা ধরল।

মামু চুপি চুপি বলল,—আয়, তোরা সব পিছু পিছু আয়।

ঝোপের মাঝে ঢুকে মামু ও কলিম পা টিপে টিপে চলেছে, আর পিছনে অন্য সবাই কেউ লাঠি নিয়ে, কেউ খালি হাতে। কারও মুখে টুঁ শব্দ নেই।

আর্জানও দলের মধ্যে আছে। মাদার তার সামনে।

ওদিকে গলায় ফাঁস-গিঁঠ দিয়ে হরিণকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে সবাই চলে এসেছিল। বনের হরিণ বাঁধা পড়ে একবার শূন্যে লাফ দিচ্ছে, আর দড়াম্ করে মাটিতে পড়ছে। সেই ধুপ্-ধাপ্ শব্দ ছাড়া আর কোথাও শব্দ নেই। আর্জানও সবার কাছে তাড়া খেয়ে আর প্রশ্ন করতেও সাহস পায় না। দলের সঙ্গে চলেছে কিন্তু আর্জানের বুক মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। হরিণ ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু বাঘের কথা সে ভুলতে পারেনি।

হুড়মুড় করে ঝোপের মাঝে শব্দ হয়ে ওঠে। আর্জান ভীত হয়ে মোহন মোল্লার হাত জড়িয়ে ধরল। মামু ও কলিম ঝোপ ঝাড় ভেঙে হঠাৎ দৌড় দিয়েছে।

—ধর্ ধর্, তাড়াতাড়ি লেজ ধর্—ধনাইমামুর বেপরোয়া চিৎকার।

বিরাট এক ময়াল সাপ। মামু ও কলিম ময়ালের গলাটা তেকাঠা দিয়ে চেপে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তার লেজটা প্রায় সে বাঁকিয়েছিল। একবার বাঁকাতে পারলে, যাকে সামনে পেত তাকে লেজে জড়িয়ে হাড়গোড় ভেঙে চুরমার করে মেরে ফেলত। কিন্তু সবাই মিলে ততক্ষণে প্রাণপণে লেজটা চেপে ধরেছে।

ধনাই মামু বলল, —মার্ মার্, এইবার পিটিয়ে মার্!

আর্জানের এতক্ষণে বুকে সাহস এসেছে। সেও লাঠি নিয়ে দুম্দাম্ মারতে থাকে।

মরা ময়ালকে সবাই মিলে এবার টেনে নিয়ে এল। তাদের আনন্দ আর ধরে না। এত বড় সাপের চামড়া বেচে তারা অনেক টাকা পাবে।

আর্জানের কিন্তু সাপের থেকে হরিণের কথাই বেশি মনে পড়ছে। হরিণটা সে-ই প্রথম ধরে মাটিতে ফেলেছিল। হরিণের রঙও হলদে। বাঘও হলদে। আচ্ছা, ওটা যদি হরিণ না হয়ে বাঘ হত! তাহলে কি অমন ভাবে পা ধরে কাদায় চেপে ধরতে পারত! পারত ও,

নিশ্চয় পারত,—আর্জান ভাবতে থাকে। মাদারকে ফেলে ছুটে যায় হরিণের কাছে।

হরিণ কিন্তু এদিকে লাফের পর লাফের টানে গলার দড়িতে ফাঁস এঁটে দম আটকে মরেই গেছে।

সকলেই ময়াল সাপের চামড়া আর হরিণের মাংস নিয়েই ব্যস্ত। আর্জানের ওসব ভাল লাগে না। সব কিছু ফেলে হরিণের চামড়াটাই সে চেয়ে নিয়ে এলো। কেমন সুন্দর চামড়া! কত মোলায়েম! ডোরা রঙ। গাল দিয়ে স্পর্শ করল। কাঁচা মাংসের গন্ধ। লোমে বুনো গন্ধ। শুকিয়ে গেলে এ গন্ধ থাকবে না। মাকে গিয়ে সে দেখাবে, তার জীবনের প্রথম হরিণ শিকার!···শিকার! বন্দুক তো তার নেই। বন্দুক ছাড়া এ কেমন শিকার! মাকে সে এই চামড়া উপহার দেবে। আর কাউকে দেবে না। বিক্রিও করবে না!

পাঁচ

ফসল ঘরে আসবার পর চাষীর মন এমনিতেই আনন্দে মেতে থাকে। হয়ত অনেকের ঘরে বছরের খোরাক ওঠেনি,—তবুও নতুন ফসল সে নাড়াচাড়া করেছে, তার গন্ধ তার নাকে এসেছে। পৌষের পর নতুন 'সান্নুকে' নবান্নের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। এতেই তার আনন্দ! যৌবনও মেতে ওঠে এই সময়। ফাল্গুনের ঝির্‌ঝিরে লোনা হাওয়ায় যেন মাদকতা আনে।

কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ ছোট ছেলেমেয়েদের। জল শুকিয়ে যায় চারদিকে। নদীর ভয়ঙ্কর ভয়াবহ মূর্তিও আর থাকে না। ওরা যেন ছুটোছুটি করবার শুকনো জায়গা অনেক পায়। যে মাঠে এতদিন জল থৈ থৈ করত, সেখানে ওরা এখন ছুটোছুটি করে, ক্ষেতের পাশে আলে আলে ঘুরে ইন্দুরের গর্ত খুঁজে বেড়ায়। গর্ত দেখলেই খুঁড়ে খুঁড়ে তার থেকে ধান বের করে মুঠো মুঠো। বিলের মাঝে নালা ও খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরে আনে চুপড়ি ভর্তি করে।

শুকনো মাঠে এসে বসে মানিক-জোড়। কাল, সাদা ও হলদে মিশিয়ে এই পাখির রঙ। জোড়া ছাড়া ওরা চলেই না। এমনই ওদের ভালবাসা। ছেলে বুড়ো যুবক সবার মনে ওরা ভালবাসার কথা জাগিয়ে তোলে। এরা বেশ বড় পাখি। কিন্তু সবচেয়ে বড় মদ্‌না। শকুনের চেয়েও বড়। ঠোঁঠ দুটি প্রায় এক হাত লম্বা। দেখে মনে হবে, ছোট শিশুকে স্বচ্ছন্দে মুখে করে যেন নিয়ে যেতে পারে। তাই ছোটদের ওদের উপর রাগ। দেখলেই ঢিল ছুঁড়বে।

ভোরবেলা। আর্জান ঢিল ছুঁড়ে মদ্‌নাকে মারছিল। কয়েকটা কলা গাছের আড়াল থেকে ফতিমা বলে উঠল,—ওদিকে ঢিল ছুঁড়ো না! মানিক-জোড়টাও যে উড়ে যাবে।

আর্জান বলল,—যাক্ না, তা না হলে তোকে যে মদ্‌না ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে!

ফতিমা মুখ ঘুরিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল,—বে—শ !

একটু পরেই চুপি চুপি বলল,—যাবে না ? যাবে না বনে ?

তাইতো !—বলেই আর্জান ফতিমাকে উপেক্ষা করেই ছুটল মাদারের কাছে।

এত ভোরে লোক আসতে শুরু করেনি। কালিকাপুরের ঘাট থেকে দেখা যায়—বনবিবির পূজার থান্। ওপারেই বনের মধ্যে নদীর ধারেই পূজা হবে। মাত্র আশেপাশের গ্রামের দুচারজন এসে ঘরখানা বানিয়েছে। ইতিমধ্যে বাউলে কলিম এসে ধুলো পড়ে মন্ত্র দিয়ে 'ঘের' দিয়ে গেছে। সবাই নিশ্চিন্ত, কোনও বাঘ আজ আর এই 'ঘেরে'র মধ্যে আসবে না।

মাদার আর আর্জান চুপি চুপি ভেড়ির আড়াল থেকে সবচেয়ে ছোট্ট ডিঙিখানা টেনে বের করল। নদীর কিনারা থেকে দশ বার হাত ছেড়ে মাটি কেটে ভেড়ি বাঁধা হয়েছিল। এই কাটা নালাকে নদীর সাথে যোগ করে দেওয়া আছে। জোয়ারের জল এলে এই নালাতেও জল আসে। ডিঙি রাখবার এমন নিরাপদ জায়গা আর নেই। নদীর কিনারা অবধি যে দশ বার হাত জায়গা পড়ে আছে, সেখানে ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছ দেখা দিয়েছে। নদীর খরস্রোত আর ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁধকে রক্ষা করে এই গাছ ও ঝোপের সারি।

জোয়ার থাকলে কোনও অসুবিধা নেই। ডিঙি সহজেই নালা থেকে বের করে নদীতে পড়া যায়। কিন্তু ভাটি হলেই মুস্কিল। ডিঙি মাটির উপর দিয়ে টেনে টেনে নদীর কিনারা পর্যন্ত আনতে হবে। কিন্তু তারপরই মজা ! ছেলেদের ভারি মজা লাগে। ভাটির সময় চর বেরিয়ে পড়ে। পলিমাটির চর। চল্লিশ পঞ্চাশ হাত পলিমাটির নরম ও পিচ্ছিল চর, ঢালু হয়ে নেমে গেছে জল পর্যন্ত। এর মুখে ডিঙি ছেড়ে দিলে সাঁ সাঁ করে তীর বেগে ছুটে জলের মধ্যে ঝপাং করে পড়ে। ভারি মজা লাগে ছেলেদের এই সময় ডিঙিতে চড়তে।

ফতিমা লুকিয়ে মাদার ও আর্জানের পিছু পিছু এসেছে। রচরে

মুখে এসে ওরা ডিঙি ছেড়ে দেবে এমন সময় ফতিমা ব্যগ্র হয়ে বলল, —ভাই! আমি যাব! আমি যাব!

মাদার থেমে গেল। বেশি কথা কাটাকাটি করলে জানাজানি হয়ে যাবে। আর্জান মাদারের ভাব দেখে বলল :

—নে, ওকে নিয়ে আর ঝামেলা বাড়াতে হবে না!

—যাক্, চলুক না, কি আর হবে!—বলেই মাদার ফতিমাকে ডেকে নিয়ে ডিঙিতে বসাল।

ধাক্কা মেরে ত্রুজনেই ডিঙিতে উঠে বসল। হেলেত্বলে সোঁ সোঁ করে ডিঙি নিচে নেমে যায়। জলের উপর পড়তে না পড়তেই ফতিমা টাল সামলাতে না পেরে চরের কাদায় লেপটে পড়ে গেল। কিন্তু ডিঙি থামবার নয়। তীর বেগে জলে ঝপাং করে পড়ে কুল থেকে মাঝ-নদী পর্যন্ত এক ধাক্কায় চলে গেল।

—হলতো! যা, এবার বাড়ি যা, আর আসতে হবে না—বলেই আর্জান হাল ধরে বনের দিকে ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে দিল।

বনে উঠেই আর্জান ও মাদার দেখে, ধনাই মামু হাজির। ধনাই মামু এক ধমক্ দিল,—যা, যা, বাচ্চারা এখন এসেছিস কেন? বেলা হলে আসবি! যখন সব লোকজন আসবে। যা, এখন যা!

ধমক্ খেয়ে বনের এদিক ওদিক উঁকিঝুকি মেরে ওদের সুবোধ বালকের মত ফিরে আসতে হল।

বন বিবির পূজা। পূজা বলে কেন জানি না। এ পূজায় না আছে ফুল, না আছে মন্ত্র, না আছে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। তবু এরা পূজা বলে। পূজা ও উৎসব এরা একাকার করে দেখে। বনবিবির উৎসব। হিন্দু ও মুসলমান সবাই এতে যোগ দেয়। সবাই এসে নতুন মানৎ করে। পুরনো মানৎ পরিশোধ করে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে মরদ, সবাই এসে যোগ দেয় এই আনন্দ উৎসবে।

পাঠান আমলের কথা। সুন্দরবনের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও যোদ্ধা দক্ষিণা রায়। সুন্দরবনে আধিপত্য করে ব্যাঘ্রের দেবতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আজও তিনি পূজিত হন সুন্দরবনের পশ্চিম

অঞ্চলে ও আশপাশ জেলায়। কিন্তু খাস্ সুন্দরবনে বনবিবির একাধিপত্য। বনবিবিকে স্মরণ করে, বনবিবিকে সেলাম দিয়ে আজও সুন্দরবনের প্রতিটি মানুষ বনে প্রবেশ করে। কে এই মানস সুন্দরী নারী বনের দেবী —তার হদিশ ইতিহাসে মেলে না। বনকে এদেশের মানুষ যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয়ও করে। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে এদেশে মানুষ বনের সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িত। এই ভয়ঙ্কর অথচ রোমাঞ্চময়ী বনের অধিপতিকে নারী রূপেই দেখে এদেশের মানুষ হয়ত মনের সাধ মিটিয়েছে।

ইতিহাসে না মিললে কি হবে, বনবিবির নামে প্রবাদ ও গল্প অজস্র ছড়িয়ে আছে। 'বনবিবির জহুরা' নামে মুসলমানী কিতাবে যে গল্প আছে, তাই এদেশের লোকে বিশ্বাস করে। মক্কাবাসী বেরাহিমের স্ত্রী গুলালবিবি। সতীনের কৌশলে তাঁকে সুন্দরবনে নির্বাসন করা হয়। নির্বাসনের সময় তিনি সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। বনেই সা জঙ্গুলী ও বনবিবি নামে তাঁর যমজ পুত্র ও কন্যা হয়। ভাটি দেশের রাজা দক্ষিণা রায়ের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য আল্লার আদেশে বনবিবি ও তার ভাই এই আবাদ অঞ্চলেই থেকে যান। অল্পদিনের মধ্যে আশেপাশে অনেক পরগণাই বনবিবির দখলে এল। দক্ষিণা রায় এই আধিপত্য সহ্য করতে রাজি নয়। তিনি যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধ কি করে করবেন! পুরুষ হয়ে নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর সম্মানে বাধে। অবশেষে তিনি তাঁর মা নারায়ণীকে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি করলেন।

কিন্তু সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এই সময় বরিজহাটিতে ধোনাই, মোনাই নামে দুই ভাই ছিল। এরা একদিন সাত ডিঙি সাজিয়ে বনে মধু কাটতে আসে। এদের সঙ্গে এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র 'দুঃখে' ছিল। সপ্তডিঙ্গি গড়খালি নদীতে এলে দক্ষিণা রায় এদের কাছে নরবলি দাবি করেন। মহাপূজায় দক্ষিণা রায় নরবলি দেবেন। তিনি বেছে 'দুঃখে'কে নেবার আদেশ দিলেন।

বেগতিক দেখে ধোনাই মোনাই 'দুঃখে'কে দিয়ে দিল। খবর পাওয়া মাত্র বনবিবি 'দুঃখে'কে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণা রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দক্ষিণা রায় বনবিবিবির বশ্যতা স্বীকার করলেন। 'দুঃখে' রক্ষা পেল ; শুধু রক্ষা পেল না—বনবিবির কৃপায় 'দুঃখে'র বিধবা মার অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচে গেল। 'দুঃখে'র বহু সম্পদ মিলল এবং ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে তার বিয়ে হল।

সেই অবধি বনবিবি বনের দেবী। বসন্তের আগমনে তারই পূজা বা তারই উৎসব।

বেলা বেশ হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট্ খানা ডিঙি এসে বনের কূলে চেপেছে। তিন চার শ' লোক জমে নিস্তব্ধ বনকে মেলায় পরিণত করেছে। যে যার গল্প. আমোদ ও উৎসবে ব্যস্ত। এরই ফাঁকে আর্জান ও মাদার ধীরে ধীরে বনের মধ্যে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেছে। বনে এই তারা প্রথম। একটা কিছু নতুন তারা দেখতে চায়।

আর্জান বলল,—আরও যাবি ?

মাদার বিরক্ত হল,—যাব না তো কি ! চল্ আরও এগিয়ে চল্। শুনেছি সামনেই একটা জলা আছে। সেখানে অনেক কিছু দেখা যায়।

আর্জান শঙ্কিত হয়ে বলল,—কিন্তু যদি আসে ?

—আসবে কি ? আসুক, আসলে এক দৌড়ে খানে চলে যাব। আজকে আবার ভয় কি !

—মাদার। মাদার !—ধনাই মামুর গলা।

দুজনেই ভেবাচেকা খেয়ে যায়। ফতিমা বনে আসা অবধি লোকজনের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু নজর ছিল এই দুজনের প্রতি। সকাল বেলার ডিঙির ব্যাপার সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি। আর্জান ও মাদারের বুঝতে বাকি রইল না,—ফতিমার কাণ্ড না হয়ে যায় না ! সে-ই নালিশ করে দিয়েছে !

ধনাই মামু কানে ধরে দুজনকে নিয়ে এলো। এনেই দুচার ঘা

লাগিয়ে বলল,—জানিস্ কতদূর ধুলো-পড়া দেওয়া আছে? কেন তোরা তার ওপারে গেলি?

ফতিমা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আর মুখ বাঁকিয়ে আঙুল দিয়ে শাসিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিজের মনে মনেই বলছিল,—কেমন! কেমন হয়েছে!

দূরে কলিম বসে বসে হুঁকা টানছিল। ফতিমার কাণ্ড দেখে হুঁকার টান ছেড়ে দিয়ে মুচ্‌কি হাসি হাসছে।

হঠাৎ কলিমের চোখোচোখি হওয়ায় ফতিমা লজ্জায় ছুটে গিয়ে কলিমের কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল।

ছয়

আবাদে ও বনে আর্জান ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে ওঠে। সুন্দরবন অতি গভীর, অতি ভয়ঙ্কর। তবু বনে না গেলে এদেশের মানুষের জীবন চলে না। রান্নার কাঠ চাই, বনে গিয়ে এরা কাঠ নিয়ে আসে; মাছ খেতে হবে—গভীর অন্ধকার রাতে একটা কুপি হাতে করে বনে চলে যায় মাছ ধরতে; হাটের খরচ নেই হাতে,—বনের ভিতর অনেক দূরে গিয়ে গোলপাতা কেটে নিয়ে দূরের এক গ্রামে বিক্রি করে আসে।

বনে এরা খালি হাতে ঘোরে। কিন্তু সব সময় খালি হাতে ঘোরা যায় না। বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে বাড়ে; হরিণের মাংস খাবার লোভও এদের আছে; নদীতে কুমির এসে মানুষও নিয়ে যায়—তাই এদের বন্দুক চাই। কিন্তু পাবে কোথায়?

তখনও ইংরেজ রাজত্ব পুরাদমে চলেছে। বন্দুকের নামেই ইংরেজরা ভয় পায়। গরীব চাষীর হাতে কি আর তারা বন্দুক দেবে! তবু সুন্দরবনের চাষীরা বন্দুক যোগাড় করে। অজস্র বন্দুক আছে এদের কাছে। দেশী বন্দুক,—গাদা বন্দুক, নিজেদের হাতে তৈরি করা। মুঘল আমলে রাজা প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনে স্বাধীন রাজা ছিলেন। আকবরের সৈন্যের সঙ্গে তিনি অনেক লড়াই করেছিলেন। সেই সময় দেশের কামার দিয়ে তিনি বন্দুক তৈরি করাতেন। সেই সব কামারদের বংশধর আজও বন্দুক তৈরি করে। অবশ্য পুলিশের অজানিতে।

মা অনেক আপত্তি করেছেন। কিন্তু আর্জান কিছুতেই তা শোনে না। সে একটা গাদা বন্দুক যোগাড় করেছে। বে-পাশী বন্দুক। পুলিশ দেখলেই জেলে নিয়ে যাবে। বিড়ালের ছানার মত আর্জান তার এই সম্পদকে এখানে একবার, ওখানে একবার লুকিয়ে রাখে।



দুর্জয় ব্যাঘ্র-শিকারী আর্জান সর্দার

পুলিশের ভয় এদের খুব। কিন্তু জানে, পুলিশ কিছুতেই এদের বন্দুক ধরতে পারবে না।

আবাদের গ্রামগুলি খোলা মাঠের মাঝে। ধু ধু করে। পুলিশ এলেই দূর থেকে দেখা যাবে। আর পুলিশ দেখা দিতেই এরা বন্দুক নিয়ে ছোট নদী পার হয়ে গভীর বনে চলে যায়। সেই দুর্গম বনে খুঁজতে গেলে পুলিশের হয়ত বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হবে। কাজেই পুলিশ সে-মুখো হয় না।

বন্দুক চালিয়ে পাখি মেরে আর্জান হাতের নিরিখ করে নিল অনেক দিন ধরে। একটা পাখি মারতে পারলে আর্জান ভাবে— এইবার তার হরিণ ও বাঘ মারার নিরিখ নিশ্চয় হয়েছে।

একটা বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাশের গ্রামের একদল সেই বাঘ মারতে যাবে। আর্জানের বয়স তখন পনেরো বছর। মা কিন্তু আর্জানকে বনে যেতে দিতে চান না। হেঁতাল গাছটার দিকে তাকালে বনের কথায় তাঁর বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে।

আর্জান মাকে বলল,—ওপাড়ার সবাই হরিণ শিকার করতে যাচ্ছে, আমিও যাব।

হরিণ শিকার সে একবার করেছে। কাজেই মায়ের অনুমতি কোনমতে আদায় করে নিল।

মাদার গ্রামে তখন নেই ; তাই তাকে আর সঙ্গী বানাতে পারে না। বন্দুক নিয়ে যাবার সময় আর্জানের বেশ ভয় লাগছিল। বাঘ আজও সে দেখেনি। বাঘ সামনে পড়লে দড়াম্ করে গুলি করবে— ভাবতে ভাবতে সে দলে ভিড়ে পড়লো।

সুন্দরবনের বাঘ শিকারে কোনও তোড়জোড় নেই—করারও কোনও উপায় নেই।

এমনিতে পরিষ্কার বন। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। শুধু দেখা যাবে, গাছের গুঁড়িগুলি সার বেঁধে থামের মত দাঁড়িয়ে আছে। তবু হাতি এখানে চলতেই পারবে না। চারদিকে খাল ও নদীতে ভরা। প্রতি মাইলে দু-তিনটি নদী ও দশ-বারোটি খাল। তাছাড়া

সুন্দরবনের প্রতিটি গাছের শিকড় থেকে মাটির উপর শূলো বেরোয়। আধ হাত বা এক হাত অন্তর বারো-তেরো ইঞ্চি দীর্ঘ শূলো সারা বন ছড়িয়ে আছে। শূলোগুলি দেখতে বন্দুকের সঙ্গিনের মত। গোল নয়, চেপটা কঠিন শিকড়। ভারি শক্ত। মাথাগুলি আবার বর্শার ফলকের মত সরু। একবার এর উপর পড়লে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। সারা বন ছড়িয়ে আছে। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হবে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা। প্রতিটি পদক্ষেপ দেখে দেখে এই শূলোর ফাঁকে-ফাঁকে ফেলতে হয়। কাজেই হাতির সাহায্যে শিকারের স্থান নেই।

ছাগল-গরু বেঁধে মাচায় বসে এখানে শিকার চলে না। সুন্দরবনের বাঘের ছাগল-ভেড়ার প্রতি লোভ নেই। বনে অজস্র হরিণ। দশ, পঞ্চাশ বা পাঁচশো হরিণ দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তাই ছাগল-ভেড়ার লোভ বাঘের নেই। লোভ যদি থাকে, তা আছে মানুষের ওপর। মানুষের রক্তে ও মাংসে তার ভয়ানক লোভ। তাছাড়া, সুন্দরবনে মাচা করে খুব উঁচুতে বসার মত বড় গাছ যত্রতত্র নেই। কাজেই মাচায় শিকার সুন্দরবনে অচল।

বাঘের সন্ধান পেলে পায়ে হেঁটে হেঁটে খুঁজে বের করে মারতে হবে। বাবুয়ানি শিকার বা নিরাপদ শিকারের সুযোগ সুন্দরবনে নেই।

সুন্দরবন যেমন ভয়ঙ্কর, সুন্দরবনের মানুষেরাও তেমনি ভয়ঙ্কর। ওরা পাঁচ জনে মিলে বনে প্রবেশ করল। গভীর অরণ্যে কোথায় গোলপাতার ঝোপে বাঘ থাকবার সন্ধান পেয়েছে, তারই খোঁজে।

জায়গা মতন গিয়ে বুড়ো ওসমান আর্জানকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল,—তুই আর যাস্‌নে। এখানেই একটা গাছে উঠে বন্দুক নিয়ে বসে থাক। নিকটেই বড়মেঞা আছে। ঐ দেখ্ না পায়ের কাঁচা খোঁচ দেখা যাচ্ছে।

আর্জান একটা গাছে উঠে পড়ে। যে-ডালে সে বসতে চায়, সেটা খুব নিচু; সাহস দেখাতে নিচু ডালেই বসলো, কিন্তু বুক তার দুরদুর করছে। বাকি চারজনে একত্র হয়ে এগিয়ে যায়। একটু পরেই বনের আড়ালে ওরা মিলিয়ে গেল। আর্জান একা।

বাঘ কেমনভাবে এদিকে আসবে! ছুটে আসবে, না লাফিয়ে আসবে! শুনেছে হাঁড়ির মত মুখ। চোখ দুটো টর্চলাইটের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকে। এক-এক থাবায় আঠারো মানুষের বল। গুলি খেলে সে সেখানেই পড়ে যাবে, না ছুটে পালাবে?

দড়াম্‌...দড়াম্‌—দুটি গুলির আওয়াজ। কিন্তু আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। গুলি করার মত তাক্‌ করে আর্জান ডালে বসেছিল। দেরি হচ্ছে দেখে সে উঠেই পড়েছে। এমন সময় হঠাৎ দেখে,—একি! ভেবেছিল, হাঁ হাঁ করে গর্জন করতে করতে বাঘ তেড়ে আসবে। তার চোখে মুখে থাকবে হিংস্র মূর্তি। না, সুন্দরবনের বাঘ আসছে কিনা মাথা ও পিঠ নিচু করে চুপিসারে! বাঘটা দ্রুত আসছিল। সোজা এসে আর্জানের ডালের নিচে দিয়ে গুড়্‌গুড়্‌ করে চলে গেল।

আর্জানকে বাঘ দেখতেই পায়নি। আর্জান এক হাতে ডাল ধরে আছে, অন্য হাতে বন্দুক। গুলি করতে হলে বসতে হবে। বসতে গেলে শব্দ হবে। বাঘের নজরে আসবে। বাঘ হয়ত গুলি করবার অবকাশও দেবে না! কি করা উচিত হবে, ঠিক করতে না করতে বাঘ চলে গেল। ঝোপের আড়ালে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরে বাকি চারজনে ফিরে এসে আর্জানকে ডেকে নামায়। বাঘটা শুয়ে ছিল। ঝোপের আড়াল থেকে দুজনেরই গুলি ফসকে গিয়েছে। তারপর ওরা আর কিছু জানে না। আর্জান তার নিজের কাহিনী বলে বুড়ো ওসমানকে প্রশ্ন করে,—বাঘ কেন এমন চুপি-চুপি পালাল?

ওসমান চারিদিকে একবার তাকিয়ে চুপি-চুপি বলল,—বড়মেঞা পালায় না।

—আমি স্পষ্ট দেখলাম চোরের মত পালাচ্ছে!

—তাই না কি! তাহলে শীগ্‌গির চলো এখান থেকে!

আর্জান আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করে,—বাঘ পালালে আমরা পালাব কেন?

আর্জানের কথায় কান না দিয়ে ওসমান বলল—চলো, শীগ্‌গির চলো। বাঘটা কোন দিকে গেছে আর্জান ?

আর্জান আঙুল চিয়ে দেখিয়ে দেয়। তখন ওসমানের ইঙ্গিতে ওরা উল্টো দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

অবশেষে নদীর ধারে এসে ওসমান আর্জানকে বলল,—শিকারীর সামনা-সামনি হলে বড়মেঞা তাড়া করবেই, কখনও সে পালায় না। শিকারীর সঙ্গে দেখা-দেখি না হলে লুকোচুরি খেলবে। লুকিয়ে লুকিয়ে এমন স্থানে চুপি-চুপি আসবে, যেখান থেকে সে এক দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে শিকারীর ওপর।

আর্জান ব্যগ্র হয়ে বলল,—তা হলে তো বড়মেঞা এখানেই আছে।

বৃদ্ধ ওসমান বলল,—না, খবরদার! গুলি করার পর ওদের পিছনে যেতে নেই। ক্ষিপ্ত বাঘের সামনে গেলে, বাঘ হয়ত মারা যাবে, কিন্তু সে-বাঘ গুলি খেয়েও একজনকে সাবাড় করবেই করবে। চলো, শীগ্‌গির চলো। দরকার নেই আমাদের এই শিকারে।

সবাই ফিরে এল। দুপুর গড়িয়ে গেছে।

আর্জান উঠানে এসেই বলল,—আম্মা, শীগ্‌গির ভাত দাও। জানো, আমি আজ বাঘ দেখে এসেছি! হলদে রঙ্‌! বিড়ালের মত চুপি-চুপি পালিয়ে যায়!

মা বললেন,—তুই না বললি হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ, আমি তো গাছেই বসে ছিলাম! জানো, বাঘটা আমার ঠিক নিচে দিয়ে চলে গেলো!

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মা বললেন,—যাক্ বুঝেছি, বন,···বন,···বনেই আমার আবার মরণ আছে!

আর্জান মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। মা তাতে কান না দিয়ে, মনে মনে বনবিবিকে মানত্‌ করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

সাত

মা চিন্তায় পড়লেন। আর্জানের মন এখন বন, বাঘ ও শিকারে পেয়ে বসেছে। কাজেই ঠিক করলেন, আর্জানের বিয়ে দিয়ে দেবেন ; তাতে যদি আর্জানের মন সংসারের দিকে ফিরে আসে !

আর্জানও বিশেষ আপত্তি করে না। চাষীর ছেলেরা অল্প বয়সেই বিয়ে করে। আপত্তি না করার আরও কারণ হল, মা কলিমের মেয়ে ফতিমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ঠিক করেছেন।

আর্জানের অসীম শ্রদ্ধা ছিল কলিমের উপর। শুনেছে, কলিমের সাহস ভয়ানক। সে বাউল ; মন্ত্র দিয়ে বাঘ তাড়ায়। মন্ত্র আউড়ে বাঘের সামনে এগিয়ে যায়। বাঘের মুখ থেকে হরিণের মাংস কেড়ে এনে মাংস খাওয়ার সখ মেটায়। মন্ত্রে আর্জান বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু সবাই মিলে যখন কলিমের বাঘের মুখ থেকে মাংস আনার গল্প করে, তখন আর্জানের মনে সন্দেহ জাগে,—হয়ত বা হবে !

কাজেই কলিমের মেয়ের সঙ্গে যখন বিয়ে ঠিক হল, তখন আর্জান মুখ ফুটে না করতে পারেনি। মনে মনে ভাবল—হোক্ না কালো, বড় হলে ভারি কাজের মেয়ে হবে। কতদিন সে তাকে দেখেছে, বউ সেজে ঘোমটা দিয়ে রান্নাবাড়ি খেলতে। বনবিবির উৎসবের দিনে ফতিমার দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে যায়। কেমন যেন মায়া জাগে—ফতিমাকে সে ঘরের বউ করে আনবে !

বিয়ে হয়ে গেল। এর পর আর্জান কলিমের খুব প্রিয় হয়ে উঠল। সুযোগ পেলেই সেও কলিমের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়।

একদিন কলিম বলে,—চল্ আর্জান, আজ বনে মাছ মেরে আসি। আজ অমাবস্যার যোগ আছে। রাত্রে ভাল মাছ পড়বে।

আর্জান খুব খুশি হয়েই ছোট ডিঙি ও জাল নিয়ে কলিমের সঙ্গে চলল। বনে অজস্র ছোট ছোট খাল ক্রমেই সরু হয়ে এঁকে-বেঁকে কিছু দূর গিয়ে বনের চত্বরে মিশে গেছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এই সব খাল জোয়ারের জলে ভরে যায়। তখন মাছও ঢুকে পড়ে প্রচুর।

পুরো জোয়ারে মাছ ঢুকে পড়লে খালের মুখ জাল দিয়ে ঘিরে বসে থাকতে হয়। ছয় ঘণ্টা পরে ভাটির সময় সব জল বেরিয়ে যায় নদীতে। তখন এই জালে মাছ ধরা পড়ে। বড় বড় মাছ। এক একদিন মাছে ডিঙি বোঝাই হয়ে যায়। কোন কোন সময় এক মন, দুই মন ওজনের কই-ভোল মাছও ধরা পড়ে।

কাজেই অমাবস্যার জোয়ারে বনে মাছ ধরতে এদের উৎসাহের সীমা নেই।

দুজনে মিলে গভীর বনে প্রবেশ করল। ছোট্ট একখানা ডিঙি ; একটা জাল ও একটা কেরোসিনের কুপি। চারিদিকে ঘন অন্ধকার !

আর্জান একবার বলল,—বন্দুকটা আনলে হতো !

কলিম বলল,—দূর বোকা ! এই অন্ধকারে বাঘ দেখতে পেলে তবে তো বন্দুক চালাবি ! ভয় নেই তোর, বড়মেঞা আমাদের কাছে আসতেই পারবে না !

বনে পা দিতেই সুন্দরবনের লোকেরা বাঘ নামটা মুখে আনে না। তখন ওরা বাঘকে 'বড়মেঞা', 'বড় শেয়াল', 'বড় হরিণ', 'ভোঁতড়' 'কাবলিওয়ালা' প্রভৃতি বলে পরিচয় দেয়।

খালের মুখে এসে কলিম ও আর্জান জালের খুঁটি পুঁততে থাকে।

আর্জান হঠাৎ ভীত হয়ে বলল,—দেখ তো ! ঐ যে সাদা কি একটা দেখা যায় !

কলিমের সবাইকে ভরসা দেবার অভ্যাস : তাই, না দেখেই বলল, —ভয় নেই তোর ! দেখছি !

কলিম এসে দেখে, সত্যিই কি একটা সাদা যেন ! ঘোর অন্ধকার কুপির আলোতে আর কিছু বোঝার উপায় নেই।

কলিম একাই এগিয়ে যায়। দেখে, একখানা সাদা গায়ের চাদর পড়ে আছে। কলিমের ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। চাদরটা কুপির আলোতে আনতেই দেখা গেল, সত্য কাঁচা রক্তের দাগে ভরে আছে।

কলিম একবার আর্জানের মুখের দিকে তাকিয়ে কাজে লেগে গেল। কাজে লাগল বটে, কিন্তু আর্জানকে দু-একবার আড়ঃ নজরে দেখে নিল।

বলল,—কিরে আর্জান, অমন করে দেখছিস কি ?

আর্জান ভাঙা গালয় বলে,—না! কিছু না!

কলিমের এই নাবালকের প্রতি মমতা জাগে। একটা খুঁটি তুলে বলল,—চল্ তবে,······আজ এখানে মাছ মারব না! ঐ মানুষটাকে একটু আগেই নিয়ে গেছে। তারাও এসেছিল এখানে মাছ ধরতে।

কলিম জাল গুটিয়ে ওখান থেকে চলে এলো বটে, কিন্তু বেশি দূর নয়। পাশেই আরেকটা খালে ঢুকে আবার জাল পাততে লাগল।

খুঁটি ও গাছের গুঁড়িতে জালের মাথা বাঁধা হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। এইবার কলিম কাপড় ছেড়ে জলে নেমে পড়ল। ডুব দিয়ে জালের গোড়া খুঁটি দিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিতে হবে।

বলল, –আয় আর্জান, জল্দি আয়! এখন ভয় নেই, জোয়ার পুরে গেছে ; কুমীর আর খালের মধ্যে ঢুকতে আসবে না। আরে! বাদার লোকের কুমীর আর বড়মেঞাকে কেয়ার করলে কি চলে! হ্যাঁ, ভয় একটা জিনিষের আছে। সেটা হলো দৈত্য। তবে কি জানিস! দৈত্য এখন আসে না—তারা আসে বোশেখ মাসে। তার এখন অনেক দেরি ; তারা কিন্তু মন্ত্র-টন্ত্র মানতে চায় না!

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে ওরা ডিঙিতে আসে। বাড়ি থেকে আসবার পথে দুটো তালপাতা কেটে এনেছিল। কাঁথা মুড়ি দিয়ে তার উপর তালপাতা চাপা দিয়ে কুপিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। ভাটি শেষ হলে জাল থেকে মাছ তুলতে হবে। ছয় ঘণ্টা রাত কাটাতে হবে। নিঃশব্দে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। পৌষ মাসের শীতের হিম—ঝর্ঝর্ করে সারা বনে গাছের পাতা বেয়ে পড়ছে।······অল্পক্ষণের মধ্যে টপ টপ টপ করে ওদের তালপাতার ওপরও পড়তে থাকে।

বাদার ছেলের বনের হাতেখড়ি চলে !

আট

আর্জান এতদিনে সাবালক হয়ে উঠেছে। বন্দুকও সে জুটিয়েছে। কিন্তু আবাদে শুধু পাখি মেরে সাবালক হওয়া যায় না। মাদারের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ চলল। হরিণ মারতে তারা যাবে। সুন্দরবনে হরিণ মারা সহজও বটে, আবার দুরূহও বটে। অগুনতি হরিণ বনে চরে বেড়ায়। কিন্তু হরিণ এত সজাগ যে, একটু শব্দ হলেই এমন ছুট দেবে যে গুলি করার অবকাশ দেয় না। ঘ্রাণ শক্তিও ওদের প্রখর। বাতাস শিকারীর কাছ থেকে হরিণের দিকে বয়ে গেলে, আধ মাইল দূর থেকেও ওরা মানুষের গন্ধ পাবে। তখন ওরা আর সে-মুখো হবে না।

কিন্তু মানুষেরও বুদ্ধির অভাব নেই। হরিণের মত এমন ক্ষিপ্র, সজাগ, চঞ্চল এবং হুঁশিয়ার প্রাণীকে বুদ্ধিভ্রম ঘটাবার পন্থাও সে বের করেছে।

সুন্দরবনে বানরও আছে অজস্র। এই বানর ও হরিণে অত্যন্ত প্রীতি। বানর যখন ঝাঁকে ঝাঁকে কেওড়া গাছে ফল খেয়ে বেড়ায়, তখন ডাল ভেঙে ভেঙে হরিণকে পাতা খেতে দেয়। গাছের উপর থেকে দূরে কোনও বাঘ বা শিকারীকে দেখলেই বানরগুলি এক সঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে ; আর তখন হরিণগুলিও সচকিত হয়ে পালিয়ে যায়। হরিণকে অবশ্য এই সাহায্যের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। বানরগুলি মাঝে মাঝে হরিণের পিঠে চড়ে বেড়ায়। 'বানরের বাঁদরামি সর্বত্রই সমান'।

সুন্দরবনের মানুষ এই ব্যাপার লক্ষ্য করে হরিণ শিকারের সহজ পথ বের করেছে। এই পদ্ধতিকে 'গাছাল শিকার' বলে। কেওড়া গাছ সাধারণতঃ নদীর তীর ধরে হয়। খুব ভোরে, না হয়

বেলা তিনটের সময় এমনি একটা গাছে চুপেচুপে উঠে বসবে। সুন্দরবনের প্রায় সব নদীই উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে। কাজেই সূর্য পুব আকাশে বা পশ্চিম আকাশে থাকলে নদীর কূলে এই সব কেওড়া গাছের তলায় রোদ বেশ ভাল ভাবেই পড়ে। হরিণের পাল তখন গাছের তলায় আসে সেই রোদ আর কেওড়া পাতার লোভে। সুযোগ বুঝে শিকারীরা গাছে বসে বানরের মত ডাকে বা বানরের মত কিচিরমিচির শব্দে ঝগড়ার নকল করে ; আর সেই সঙ্গে ডাল ভেঙে ভেঙে মাটিতে ফেলতে থাকে। হরিণের তখন মতিভ্রম ঘটে। হরিণ উপর দিকে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। তারা দল বেঁধে অতি নিশ্চিন্ত মনে এই গাছের তলায় পাতা খেতে আসে। শিকারীরা সেই সুযোগে দেখে ও বেছে দল থেকে পুরুষ-হরিণ মারে। 'মায়া-হরিণ' মারা সুন্দরবনের মানুষেরা অগৌরবের মনে করে।

মাদার ও আর্জানের পরামর্শ চলে। মাদার তার বাজানের কাছ থেকে বানর ডাকা আগেই শিখে নিয়েছে। আজ সারা সকাল ধরে আর্জান সেই ডাক নকল করতে ব্যস্ত।

মাদার বলল,—নে, আর করতে হবে না, এখন তাড়াতাড়ি চল্! বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। দেবতা মাথা ছাড়ালেই গাছে উঠতে হবে।

আর্জান ব্যস্ত হয়ে বলল, -বন্দুকও যে এখনও গাদা হয়নি! জালের কাঠিগুলো কই ? দে শীগ্‌গির দে!

সব গুছিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ছোট্ট ডিঙিখানা নিয়ে দুজনে গভীর অরণ্যে চলল। ত্রিমোহানা ছাড়িয়ে এক ছোট নদীতে পড়েছে। দুজনের গায়েই গেঞ্জি ও সঙ্গে একখানা গামছা।

কোমরে জড়ান গামছা থেকে একটা বিড়ি বের করে মাদার আর্জানকে বলল,—নে, একটু ধোঁয়া টেনে নে!

—এখন কেন ?

—কেন আবার কি! গাছে উঠলে কি বিড়ি খেতে পাবি! সর্বনাশ! তাহলে ধারে-কাছেও হরিণ বিড়ির গন্ধে আসবে না।

বিয়ের পরও তোর বুদ্ধি হলো না! দেয় তোকে বিড়ি খেতে এক বিছানায়!

আর্জান চুপচাপ যুক্তি মেনে নিল। মাদারকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। মাদারের মুখ বড় খোলা।

বনের তিন মাইল ভিতরে চলে এসেছে। কাছেই একটা পাশ-খাল। খুবই সরু। জায়গাটার নাম মানিকচক। মাদারের চেনা জায়গা। পাশ-খালে ঢুকেই মাদার ডিঙি ভেড়াল।

মাদার বলল,—ঐ ছ্যাখ, ঐ গাছটা। এই পথ দিয়ে চল। গাছপালার শব্দ হয় না যেন! দেখছিস্ কি? এখনও হরিণ আসেনি!

বন্দুকটা আর্জানের। মাদারের বড় ইচ্ছা, সে বন্দুকটা 'চোট্' করে। কিন্তু আর্জান যে-ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে, তাতে সহসা বন্দুকটা চাইতেও তার সঙ্কোচ আসছে। মাদার সঙ্কোচ কাটাতে চায়। বেশ দৃঢ়ভাবে বলল,—তুই দেখি কিছুই জানিস্ নে। নে, চল্ এগিয়ে চল্।

আর্জান গাছের তলায় এসে বলল,-দেখছিস, কত হরিণের পায়ের দাগ। আজ সকালেও ওরা একপাল নিশ্চয়ই এসেছিল।

মাদার মাতব্বরের সুরে বলে,—আসুক! ওরা ওম্‌নি রোজই আসে। নে, এখন গাছে উঠে পড়। খবরদার! গাছে উঠে কিন্তু কথা নেই, ইশারায় কথা সারবি। কথা বলেছিস্ কি হরিণ আসবে না।

এত হম্বিতম্বি করেও মাদার বন্দুক চাইবার সঙ্কোচ কাটাতে পারে না। আর্জানের ওপর মাদারের অপরিসীম মমতা। ওরা গাছে উঠে বসল। নতুন শিকারীদের মত সব চেয়ে উঁচু ডালেই উঠে বসল। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মাদার ইঙ্গিত করল এবার বানর ডাকতে। দুজনে একের পর একে বানর ডাকতে আরম্ভ করে। নিঝুম বনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ওদের এতক্ষণ গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। বানর ডাকা আরম্ভ করতেই যেন বুকে বল এল।

এক একবার বানর ডাকা শেষ হলেই আর্জান ব্যগ্র হয়ে এদিক ওদিক হরিণ খুঁজতে থাকে।

মাদার ইঙ্গিতে বলে, দেরি আছে, দেরি আছে!

কিছুক্ষণ পরে আবার বানর ডাকা চলে। এবার ওরা বানরে বানরে ঝগড়ার নকল করল, আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডাল ভেঙে ফেলে দিল।

কিন্তু হরিণের দেখা নেই। এইভাবে দু-ঘণ্টা কেটে যায়। বেলা গড়িয়ে এসেছে।

ইঙ্গিতে মাদার বলে, --চল্, আর বোধহয় আসবে না।

আর্জানও ইঙ্গিত করে, —দাঁড়া, আরেকটু দেখে যাই।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। বনে অন্ধকার বেশ আগে থাকতেই নেমে আসে। সূর্য তখনও আকাশে। তবুও বনের আলো নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ দূরে একটু শুকনো পাতার শব্দ। যেন পায়ে চলার শব্দ।

আর্জান ও মাদার কান খাড়া করে। দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ করে শব্দের দিকে। আর্জান চুপেচুপে ডান হাতখানা দিয়ে বন্দুকের ঘোড়া অনুভব করে নেয়। ঘোড়াটা তুলেই দেয়।

হলুদ রঙের কি একটা আসছে! হরিণই বোধহয়। কিন্তু এতো ছোট কেন? হয়ত বাচ্চা।

ধীর পদক্ষেপে আসছে না। হঠাৎ এক-একবার ছুটে ছুটে আসছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওরা প্রতীক্ষা করে। মাদার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ডাল ধরে রাখে। আর্জান বন্দুক উঁচিয়ে ধরে।

মাদার ইশারায় দেরি করতে বলল।

খস্‌খস্ শব্দে শুকনো পাতার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় ওদের গাছের নিচে এলো।

এ কি! বাঘের বাচ্চা!! কি একটা যেন সে লক্ষ্য করেছে। শিকারী বিড়ালের মত চার পা ভেঙে বসে লেজ নাড়ছে। এবার বুঝি সে লাফ দেবে তার শিকারের উপর।

আর্জান কানের কাছে বন্দুক নিয়ে টিপে আঙুল দিয়েছে। মাদার নিশ্চল।

আওয়াজের সঙ্গে বাঘের বাচ্চা পড়ে গিয়ে আবার উঠে

কয়েক কদম ছুটে গেল। চিৎকার করতে করতে ঢলে পড়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বারুদের গন্ধ আর লব্ধ ব্যাঘ্র শিকারে আর্জানের মুখে শক্তিমত্তার হাসি ফুটে উঠল।

মাদারের মন ফাঁকা। ব্যাপারখানা কি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। থতোমতো খেয়ে গেছে। আর্জানকে নামবার জন্য তৈরি হতে দেখে শুধু একবার হাতের ইশারায় দেরি করতে বলল।

মুহূর্ত মধ্যে হুড়মুড় করে কি যেন আসছে! ঝোপঝাড় ভেঙে সারা বন কাঁপিয়ে দিয়ে তীরবেগে আসছে।

বাঘিনী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছে। এদিক-ওদিক একবার দেখে নিজের মৃত বাচ্চার নিকটে গেল। সস্নেহে কয়েকবার জিহ্বা দিয়ে লেহন করল।

তারপর মাথা উঁচু করে হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে তাকাল নদীর দিকে। তখনও সে হাঁপাচ্ছে! দীর্ঘ জিহ্বা লক্ লক্ করছে। চোখ দুটো দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে, বলিষ্ঠ বাহুর মাংসপেশীগুলি যেন দুলছে। গায়ের লোমগুলো ফুলে উঠেছে। চোখের উপর বিক্ষিপ্ত ভ্রূসম কালো রেখাগুলি রাগে ওঠা-নামা করছে। চাপা গর্জনের সঙ্গে লালা ছিট্‌কে পড়ছে।

এই ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে আর্জান ও মাদার যেন পাথর হয়ে গেছে। বাঘিনী ওদের আক্রমণ করবে কিনা, বা, আক্রমণ করলে ওরাই বা কি করবে—কিছুই ওদের চিন্তা করবার শক্তি নেই। যেখানে হাত পা ছিল, যে-ভাবে বসে ছিল, সে-ভাবেই আছে। নিঃসাড়ে নিঃশ্বাস নিতে গেলেও যেন বাঘিনী বুঝে ফেলবে। দুজনেই নিস্তব্ধ। বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে। কোন শক্তি নেই, চোখের পলকেরও যেন শক্তি নেই। তাকিয়ে আছে, না চোখ বুজে আছে—সে চেতনাও যেন ওদের নেই!

চাপা গর্জন করতে করতে বাঘিনী গাছের দিকে ছুটে এল।

কিন্তু বাঘিনী গাছের তলায় না থেমে, সোজা নদীর ধারে দৌড়ে

গেল। মুহূর্ত মধ্যে আবার ছুটে গিয়ে তার বাচ্চাকে চাটতে লাগল।

এমনিভাবে একবার, দুবার, তিনবার—বার-বার নদীর তীর পর্যন্ত ছুটে যায়, আবার ছুটে আসে বাচ্চার কাছে।

নিঝুম বন আরও নিঝুম হয়ে গেছে। বনে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কোথাও একটা পাখিও ডাকে না। কিন্তু বনের এই অংশ তোলপাড় করে তুলেছে ক্ষিপ্ত বাঘিনী। ওর সন্তানের হত্যাকারী নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও আছে এবং ঐ নদীর ধারেই আছে—এই ওর ভীষণ সন্দেহ।

ব্যাঘ্র হিংস্র। বোধ হয় সবচেয়ে হিংসুটে জানোয়ার। তাহলেও বাঘ ও বাঘিনীতে ভালবাসাও আছে, আদরও আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সন্তানের প্রতি বাঘের এতটুকুও মমতা নেই। বাচ্চাকে দেখলেই তেড়ে মেরে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু বাঘের মমতা না থাকলে কি হবে, বাঘিনী মা। সন্তানের প্রতি তার মমতা—মায়ের মমতা।

বাচ্চা একটু বড় হলেই বাঘিনী তাকে নিয়ে চরতে বেরোয়। বাঘিনী তখন কিন্তু বাচ্চার কাছে থাকে না। বাচ্চা যেখানে খেলে ও চরে, তার থেকে সিকি মাইল দূরে বাঘিনী চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়,—কোথায় কখন বাঘ এসে পড়ে তার বাচ্চাকে খেয়ে নেবে। বাঘ এলে, বাঘিনী তার সঙ্গে ঝগড়া করে না, মল্লযুদ্ধও না। তার সঙ্গে সে পিরীত করে। তাকে ভুলিয়ে অন্য দিকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে তাকে পথ ভুল করিয়ে দিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ পালিয়ে বাচ্চার কাছে চলে আসে। আবার পাহারা দিতে থাকে।

বাচ্চাওয়ালা বাঘিনী এইভাবে ভালবাসার খেলা খেলে বাঘের হাত থেকে তার সন্তানকে বাঁচায় বটে, কিন্তু অন্য কোনও জীবের বেলায় তার হিংস্রতার তুলনা নেই। তাই বাচ্চাওয়ালা বাঘিনীর পেছনে শিকারীরাও সহসা যেতে চায় না।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। আর্জান ও মাদার

পরস্পরকে মাত্র ছায়ার মত দেখতে পাচ্ছে। দূরে শুধু বাঘিনীর চোখ দুটো ঘোর অন্ধকারে চক্‌চক্‌ করে যেন টর্চের মত জ্বলছে।

আর্জানের কাছে বন্দুক আছে। কিন্তু গাদা বন্দুক। একটা গুলিতে যে বাঘিনীকে ঘায়েল করতে পারবে, সে ভরসাও নেই; তা ছাড়া, থলে থেকে বারুদ নিয়ে, জালকাঠি নিয়ে বন্দুকে গেদে যে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ পাবে, সে অবস্থাও নেই। আর্জান ও মাদার এতক্ষণে একটু আত্মস্থ হয়েছে বটে, কিন্তু কোন শব্দ করবার সাহস নেই।

বাঘিনীর লক্ষ্য ডিঙিখানি। গোঁ গোঁ করে ছুটে যায় তার কাছে, আবার ফিরে আসে। হঠাৎ তার মনে হয়, এই বুঝি ডিঙির মালিক পালাল! উন্মত্ত হিংস্রতা নিয়ে সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে যায় তীর বেগে। আবার ফিরে আসে।

অনেক রাত হয়ে গেছে। একভাবে বসে থাকতে না পেরে আর্জান একটু নড়ে বসতে গেছে আর অমনি তার কোল থেকে বন্দুকটি ধপ্‌ করে মাটিতে পড়ে গেল। অতো উঁচু থেকে পড়ে বেশ শব্দ হয়ে উঠল। মুহূর্ত মধ্যে শব্দ লক্ষ্য করে বাঘিনী গাঁ গাঁ করতে করতে ছুটে এল।

আর্জান ও মাদার দুজনেই এবার প্রমাদ গোনে। এবার বুঝি রক্ষা নেই! বাঘিনীর আর বুঝতে বাকি থাকবে না। আর্জানের মনে স্পষ্ট ফুটে উঠল, বাঘিনী কেমন করে এই গাছে উঠবার চেষ্টা করবে। সে কি আরও উঁচুতে উঠবে? গর্জন করতে করতে কেমন করে বিড়ালের মত সামনের হাতা বাড়িয়ে গাছে উঠে ওদের তেড়ে আসবে! এলে আগেই ওকে ধরবে। মাদার পাশের ডালে আছে। সে কি এখন মাদারের কাছে এগিয়ে যাবে? যেতে গেলে যদি শব্দ হয়!

আর্জান ভুলেই গেছে,—কলিম ওকে বলেছিল যে বাঘ হেলান গাছে ছাড়া উঠতে পারে না। বাঘিনীর গর্জনে সব গুলিয়ে গেছে।

কালো রঙের বন্দুক বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। শব্দ লক্ষ্য করে বাঘিনী ছুটে এলো ঠিক ওদের নিচে। দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। রাগে যেন দাঁড়াতে পারছে না; ছট্‌ফট্‌ করছে। সাঁ করে মাথা নিচু করে ছুটলো ঐ ডিঙিখানার দিকে। আগের মতই মুহূর্ত মধ্যে ফিরে

এল বটে, কিন্তু ফিরে এল ঐ গাছতলাতেই। গাছের চার পাশে কয়েকবার ঘুরে আবার ফিরে গেল তার বাচ্চার কাছে।

বনের শীত যেন কনকনে। রাতও হয়ে গেছে। হাত পা অসাড় হয়ে এসেছে। ওরা ডাল ধরে বসে আছে; কিন্তু আঙুল অবশ, ডাল জোর করে ধরেছে, না আস্তে ধরে আছে,—তা বুঝতেই পারছে না। ওদের গায়ে একটা গেঞ্জি মাত্র।

ওকি! মাদার ঢুলছে কেন? ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে! পড়ে যায় যায় যেন! আর্জানের ইচ্ছা হল, ওকে একবার জোর করে ডাক দেয়। কিন্তু আতঙ্কে তার স্বর গলায় আটকে গেল। শব্দ না করে ফিস্‌ফিস্ করে একবার ডাকল,—মাদার! মাদার!

কোন সাড়া নেই। মাদারের দেহখানা এক ডাল থেকে নিচে আরেক ডালে শব্দ করেই পড়ল। বাঘিনী গর্জন করে উঠল দূর থেকেই। আর্জান দিশেহারা হয়ে জোরে চিৎকার করে উঠল,—মাদার! মাদার! মাদারের চেতনা নেই। সেই ডাল থেকেও গড়িয়ে তার দেহখানা ঝপ্ করে মাটিতে পড়ল। বাঘিনী তীরের মত ছুটে আসছে। আর্জান বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরল সামনের ডালখানা। আর্জানের চোখ বুঝি একবারের জন্য বন্ধ হল। মুহূর্ত মধ্যে বাঘিনী তার সমস্ত রাগ ও হিংসা নিয়ে গক্ করে মাদারকে কামড়ে শূন্যে উঁচু করে ধরে কয়েক পা ছুটে গেল। ফেলে দিল মাদারকে। দু-পা পিছিয়ে গাঁ গাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার কামড়াল। বন থর্-থর্ করে কাঁপছে হিংস্র গর্জনে। ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলল মাদারের দেহখানা। অন্ধকারে তার রক্তপানের লোলুপতা কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু তার এক-এক গর্জনে, আর এক-এক লম্ফে বোঝা গেল—বাঘিনীর হিংস্রতার, সন্তান হত্যার প্রতিশোধ। শুকনো গাছের পাতা বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। খণ্ডিত দেহের টুকরো এদিক ওদিক ঝপঝপ্ করে ছিট্‌কে পড়ল।

আর্জানের হতভম্ব মনের সামনে কলিমের ছবি একবার দেখা দিল, পরের মুহূর্তেই মনে পড়ল, সে একা। গভীর অরণ্যে, গাঢ় অন্ধকারে

হিংস্রতম গর্জনের সামনে সে একা। তারও মাথা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সেও কি পড়ে যাবে!

বাঘিনীর হিংস্রতা এতক্ষণে যেন কমে এসেছে। রক্তের আস্বাদে তার বোধ হয় ক্ষুধার বৃত্তি জেগে উঠেছে। অন্ধকারে তাতেই সে ব্যস্ত বলে মনে হল।

আর্জান শিরদাঁড়া সোজা করল। মাথায় এক ঝাঁকা মেরে মনের বেদনা ও ভীতি দূর করতে চাইল। নিজেকে সে পড়তে দেবে না। কিছুতেই না। কোমর থেকে তাড়াতাড়ি গামছা খুলে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে জোরে বেঁধে নিল।

বাঘিনী তারপর আর গাছের তলায় আসেনি। কিন্তু সে যে নিকটেই আছে তা ঝোপঝাড়ের শব্দে বেশ স্পষ্ট। শীতের বাতাসের সঙ্গে বাঘিনীর গন্ধও আর্জান অনুভব করছে।

আর্জানের মন স্থির হয়ে এসেছে। মাদার!—মাদার তো আর নেই। কেন তাকে ডাকলো না? সেও তো ইচ্ছা করলে গামছা দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিতে পারত!

দূরে পাখি ডেকে ওঠে। ভোর হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো বনের শীতের শিশিরসিক্ত গাছের পাতায় এসে পড়ল।

অস্পষ্ট আলোয় আর্জান দেখে, বাঘিনী তার মৃত বাচ্চার কাছেই শুয়ে আছে। বাঘিনী উঠে দাঁড়াল। চারদিক কয়েকবার তাকিয়ে বাচ্চাকে মুখে নিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেল। কিন্তু বাচ্চাকে সেখানে রেখে আবার অনেক দূরে পেছনে এল। গতি তার মন্থর। দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে মুখে নিয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কালবিলম্ব না করে আর্জান গাছ থেকে নেমে বন্দুকটা নিয়েই এক নিঃশ্বাসে তার ডিঙির বাঁধন খুলে দিল। জোরে এক ধাক্কা মেরে ডিঙিখানা ছোট খাল থেকে নদীতে ঠেলে দিল।

নদীতে তখন খরস্রোত। ভাটার টান সাঁ সাঁ করে ডিঙি

ভাসিয়ে নিয়ে চলল। বোঠেখানা হাতে করে আর্জান ডিঙির মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে। গলুইতে বসে হাল ধরতে হবে, তা ভুলেই গেছে। তাকিয়ে আছে গভীর অরণ্যের দিকে। কল্ কল্ করে নদী বয়ে চলেছে। দুদিকে বন। ঘন সেই বন। গাছের গাঢ় সবুজ পাতায় ঢাকা। সে-পাতা ভেদ করে কোন দৃষ্টি বনের ভিতর যায় না। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সাজান বাগান। কোথাও একটা গাছের মাথা যেন উঁচু-নিচু নেই। মনে হয় প্রকৃতিদেবী ছেঁটে-কেটে সমান ভাবে বন সাজিয়ে রেখেছেন। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সামান্য শিষ দিলেও প্রতিধ্বনি ওঠে বনে। সবুজ এই বন, শান্ত এই বন, শূন্য এই বন!

আর্জান ধীরে ধীরে ডিঙির গলুইতে এসে বসেছে। হাল ধরেছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জন্য। বসেই দেখে সামনে মাদারের বোঠেখানা পড়ে আছে। তুলে ধরে সেখানা। দুই বাহু উর্ধ্ব করে শূন্যে তুলে ধরে। চোখ দিয়ে তার ঝর্ ঝর্ ধারে জল গড়িয়ে পড়ে। তারপর······বর্শার মত করে নদীর বক্ষে বোঠেখানা ছুঁড়ে মারল দেহের সর্বশক্তি দিয়ে। গোটা বোঠেখানা সবেগে বিঁদ্ধ হয়ে গেল নদীর বক্ষে। ছুঁড়ে ফেলেই আর্জান ক্ষিপ্র বেগে পাগলের মত ডিঙি চালাতে লাগলো মানিকচককে পিছনে ফেলে—অনেক পিছনে ফেলে।

নয়

আর্জান বাড়ি এসে প্রথম প্রথম কাউকে কিছু বলতে চায়নি। তার জন্য তাকে নানা মিথ্যার জাল বুনতে হয়েছিল। বলেছিল, —মাদারের কথা সে জানে না; হয়ত সে কোনও আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গেছে। —কিন্তু মাদারও ফিরে আসে না, কোথাও কেউ তার খোঁজও বলতে পারে না।

মাদার আর্জানের শুধু নিকট আত্মীয় নয়। তার অন্তরঙ্গ বন্ধুও হয়ে উঠেছিল। তার মর্মান্তিক মৃত্যু ও তার বেদনা আর্জান একা একা আর বহন করতে পেরে ওঠে না। গুমরে গুমরে মরে যায়। তাই সে আস্তে আস্তে তার সব ঘটনাই বলে ফেলল।

তার মা তাকে এর জন্য ক্ষমা করেন নি। কেননা—এ-বিষয়ে একবার ক্ষমা করলে আর্জান আবার শিকারে যাবার উৎসাহ পেয়ে বসবে।

তার অন্যান্য আত্মীয় এবং তার বউও তাকে ক্ষমা করে নি। উঠতে বসতে তাকে আঘাত করেছে, গালাগালি দিয়েই চলেছে। তার বউ তাকে বলেছিল—মরলে মরলে, নিজে মরলে না কেন? আমার বড়মেঞাকে মেরে এলে কেন?

সুন্দরবনের মানুষেরা হামেসাই কাজে অকাজে বনে যায়, আর মাঝে মাঝে বাঘের মুখে মানুষও দিয়ে আসে। এখানে খুন-খারাপি যে হয় না, তা নয়। বনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে খুন করে নদীর জলে লাস ফেলে দিলে কেউ জানবে না, কেউ কোন হদিশও পাবে না। এমন ঘটনাও বহু ঘটে। তাই এখানকার রীতি--বনে দল থেকে কাউকে বাঘে নিয়ে গেলে, বাকি সবাই চেষ্টা করে কিছু সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে আসতে, না হয় বাউলের সাহায্যে আধ-খাওয়া লাসকে গ্রামে নিয়ে আসতে। তা না হলে, সহসা লোকে বিশ্বাস করতে চায় না—বাঘে খেয়েছে, না ওকে খুন করা হয়েছে।

তাই আর্জান অনেকের কাছে সন্দেহভাজন ছিল। আর্জান মাদারের বাঘের হাতে মৃত্যুর কোনও প্রমাণ নিতে পারেনি গাঁয়ের লোকের কাছে। কেউ তাকে ক্ষমা করেনি। কিন্তু ক্ষমা তাকে একজনে করেছিল। কলিমের ক্ষমা সে পেয়েছিল। হাসি, ঠাট্টায়, গানে, আমোদে, কলিমের বাড়া কেউ ছিল না। কিন্তু মাদারের মৃত্যুতে সে প্রায় চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। শুধু বলেছিল, - সাপুড়ের মরণ থাকে সাপের হাতে, আর বোধহয় 'বাঘুড়ের' ছেলের মরণ থাকে বাঘের হাতে।

আর্জানের সঙ্গে দেখা হলেই কলিম বার-বার নানা ভাবে বুঝিয়ে বলতো, —খবরদার! বাঘের বাচ্চা দেখে কেউ কখনও লোভ করবি না। কখনও না। জানিস্ বাউলের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা কি? বড় পরীক্ষা হল, সে বাঘিনীর কাছ থেকে বাচ্চাকে নিয়ে আসতে পারে কিনা? কোন বাউলে আজও পারেনি। তাই সে পরীক্ষা এ যাবৎ হয়নি। খবরদার! বাচ্চাওয়ালা বাঘিনীর কাছেও ঘেঁষবি না।

কলিমের চোখে ক্ষমার আমেজ দেখে আর্জান তার কাছে এসে মাথা নিচু করে বসে। কলিম তার গায়ে হাত দিয়ে বলে চলে :

- জানিস, আমি একদিন কি করেছিলাম? বনের ভিতর দিয়ে বড় 'লাও' নিয়ে কয়েকজনে আসছি। তখন পুরো জো। বন আর নদীর জল প্রায় মিশে গেছে। 'লাও'তে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বনটাকে দেখা যায়। 'লাও'টা প্রায় কিনারা দিয়ে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি, নদীর ধারেই বাঘের একটা ছোট্ট বাচ্চা। কি জানি আমার মনে হল, বাঘিনী খুব কাছে নেই। 'লাও' লাগিয়ে বাচ্চা ধরে নিয়েই একদম মাঝ-দরিয়া পেরিয়ে এলাম। 'লাও' তখন প্রায় অপর পারে এসে পড়েছে। বাচ্চাটাকে লুকোবার জন্য একটা থলের মধ্যে পুরেছি। এমন সময় দেখি, ওপারে বাঘিনী মুখ বাড়িয়ে 'লাও'য়ের দিকে এক-নাগাড়ে তাকিয়ে আছে। সবাইকে বললাম—'ব্যাপার ভাল না!' ভাগ্যি, বাচ্চাটা কোন শব্দ করেনি। শুধু নখের আঁচড়ে খরখর করে থলেটা ছিঁড়বার চেষ্টা করছিল। আমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে

থলে থেকে বাচ্চাটিকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম নদীর এই পারে।

আর্জান বলল,—ফেলে দিলে! জানো, কত টাকায় বেচতে পারতে?

কলিম স্নেহের হাসি হেসে উঠল। বলল:

—কেন ফেলে দিলাম? জানিস্ তারপর কি হলো! বাচ্চা দেখেই বাঘিনী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীর বেগে সাঁতরে এল এপারে। নদীতে তখনও বেশ স্রোত। স্রোত ঠেলে ঠিক সোজা পার হয়ে এল এক নিমেষে!

গল্প শেষ হলে কলিমের মাদারের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে একবার শুধু বলল:

—কেন আমি তোদের এই গল্পটা আগে বলিনি!

* * *

মাদারের মর্মান্তিক ঘটনাও ওরা একে একে ভুলে গেল। যেমন করে শহরের মানুষ ভুলে যায় কলেরার মৃত্যুকে। বনে কিছু মানুষের জীবন যে দিতে হবে, ওরা এটা ধরেই নেয়! এমন সংসার আবাদে একটিও মিলবে না, যাদের একজন না একজন বনে প্রাণ দেয়নি। এ যেন বনের সঙ্গে আবাদের মানুষের নিয়ত সংগ্রাম চলেছে। বনের উপর কে আধিপত্য করবে তারই যেন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কখনও বা বনচারী মারা যায়, কখনও বা আবাদের মানুষ। দুজনই করে জীবিকার সংগ্রাম।

এক শীত ঘুরে আরেক শীত শেষ হয়ে এল। চাষীদের ধান তোলা, ধান মাড়াই করা ও গোলা-জাত করা শেষ হয়ে গেছে। গোলা-জাত করবেই বা কি আর! জমিদারের নায়েবরা দূর থেকে এসে তাড়াতাড়ি সব বিক্রি করে দিল। আগামী চাষের সময় চাষীদের কিছু ধান দিতে হবে বলেই কাছারির গোলায় কিছু রাখা হয়েছে অবশ্য।

এবার বেশ ভাল ধান হয়েছে। হলে কি হবে! চাষীদের গত বছরের দেনা শোধ দিতে হল। আর্জানও গত বছরে কিছু

ধান কর্জ নিয়েছিল। এবার দেড়া-বাড়ি সুদ দিতে হল। না দিলে আগামী বছর চক্রবৃদ্ধি সুদে ডবল্ ধান দিতে হবে। আর্জান চোখ-কান বুঁজে ধান শোধ দিয়েছে।

ধনাই আর্জানের বাড়ির উঠানে বসে ছিল। সকালের সুন্দর রোদ তার আধপাকা চুলে পড়ে চক্‌চক্ করছে।

ধনাই বলল,—আর্জান, কেন তুই শোধ দিলি! নায়েব তো বলছিলো সামনের সনে দিলে হবে।

আর্জান বলল,—হ্যাঁ! আমি চক্রবৃদ্ধির কলে পড়ে যাই আর কি! প্রতি সনেই খালি হাতে ঘরে ফিরি।

—তাতে আর কি হয়েছে। এই তো আমি যা ধান পেয়েছিলাম, সব দিয়ে এসেছি। তাই বলে কি নায়েব আমাকে খেতে দেবে না! না খেতে দিলে জমি চাষ করবে কে?

—না মামু! তুমি বোঝ না, অমন হলে শেষে একদিন জমি থেকে তোমাকে তুলে দেবে।

—কী!! আমাকে তুলবে! তুলুক দেখি আমাকে, কি করি আমি ওর!—ধনাই গর্জে ওঠে।

ধনাই-এর সাহস অপরিসীম। এক সময়ে সে ডাকাতের সর্দার ছিল। সত্যসত্যই ডাকাতি করত। এখন সে ডাকাতি করে না বটে, কিন্তু দাপটি করে। কারণ ওকে সবাই ভয় করে, সবাই ওর কথা শোনে। ওর কথায় কালিকাপুরের লোক উঠবে বসবে। তাই নায়েবও ওকে ভয় করে।

ধনাই বলল,—তা তো হলো! এখন চল্ যাই কিছু আয়-টায় করা যাক্। চল্ যাই, মধু কেটে আনি।

বনের কথা শুনেই আর্জান দরজার ফাঁকে আম্মার দিকে তাকাল। মাও তাকিয়েছিলেন আর্জানের দিকে। কিন্তু মা কোন ইঙ্গিত করলেন না। ধনাই কিছু বললে, গ্রামের আর কেউ কিছু বলে না। তাছাড়া এই সেদিনও ধনাই আর্জানকে গোলপাতা কাটতে বনে নিয়ে গিয়েছিল।

বনে যাওয়ার কথায় আর্জান এক পা। পেটপুরে নাস্তা খেয়ে বনে মধু কাটার জন্য তৈরি হল। ধনাই, আর্জান ও কফিল। কফিল ধনাই-এর আশ্রিত। নিজে খেতে বিশেষ না পেলেও ধনাই অনেককে আশ্রয় দেয়। ডাকাতের সর্দারের অনেক গুণ তার আছে। লোকে বলে, এই সব লোক দিয়ে সে নাকি এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকাতি করে।

মধু কাটতে তিনজন লোক চাই। একজন চট মুড়ি দিয়ে গাছে উঠে কাস্তে দিয়ে চাক কাটে। আর একজন লম্বা কাঁচা বাঁশের মাথায় মশাল জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়ায়। আর তৃতীয় জন একটা বড় ধামা হাতে চাকের নিচে দাঁড়ায়,—যাতে চাক কাটা শুরু হলে, সেগুলি মাটিতে না পড়ে ধামার মধ্যেই পড়ে। যে-সে কিন্তু মৌচাক কাটতে পারে না। লোকে বলে, মন্ত্র জানা চাই। মন্ত্র দিয়ে মৌমাছিকে ভুল পথে চালিত করতে হয়। তা না হলে, একবার শত্রুর খোঁজ পেলে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ছেঁকে ধরে তাকে কামড়ে শেষ করে দেবে। ধনাই মন্ত্র জানে। ধনাই নিজে তাই বলে, কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে ধনাই মামু গোঁয়ার, তাই গোঁয়ারতুমি করেই মধু কাটে। দলের সঙ্গে একটা কলসও থাকে। এক একটা চাক কাটা হলে, মধু ঝেড়ে ঝেড়ে তাতে বোঝাই করা হয়।

মধুর চাক খুঁজতে খুঁজতে গভীর বনে কোথায় গিয়ে হাজির হতে হবে, তার কোন ঠিকানা নেই।

শীতের শেষে সুন্দরবনে নানা গাছে ফুল ধরেছে। গরান গাছের ছোট ছোট ফুল। হলদে রং। সকাল থেকে ফুলের গন্ধে, হলুদ রঙে আর মৌমাছির গুঞ্জনে বন মেতে উঠেছে। ঝিরঝিরে বসন্তের হাওয়ায় ওদের তিনজনের মনে স্ফূর্তি আর ধরে না।

ডিঙি করে অনেক দূর বনের ভিতর গিয়ে তিনজনে ডাঙ্গায় উঠেছে। মনের আনন্দে একটার পর একটা মধুর চাক কেটে চলেছে। মধুতে কলস প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। মধুর চাক পেলে অবশ্য তিন-

জনের কাজ ভাগ করাই আছে। কিন্তু তার আগে সবাইকেচাক খুঁজে বেড়াতে হয়। চাক খুঁজবার পন্থা হল, মৌমাছি ফুল থেকে মধু নিয়ে কোনদিকে ছুটে চলেছে তা লক্ষ্য করা এবং তার পিছু পিছু সেদিকে যাওয়া। এই ভাবে খুঁজতে গিয়ে তিনজনের প্রায়ই একত্রে থাকা সম্ভব হয় না। এদিক ওদিক ছিটকে পড়তেই হয়।

তখন তিনজনে এগিয়ে চলেছে প্রায় এক লাইনে। ধনাই সবার আগে। বাঁ হাতে কাস্তে আর চট। মাথায় মধুর কলসটা। আর ডান হাতে একটা মোটা লাঠি। সারা বনে শূলো। শূলো ডিঙিয়ে তার ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা। হয়ত তাতে কলসটা পড়ে যেতে পারে। তাই হোঁচট সামলাবার জন্য ধনাই একখানা লাঠি নিয়েছে।

সামনে একটা 'ট্যাক্'। দুটো ছোট নদী মিশবার ফলে একটা ত্রিভুজ খণ্ড তৈরি হয়েছে। এই ধরনের ত্রিভুজ আকারের জমির মাথা 'ট্যাক্' বলেই পরিচিত।

ট্যাকের দিকে সামনেই একটা গরান গাছ; তার ওপাশে হেঁদো বনের ঝোপ। গরাণ গাছে মধুর চাক দেখে ধনাই ওদের দিকে চিৎকার করে বলল,—আরে! আরেকটা চাক পেয়েছি। বলেই একবার সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পরমুহূর্তে বলল,—না-রে! এতে মধু নেই।

ট্যাকের মাথার দিকে আর না এগিয়ে ধনাই বাঁ হাতে সোজা পথ ধরল। এর মাঝে কফিল ও আর্জান এসে পড়েছে। আর্জান বিশ্বাস করতে চায় না। বলল,—ধনাই মামু বললে কি হবে! মধু হলেও হতে পারে।

কফিল ভক্তের মত বলল,—না-রে! ধনাই মামু সব জানে। ওর কথা মিথ্যে হয় না! চাক দেখেই ও ঠিক ধরতে পারে।

—দেখবি!—বলেই আর্জান এক থাবা কাদা তুলে গোল করে পাকিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল চাক লক্ষ্য করে।

মাটির তাল চাকের কোণে একটু লেগে ঝপ্ করে পড়ল হেঁদো বনের ঝোপে।

কফিল ব্যঙ্গ স্বরে বলল,—তুই না শিকারী! একটা ঢিলও চাকে ভাল করে লাগাতে পারিস না। না,—চল্। ওতে মধু নেই।

আর্জান আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল,—দাঁড়া না একটু। মধু পড়ে কিনা তাকিয়ে ছাখ্।

মধু পড়ল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মৌমাছি ওদের দিকে তাড়া করল। ওরা পিছনে ছুটে একটা ঝোপের আড়ালে পালাল।

এদিকে ধনাই খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার সামনে তিন-চার হাত চওড়া একটা 'শিষে'—ছোট সরু খাদ। কলস মাথায় নিয়ে কি করে লাফ দিয়ে এই শিষে পার হবে, তাই তার সমস্যা। তার দীর্ঘ লাঠিখানা সাঁকোর মত করে এপার-ওপার ফেলে দিল। এবার সামনের বাঁশের মত সরু তব্‌লা গাছটা ধরে শিষে পার হবার জন্য ঝুঁকি দিয়েছে। পার হয়েই সে কফিল ও আর্জানকে ডেকে বলবে, এমনি করেই পার হবার জন্য। কিন্তু ওদের সাড়া পাচ্ছে না কেন? ভেবেই সে একবার পিছনে তাকাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তাকাবার অবকাশ ধনাই পেল না। বিকট হুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর। সে হুঙ্কারে বাঘের সর্ব হিংস্রতা, তেজ ও মত্ততা যেন ফেটে পড়ল। বন কেঁপে উঠল থর্ থর্ করে। আর্জান ও কফিল ঝোপের আড়ালে হতভম্ব। তাদের কথা বলবার শক্তি নেই। নড়বারও কোন শক্তি রইল না—পালাবারও না, এগুবারও না।

বাঘের এই আক্রমণ খানিকটা বেপরোয়া ছিল যেন। সাধারণতঃ বনের বাঘ এমন বেপরোয়া হয় না। সে ধীরে সুস্থে, লুকিয়ে, ওৎ পেতে, দেখে শুনে, ঠিক সময়মত আক্রমণ করে। বেপরোয়া হবার কারণও ছিল এখানে। বাঘটি গরাণ গাছের পাশের ঝোপেই ছিল শুয়ে। ধনাই-এর চিৎকারে ও আর্জানের ঢিলে সজাগ ও সচকিত হয়ে দেখে, সে ঘেরাও হয়ে পড়েছে। ট্যাকের দুদিকে নদী, আর অন্যদিকে ওরা তিনজনে যেন বেড় দিয়েছে। অন্য যে-কোনও বন্য জীবের মত বাঘও ঘেরে পড়লে, লাইন ভেঙে বেরুবার জন্য মরিয়া

হয়ে ওঠে। তাই সে লাইন ভেঙে বেরুতে চেয়েছিল ধনাই-এর উপর দিয়েই।

বাঘ ধনাইকে লক্ষ্য করেছে। ঝাঁপিয়েও পড়েছে তার উপর। কিন্তু যে তব্‌লা গাছটা ধরে ধনাই শিষে পার হতে চেয়েছিল, তারই উপর বাঘের মাথা ঠোক্কর খেল দুর্দান্ত বেগে। মাথায় আঘাত খেয়ে বাঘ উল্টে গিয়ে ধপাস্ করে পড়ল 'শিষের' ভিতর।

তবলা গাছটা বাঘের থাবা থেকে ধনাইকে বাঁচাল বটে, কিন্তু তাকে বাঘের লেজের বাড়ি খেতে হল সপাং করে। লেজের বাড়িতে তার মাথার মধুর কলস পড়ে গেল। বাঘও পড়ল 'শিষের' গর্তের ভেতর, কলসও পড়ল ভেঙে তার মাথার উপর। বাঘের সারামুখে নাকে চোখে ছিট্‌কে পড়ল মধু।

দুঃসাহসী ধনাই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দুর্জয় হয়ে ওঠে। প্রবল শত্রুকে সামনে ধরাশায়ী দেখে সেও উল্লসিত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। --তবে রে শালা!--বলেই সে লাঠিখানা এক টানে টেনে তোলে।

আর্জান ও কফিল এদিকে থ মেরে গেছে। সেই যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, আর সাড়া নেই। ওরা যেন অর্ধচৈতন্য অবস্থায় উবু হয়ে বসে আছে। পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। বাঘের হুঙ্কার ও ধনাইয়ের 'তবে রে শালা' চিৎকার ওদের কানে হয়ত গেছে, কিন্তু চেতনা ওদের ছিল না। তারপর কি হল তার কোনও বোধ নেই।

বাঘের তর্জন গর্জন থেমে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের হুঁশ এল। চেতনা আসবার সঙ্গে সঙ্গে আর্জানের মনে পড়ল বনের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কফিলকে এক ধাক্কা মেরে বলল,—চল্, বনবিবির আদেশ, এগিয়ে যেতেই হবে।

বনের ভিতরে নিকটে কেউ বিপদে পড়েছে জানলেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। আবাদের মানুষ সৈনিকের মত এই নিয়ম মেনে চলে। না মানলে গ্রামের সবাই তাকে ঘৃণা করবে। এটা

ওদের বনবিবির আদেশ। বনের দেবী বনবিবি। তাঁর আদেশ ওরা কেউ অমান্য করতে চায় না। সাহসও নেই।

এক পা দুই পা করে আর্জান ঝোপের আড়াল থেকে এগিয়ে আসে। কফিল নিতান্ত বেগতিকে পড়ে আর্জানের পিছু পিছু আসতে থাকে।

আর্জান অবাক হয়ে বলে,—কই! কিছুই তো দেখা যায় না।

কফিলের উত্তর দেবার সাহসও নেই। আর্জান বলে চলে,—নিয়ে গেছে……মামু নেই! মামু নেই!—আর্জানের এ কথা ভাবতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঢোক গিলে সে এগিয়ে চলে তবু।

কফিল এবার বলল, -আর্জান! ওদিকে গিয়ে কি হবে! চল্ ফিরে যাই!

আর্জানের মনে পড়ে মাদারের কথা। তাকে বাঘে নিয়ে যাবার কোনও চিহ্নই সেবার নিয়ে যেতে পারেনি। তার জন্য সবাই তাকে কি অবিশ্বাসই না করেছিল। এবার সে একটা কোন চিহ্ন নিয়ে যাবেই।

এত কথা ভাবলেও সে মুখে কিছু বলে না। শুধু আদেশের সুরে কফিলকে বলল,—চল্, দেখে আসি।

দুজনে শিষের ধারে এসেই বুঝতে পারে কোথায় বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঘের থাবার ও মামুর পায়ের অজস্র চিহ্ন পড়ে আছে। এসে দেখে মধুর কলস শিষের ভিতর ভেঙে পড়ে আছে।

হঠাৎ আর্জান বেশ জোরেই প্রশ্ন করে,—লাঠি? মামুর হাতে যে লাঠি ছিল!

কফিলের ওসব চিন্তা মাথায় নেই। সে কেবল এদিক ওদিক তাকায়। বুঝবার চেষ্টা করে—বাঘটা কোনদিকে গেছে। নিকটে কোথাও হয়ত বাঘ বসে আছে, এই তার চিন্তা।

আর্জান সুর নিচু করে মাটির উপর নজর রেখে বলে,—লাঠি! লাঠি! কই কোথাও তো রক্তের চিহ্ন দেখছি না, কফিল!—রক্ত কই!

হঠাৎ আর্জান চিৎকার করে ওঠে,—মামু! মামু!!

কফিল থ মেরে যায়। আর্জানের ডাক বনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। প্রতিধ্বনির শব্দও মিলিয়ে যায়। কোনও সাড়া নেই।

—মা—মু!······আর্জান দীর্ঘ করে আবার ডাকে। কোনও সাড়া নেই।

খর্—খর্—খর্ ·····একটু দূরেই ঝোপে শব্দ হয়ে ওঠে।

কফিল এগিয়ে আর্জানকে জড়িয়ে ধরে, মুখে তার কোনও শব্দ নেই। ভীত কফিলের বিরুদ্ধে রেগে আরও বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আর্জান আবার চিৎকার করে ওঠে,—মা—মু!

নিজের চিৎকারে সে যেন নিজে আরও সাহস পায়, বল পায়। ভাবে,—না, ওরকম করে বাঘ আসে না। সে এলে ঝাঁপিয়ে আসবে।

—মা—মু!······

শুকনো পাতায় আবার 'খর্ খর্' শব্দ। দুটো হরিণ এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ওদের কাছেই এল। একদম গায়ের কাছেই এসে দাঁড়াল। বাঘের ভয়ে ভীতে হরিণ এমনি করেই বনে মানুষের আশ্রয় ভিক্ষা করে।

আর্জান বুঝল, বাঘ এখন খুব কাছে নেই। খুব কাছে থাকলে হরিণ এখান থেকে ছুটে পালাত।

—রক্ত তো দেখছি না! দেখি!—বলেই আর্জান কফিলের হাত ঠেলে দিয়ে শিষের ওপারে লাফ দিল। ওপারে গিয়ে মামুর পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখতে পায়।

স্পষ্ট পায়ের দাগ! বাঘে মুখে করে নেয়নি—হেঁটে গেছে, স্পষ্ট হেঁটে গেছে মামু!—ভেবেই আর্জান কফিলকে ডেকে নিয়ে পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে এগুতে লাগল। মাঝে মাঝে থামে, আর ধনাই-মামুকে ডাকে; আবার এগুতে থাকে। একশ গজ মত এগিয়ে আসে। মামুর পায়ের দাগ তবুও স্পষ্ট আছে। দূরে তাকিয়ে দেখে, সাদা কি যেন পড়ে আছে!

আর্জান দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। ছুটে যায়। কাছে গিয়েই দেখে, মামু পড়ে আছে উপুড় হয়ে। হাতের মুঠোতে সেই দীর্ঘ লাঠি ধরাই আছে।

আর্জান জোরে জোরে মামুকে ডাক দেয়। কোনও সাড়া নেই! দেহখানা উল্টে দেখে, কোথায় বাঘে খেয়েছে?

না! কোথাও তো রক্তের চিহ্ন নেই! দৃঢ় বিশ্বাসে কফিলের দিকে তাকিয়ে আর্জান বলে,—নিশ্চয়ই মামু বেঁচে আছে! ধর্ জল্দি। চল্ নিয়ে যাই,—চল্।

ধনাইকে কাঁধে করে ওরা ডিঙিতে নিয়ে এল। মাথায় জল দিতে দিতে অবশেষে তার চেতনা ফিরে এল।

ধনাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। চুপ করে শুয়ে আছে। ওরা ডিঙি ছেড়ে দিল।

অনেক সময় কেটে গেছে। ডিঙি এখন বাড়ির ধারে কয়রা নদীতে এসেছে। আর্জান হঠাৎ প্রশ্ন করল,—আচ্ছা মামু, মধুর কলস কি হল?

কলসের কথা শুনেই ধনাই এতক্ষণে হেসে ওঠে। হাসতে দেখে আর্জান আবার প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, তোমার কি হয়েছিল?

ধনাই চোখ বুঁজে বলে,—হ্যাঁ মনে পড়েছে। মধুর কলসটা ভেঙে বাঘের মুখে পড়তেই ·····বাঘ ফোঁৎ ফোঁৎ করতে থাকে। ···ফোঁৎ!···ফোঁৎ!

আর্জান ব্যগ্র হয়ে বলল,—কিন্তু তারপর।

তারপরের কথা ধনাই কিছুতেই যেন মনে করতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ওঠে,—জানি না!·····বলেই পাশ ফিরে গা এলিয়ে দিল।

কফিল মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল,—জানো মামু! হরিণ ছুটো কেমন ভয় পেয়েছিল!

দশ

বাঘের মুখে মধু ঢেলে লাঠি-তাড়া করা—এ গল্প গ্রামের লোকে বিশেষ আমল দেয়নি। ধনাই বা আর্জানও বিশেষ গল্প করতেও যায়নি। ওরা গল্প করতে জানে না—ভালও বাসে না। কফিল কিন্তু রসাল গল্প করতে ছাড়েনি। বাড়িয়ে ও রাঙিয়ে ঘরে ঘরে সে গল্প করে বেড়িয়েছে।

ফতিমা এখন বড় হয়ে উঠেছে! সে গল্প শুনে কফিলকে বলে উঠল,—নাও—নাও, তোমাদের সাহস বোঝা গেছে!

কফিল বলল,—শুনবে আর্জানের কথা?

ফতিমা উত্তর দেয়,—থাক্ থাক্, আর ওর কথা বলতে হবে না!

এমন সময়, আর্জান ঘরে ঢুকতেই গল্পের কথা চাপা পড়ে। ওঠে অভাবের কথা, অনটনের কথা।

ফতিমা তার বাবার অনেক সাহসের কথা জানে। সাহসে কেউ তার বাবার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা মোটেই চায় না। সে আর্জান হলেও না। বীরত্ব দিয়ে কি হবে! সংসারের অভাবের কথাই তার কাছে বড়।

তাই অভাবের কথার মাঝে সে একবার খোঁটা না দিয়ে ছাড়েনা,—থাক্ বোঝা গেছে! গল্প শোনাচ্ছেন সব! কই মধু তো বন থেকে এল না! যাও, এখন গুড় কিনে নিয়ে এস!

ফতিমার খোঁটা আর্জানের মনে লাগে। কারও খোঁটার বদলে খোঁটা দেওয়া আর্জানের অভ্যাস নয়। সে হেসেই হালকা করতে চায় আঘাতকে। কিন্তু হাসলে কি হবে, উঠতে বসতে ফিতমার খোঁটা তার মনের মাঝে জমে ওঠে। মুখে সে অবশ্য বেশ শান্ত ভাবেই বলল,—আরে! বন থেকেও তো সংসারে পয়সা আসে! আসে না?

পয়সা আসে বটে। কিন্তু আর্জানের মনে এ যেন এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। বন ও সংসার। বন তাকে ডাকে—তার নিবিড় ঘন সবুজ রঙে, তার নিদারুণ গভীর স্তব্ধতায়, তার ভীত পলাতক হরিণের পদশব্দে, তার হিংস্র ব্যাঘ্রের লোলুপ গর্জনে, তার নিঃসঙ্গ শিকারীর জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি বারুদের গন্ধের নেশায়। আর সংসার তাকে ডাকে—তার মায়ের স্নেহের স্পর্শে গড়া শান্ত আশ্রয়, তার ছোট কুঁড়ে ঘরের গোবর দেওয়া মেঝের মিষ্টি গন্ধ, তার ক্ষুধার অন্নের নিশ্চিত স্থান, তার সাঁঝের বাতি—ঘন অন্ধকার তমসার একান্ত ভরসার নিশানা। বন ও ঘর—এই দ্বন্দ্ব তাকে ক্লান্ত করে দেয়। অন্নের কথা ভাবলে বন ভুলতে হয়, বনের কথা ভাবলে অন্ন ভুলতে হয়। কিন্তু কোনটাই সে ভুলতে চায় না।

তাই সে অন্নের সংস্থানে বনে গিয়ে সমস্যা মেটায়। হরিণ মারতে বনে যায়। হরিণ মেরে মাংস বিক্রি করে সে অন্ন ঘরে আনে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যেতে থাকে।

* * *

কয়েক বছর পরের কথা। আর্জানের মা অসুখে পড়েছেন। অনেক বৈদ্য আনা হয়েছে। তাদের কেউ ফুঁ দিল, কেউ মন্ত্র-পড়া জল খেতে দিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে কলিম একদিন কেঁওড়া ফল পুড়িয়ে সরবৎ বানিয়ে খেতে দিল। কলিম বাউলে। বাউলেরা শুধু মন্ত্র দিয়ে বাঘ তাড়ায় না, কবিরাজিও করে। কলিমের দাওয়াইতে অসুখ 'নরম' পড়েছে। কিন্তু দুর্বলতা যায়নি।

সেদিন মঙ্গলবার, বেদকাশীর হাট। বেলা বারোটা থেকে বসে। পাঁচ-দশ মাইল দূর থেকে চাষীরা ডিঙি করে হাট করতে আসে। নদীর জোয়ার ও ভাটা বুঝে দুপুরে বা বিকালে হাট করে সন্ধ্যায় আবার বাড়ি ফিরে যায়। কালিকাপুর থেকেও দল বেঁধে সবাই হাটে যাবে।

সকালে কলিম হুঁকো হাতে নিয়ে তামাক খেতে খেতে ভেড়ির

পথে আর্জানের বাড়ির দিকে চলেছে। গ্রামের বাড়িগুলি সব প্রায় একটা সারিতে ভেড়ির পাশে পাশে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাবার ভেড়িই একমাত্র পথ।

আর্জানও ভেড়ির দিকে আসছিল। তাকে দেখেই হাতের কর গুণে গুণে কলিম বলল,—আর্জান, আজ দ্বিতীয়া তিথি ; নাস্তার পরই জো আসবে। প্রথম জোতে রওনা হলে হাট ধরতে পারব।

আর্জান ভেড়িতে উঠে গাছের ফাঁক দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে বলল,—পানি দেখে তো মনে হচ্ছে ভাটি শেষ হয়ে এল।

কলিম হুঁকোর উপর মুখ রেখেই বলল,—সবাইকে খবর দিস, নে সব গুছিয়ে নে।

—নেব তো গুছিয়ে! হাটের পয়সা যে নেই!

কলিম হেসে বলল,—আরে চল্ ; আমি তো আছি! চার আনা পয়সার কি ব্যবস্থা আর হবে না! চল্।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সবাই নদীর ঘাটে এসে পড়ল। আর্জানের হাতে ছোট একটা তেলের শিশি। সরষের তেল আজ তার কিনতেই হবে। তা ছাড়া আম্মার জন্য একটা ডাব কিনতেও হবে। মায়ের শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না।

ঘাটে আরও ডিঙি ছিল, কিন্তু সবাই কলিমের ডিঙিতেই উঠল! কলিমের কাছে সবাই জড় হতে চায়। সব সময় তো অভাব-অনটনের চিন্তা সবাইকে জর্জরিত করে। তবু কলিমের কাছে বসলে কিছু হেসে সময় কাটান যায়। কলিম গানে ও গল্পে ওস্তাদ, হাসির গল্পে আরও ওস্তাদ। গল্প ছাড়াও কে কেমন করে কথা বলে, তাই শুনিয়ে ও অভিনয় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসাতে পারে সবাইকে।

ডিঙিতে উঠেই কলিম জমিয়ে তুলেছে। নায়েব কেমন করে ঘাড় বেঁকিয়ে ধান মাপা দেখে, তারই নকল করে। গল্পে ও আমোদে ডিঙি সাঁই সাঁই করে চলে বেদকাশীর হাটের দিকে।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল,—এবার একটা গান!
—ভাবগান!

কলিমের মনে মনে গান গাইবার ইচ্ছা থাকলেও পাশ কাটাবার চেষ্টা করে। বলে,—হাটুরে 'লাও'তে কি গান জমে?

ধনাই মাতব্বরের সুরে বলল,—জমবে, জমবে। ধরো-না একটা ওড়াকান্দির ভাবগান!

কিছুক্ষণ গুন্‌গুন্ করে কলিম গান ধরে—

"গুরু আমার মগ্ন তরি
ও তরি পাওড়ি দিতে পেরলাম না।
যে চিনে জলের শিরা
তার তরি কি যায়গো মারা,
মাঝি বেটার এমনি হারা
ধার চিনে হাল ধরে না।
অমাবস্যা প্রতিপদে
দ্বিতে চাঁদ চন্দ্র ওঠে,
সেই নদীর জল উজান ছোটে
ঢেউ দেখে প্রাণ বাঁচে না!"

'ধার চিনে হাল ধরে না' কলিটাই সবার মনে ধরেছে। কেউ মনে মনে, কেউ বা গলা ছেড়েই কলিটা আওড়াতে থাকে।

বেলা গড়িয়ে যাবার একটুপরেই ডিঙি এসে হাটের ঘাটে ভিড়ল। হাটের পাশেই ফরেষ্ট আপিসের ষ্টীমার লাগাবার ঘাট। সামনেই ফরেষ্ট আপিসের ঘর। খুব বড় ঘর। সবটাই কাঠের তৈরি। বড় বড় গরাণ গাছের খুঁটির উপর ছয় হাত উঁচুতে মাচার মত ঘরখানা। মাটি থেকে বড় কাঠের সিঁড়ি আছে ঘরে উঠবার জন্য। ঘরটা এত উঁচু করে তৈরি করা কিন্তু বাঘের ভয়ে নয়, জলের ভয়ে। কোন কোনবার বর্ষায় ভেড়ি ভেঙে জল ছাপিয়ে নদী, গ্রাম ও মাঠ একাকার হয়ে যায়। ছোটখাট বন্যায় ছয় হাত উঁচুই অবশ্য নিরাপদ।

ঘরের মেঝে, দেয়াল ও ছাদ—সবই কাঠের তৈরি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথমে চারিদিকে চওড়া বারান্দা। মাঝখানে দুটি কামরা।

প্রথমটি আপিস ঘর। দ্বিতীয়টি ফরেষ্টবাবুর ঘরকন্না। আপিস ঘরে সিন্দুকের সামনে পর পর সাত-আটটি বন্দুক সাজান। কোনটা এক-নলা, কোনটা দোনলা, কোনটা বা রাইফেল। নানা কাজে আপিসে লোকের ভিড় হয়। কেউ মাছের 'পাশ', কেউ কাঠের 'পাশ' কেউ বা মধুর 'পাশে'র জন্য এসে জমা হয়। 'পাশ' না নিয়ে বনে ঢোকাই বে-আইনী। যে কোন কাজে আসুক, বন্দুকগুলির দিকে তারা সবাই একবার না তাকিয়ে পারে না। ফরেষ্টবাবুর ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় ঐগুলিই। বেদকাশীর বাবুর ক্ষমতা অসীম ; তার আপিসে দশটা বন্দুক আছে।

হাটের দিন ভিড়ের অন্ত থাকে না, কিন্তু আজ যেন আরও বেশি—হৈচৈ লেগে গেছে। ফরেষ্টবাবু রসিদ আলি সাহেব তার লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি নাড়িয়ে চিৎকার করে বলেন,—দাঁড়াও, বিহিত একটা হবেই। দেখছি কি করা যায়! আরে অতো ব্যস্ত হলে কি কিছু হয়! যাদুকে আমার 'ঘেরে' এসে বাঁচতে হবে না!

আর্জান ও কলিম এগিয়ে যায় ভিড়ের দিকে। ওদের দেখতে পেয়েই কয়েকজন উৎসাহে চিৎকার করে ওঠে,—আরে! বাউলে এসে গেছে! বড় বাউলে!

অভ্যর্থনায় খুশি হয়ে কলিম শান্তভাবেই বলে,—কেন, কি হয়েছে? আরে থাম্ থাম্—কি হয়েছে শুনি দেখি!

সুন্দরবনের আবাদে বাওয়ালির সম্মান সর্বত্র। ফরেষ্টবাবু কলিমকে টেনে নিয়ে বেঞ্চিতে বসিয়ে বললেন,—দেখো বাউলে! তুমি না হলে তো চলে না। আমার 'ঘেরে' বাঘ এসেছে। বড্ড জ্বালাতন করছে। বাঘের জন্য বেদকাশীর 'ঘেরে' মানুষ কাঠ কাটতে পারবে না, তা আমি হতেই দেব না। আমি কি ভয় পাই! তবে তুমি কাছে থাকলে সাহস থাকে। চলো যাই। হাটের সওদার কথা বলবে তো! হবে,—হবে, তা হবেখন। আমিই তোমার সওদা করে দেব।

কলিমকে কথা বলতে না দিয়েই এক নাগাড়ে রসিদ আলি সাহেব বলেই গেলেন।

বনের সর্বত্র কাঠ কাটতে দেওয়া হয় না। তাই যদি দেওয়া হত তাহলে এতদিনে বন উজাড় হয়ে যেত। এক-এক বছর এক-এক জায়গায় কাঠ কাটার হুকুম দেওয়া হয়। একেই বলে 'ঘের'। 'ঘেরে' আবার সব গাছ কাটা যায় না। বড় বড় গাছে মার্কা মেরে দেওয়া হয়। কেবল মাত্র এই মার্কা মারা গাছ কাটা যায়। এবার ঘের পড়েছে বেদকাশীর বনে। নানা জেলা থেকে লোক এসেছে বেদকাশীতে।

কলিম বলে,—সাহেব, আমি তো বাউলে। বাঘ তাড়ানই আমার কাজ, বাঘ মারা আমার কাজ নয়। তবে……

—তবে কি বাউলে! চলো, চলো। সত্ত মানুষ নিয়ে গেছে। এখনও খাচ্ছে নিশ্চয়—চলো, শীগ্‌গির চলো। শুনে নাও ওদের কাছ থেকে সব ঘটনা।

কলিম শুনে নেয় ঘটনাটি। দলটি এসেছে বরিশাল থেকে। বড় নৌকা নদীতে নোঙর করে দলের তিনজনে ছোট্ট ডিঙি চেপে ছোট খালের ভিতর অনেক দূর এগিয়ে যায়। ছোট খাল দিয়ে যাবার সময় একবার মট্ করে শব্দ হয়। সন্দেহ হওয়াতে ওরা ডিঙি থেকে উঁচু হয়ে বনটা একবার দেখে নিল। কিন্তু পরিষ্কার বনে কোথাও কিছু দেখে না। তারপর ডিঙি করে আরও এগিয়ে গিয়ে ডাঙ্গায় ওঠে। তিনজনে এক সঙ্গেই উঠেছিল। উঠে দেখে দূরে বড় একটা দল কাঠ কাটতে এসেছে। তাদের কাছে গিয়েই কাঠ কাঠবে মনে করে তিনজনে আবার ডিঙিতে উঠতে যায়। দুজনে ডিঙিতে উঠেছে, একজন বাকি। ঝড়ের মত বেগে আক্রমণ করে বাঘ তাকেই যেন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তখন ধারে কাছে যারাই ছিল তারা সব চলে এসেছে ফরেষ্ট আপিসে খবর দিতে।

কলিম একমনে শুনছিল। কাহিনী শেষ হলে ঠোঁটের কোণে হেসে বলল,—বুঝলাম! তোমরা বুঝি বাউলে নেওনি? তা নেবে কেন? দুটো পয়সা খরচ করতে বাধে! যেমন কর্ম তেমনি ফল। চলো দেখি।

আর্জানের দিকে মুখ ফিরিয়ে কলিম বলল,—কিরে, যাবি নাকি?

আর্জানের মুখে কথা নেই। হাতে তেলের খালি শিশিটার দিকে একবার তাকাল।

কলিম আর্জানের পিঠে হাত দিয়ে বলে,—বুঝেছি, বুঝেছি। চল্। তোর আম্মাকে আমি বলবো। আমি থাকলে কেউ কিছু বলবে না। চল্।

* * *

ফরেষ্ট আপিসের বোটে সবাই চলল। সাদা ধবধবে বোট। কাঠের খুপরি করা। রসিদ আলি সাহেব খুপরির ছাদেই বসে। একটি রাইফেল তার হাতে। রাইফেল এমন ভাবে ধরা যেন বাঘ সামনেই আছে। তা ছাড়া আরেকটি বন্দুক কলিম নিয়েছিল। দোনলা বন্দুক। এখন সেটি আর্জানের হাতেই। দুজনে গলুইতে পাশাপাশি বসে আছে। কলিম হুঁকো টানছে। তামাক তার বড় প্রিয়। তামাক টানতে টানতে মিটি-মিটি বাবুর দিকে তাকাচ্ছে আর মুচকি হাসছে।

আর্জান বলল,—হাসছ কেন?

—দাঁড়া, রগড় দেখবি?

বলেই কলিম দাঁড়িয়ে পড়ল। বনের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলল,—চুপ! চুপ! আর অমনি রসিদ আলি সাহেব হাঁটু গেড়ে রাইফেল কানের কাছে নিয়ে বনের দিকে নিরিখ করতে লাগলেন।

—আঃ, ভারি সুযোগ ছিল, ফস্কে গেল।—বলেই কলিম হাসতে হাসতে বসে পড়ল।

বিপদে ও চিন্তায় সকলে মন-মরা থাকলেও মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হাসি না হেসে পারে না।

বাবু রেগে উঠে বললেন,—যাও বাউলে! অমন ফাজলামো করো না।

কলিম চুপচাপ আরও জোরে হুঁকো টানতে থাকে।

যে-বনে ঘটনাটি ঘটেছিল তাকে আড়পাঙাসের বাদা বলে।

বড় নদীটির নাম আড়পাঙাসে। নদীর নামেই এই বাদার নাম। বোট খালে ঢুকেছে। যাদের লোক বাঘে নিয়েছে তারাও বোটে ছিল ; তাদের কলিম জিজ্ঞাসা করল—কোথায় মট্ শব্দ শুনেছিলে ?

—এই তো এখানে।

কলিম তক্ষুনি মাঝিকে বলল,—বোট ভেড়াও এখানে।

—এখানে কেন ? লোকটাকে তো আরো আগে থেকে নিয়ে গেছে। এখান থেকে তো নেয়নি !

—না, না, এখানেই ভেড়াও।

বোট ভিড়ল। বোটে কিন্তু অনেক লোক। মাঝি-মাল্লা নিয়ে দশজন।

কলিম আর্জানকে নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে বলল,—বাবু, আপনি মালে উঠুন।—সুন্দরবনের চত্বরকে এরা সহজ ভাষায় 'মাল' বলে।

রসিদ আলি সাহেব মালে নেমেই বললেন,—কিন্তু ওরা কেউ আসবে না ? আর কেউ যাবে না ?

কলিম দৃঢ়ভাবে জবাব দিল,—না বাবু, সেটি হবে না, তা হলে শিকার হবে না। তারপর মাঝি মাল্লার দিকে তাকিয়ে বলল,—তোমরা এখানেই বোট ভিড়িয়ে থাকো। কোন ভয় নেই। 'বড়-মেঞা'র খাওয়া হয়ে গেছে আজকের মত ; তোমাদের পেছনে আর লাগছে না ! কোনও ভয় নেই। ভরা পেটে বনবিবির বাহন কাউকে কিছু বলে না !—বাঘের প্রতি কলিমের কেমন যেন একটা মমতা আছে।

খালের ধার থেকে কিছুদূরে তিনজনে বাঘের থাবার 'খোঁচ' সন্ধান করতে থাকে। পেতেও খুব দেরি হয় না। কলিম খোঁচ অনুসরণ করে চলেছে আগে আগে ; আর্জান তারপরে, আর বাবু সবার শেষে।

বাবু বললেন,—কলিম, রাইফেলের ক্যাচ্ তুলে রাখব ?

কলিম বাঘের 'খোঁচের' দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বলল,—না বাবু, এত আগে না। কিন্তু খোঁচ দেখে মনে হচ্ছে বাবু, মদ্দা আর খুব বড়। অমন জোরে কথা বলবেন না।

একটু এগিয়েই কতকগুলি শুকনো ডাল পড়ে আছে ; বাঘটি

তার উপর দিয়ে না গিয়ে, পাশ কাটিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেছে। কলিম তা লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে আর্জানকে বলল,—দেখেছিস আর্জান, কি হুশিয়ার জানোয়ার! ডালগুলিকে ঠিক এড়িয়ে গেছে। অত বড় জানোয়ার, কিন্তু চলবার সময় এতটুকু শব্দ করবে না! থাবার নিচে কাঠি বা শুক্‌নো পাতা পড়ে যদি একটু শব্দ হয়, তাহলে নিজের থাবা নিজে কামড়ায়। এত বড় হুশিয়ার জানোয়ার!

শূলোর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে আর্জান ও কলিম দ্রুত এগিয়ে যায়। বাবু পিছনে পড়ে গেছেন। ভয়ে কলিমের কাছে জোরে আসতে গিয়েই বাবু রাইফেল নিয়ে শূলোয় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। এবার কলিমের আর ঠাট্টা নয়। চোখ রাঙিয়ে উঠল। জোরে কথা বলার উপায় নেই। শুধু ফিস্‌ফিস্ করে একবার বলল,—উনি আবার রাইফেলের ঘোড়া তুলতে চান!

বাবুর অবস্থা দেখে ওরা এবার আস্তে আস্তে চলল। শিকারের স্থানটি চিনতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। সেখানে পৌঁছেই বুঝতে পারল। মানুষের পায়ের দাগ আর বড়মেঞার পায়ের দাগ পরস্পরে মিশে গেছে।

কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে দেখে আর্জান বলল,—কিন্তু রক্তের তো কোন চিহ্ন দেখছি না!

—চল্ এগিয়ে দেখি।—কলিম নির্ভয় নির্দেশ দেয়।

আবার ওরা 'খোঁচ' অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। এবার খালের কিনারা বরাবর নয়। সোজা বনের ভিতর দিকে 'খোঁচ' চলে গেছে।

কিছুদূর গিয়েই কলিম ফিস্‌ফিস্ করে বলল,—পুরনো! খুব বড়! এক কামড়ে মুখে করে উঁচু করে নিয়ে গেছে। দেখিস না? কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই। কামড় একটুও না ছাড়লে রক্ত বেরুবে কি করে? আর তা নয় তো, কোনও মানুষই নেয়নি। ওরা মিথ্যা কথা বলেছে!

মুহূর্তমধ্যে বাবুর মনের মাঝে কলিমের কথা তোলপাড় করল,—তা হলে তো বাঘের ভরা পেট নয়। সামলে নিয়ে ঢোক গিলে

বললেন,—নিশ্চয় মিথ্যা। তাহলে কি হবে বাঘের পিছনে পিছনে গিয়ে? ওকে তো পাওয়া যাবে না।

কলিম দৃঢ়ভাবে বলল,—সেটি হবে না। যখন এসেছি, শেষ দেখতেই হবে।

একটু এগুলেই চার পাঁচ হাত লম্বা একটা গোখুরা সাঁ করে ওদের সামনে দিয়েই চলে গেল।

দেখেই কলিম চুপিচুপি বলল,—যা, যা, চলে যা, যাত্রা শুভ। বাবু! যাত্রা শুভ।

সাপ সম্পর্কে আবাদের লোক উদাসীন। সাপের কামড়ে এদেশের লোক অনেক মরে। কিন্তু সাপে কামড়ালে কেউ মনসাকে দোষ দেয় না। দোষ দেয় যাকে কামড়াল তাকেই। বেহুলা মনসার গান এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মুখে মুখে।

কিন্তু ওদের আর বেশি দূর যেতে হয় না। সামনেই ভিজে মাটির উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। নিঃসন্দেহে হিংস্র দাঁতের কামড় এখানে প্রথমবার আলগা করেছিল।

রসিদ আলির অতো রক্ত দেখে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। কলিমের মুখে আর বিশেষ কথা নেই। ইশারায় সারতে লাগল সব কথা।

ইশারা করে কলিম দৃঢ় ভাবেই বাবুকে জানাল,—শীগ্‌গির সামনের গাছটাতে উঠতে।

গাছটা গরান গাছ। মোটা ছাল শুকিয়ে ফেটে উঁচু উঁচু হয়ে আছে। সেই ধারাল শুকনো ছাল বুকে ঘষে ঘষে কোন মতে বাবু গাছে উঠলেন। গরান গাছের ডাল অনেক উপরে হয়। এক কেওড়া গাছ ছাড়া সুন্দরবনে কোন গাছের ডাল নিচুতে মিলবে না। রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে নিতে বাবু ভোলেননি।

কলিমের দোনলা বন্দুকে দুটি গুলি ছিল। বাড়তি টোটা বাবুর পকেটেই।

কলিমের ইঙ্গিতে টোটাগুলি বাবু মাটিতে ফেলে দিলে আর্জান কুড়িয়ে নিল।

কলিম ও আর্জান এগিয়ে চলে। এবার আর্জান একেবারে কলিমের কাছে-কাছে চলেছে। রক্তের দাগ দেখে দেখে ওরা এগুচ্ছে। গতি খুব ধীর, যেন এক-পা এক-পা করে চলে।

সামনেই হেঁতালের একটা ঝাড়। হেঁতাল গাছের পাতা বেত গাছের পাতার মত দেখতে। কোনও সাড়া শব্দ নেই। বনের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়। সুন্দরবনে সব গাছগুলিই সোজাভাবে উপর দিকে ওঠে। তখন তাদের ডালপালা বিশেষ থাকে না। বিশ পঁচিশ হাত উপরে ওঠার পর ডালপালা ছড়িয়ে দেয় ছাতার মত। সূর্যের আলো পাবার জন্য এ এক সমারোহ। পরস্পরে পাল্লা চলে। কে আগে উঠে সূর্যের আলো গ্রহণের জন্য পাতা বিস্তার করতে পারে। নিঃশব্দ বনে আলোর জন্য এই অবিরাম প্রতিযোগিতা চলেছে প্রতিক্ষণে। ফলে সুন্দরবনে এই পাতার ছাতা বিস্তৃত। বাতাস হু হু করে বয়ে চলেছে এই ছাতার উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে হালকা হাওয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করে। তারই দোলায় হেঁতাল গাছের পাতা একটু একটু দুলছে।

রক্তের দাগ সোজা এই হেঁতাল-ঝোপের দিকে চলে গেছে। কলিম অনেকক্ষণ এই ঝোপের দিকে চেয়ে রইল। অনুমান করল, এরই আড়ালে বাঘ নিশ্চয় আছে। ঝোপটি ওদের থেকে দক্ষিণ দিকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে। বাতাসের গতি পুব থেকে পশ্চিমে। কলিম তাই পশ্চিম দিকে বেড় দিয়ে ঝোপের পেছনে যাবার মতলব করল। যাতে মানুষের গন্ধ বাঘের নাকে না যায়। বনের জীব মাত্রেরই ঘ্রাণ-শক্তি অত্যন্ত প্রখর।

ওরা এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যায়, আর থেমে থেমে দেখে, কোন কিছু ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কিনা। এইটুকু পথই যেতে ওদের আধঘণ্টা লাগল। ওপাশে গিয়ে দেখে, কিছুই নেই। কলিম যেদিকে তাকায় আর্জান সেদিকেই আরও বেশি করে নজর দিয়ে দেখবার চেষ্টা

করে। এমনি ধারা ভীতিজনক মুহূর্তের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা আর্জানকে ক্লান্ত করে ফেলেছে।

ওরা দাঁড়িয়েই আছে। কলিম অনুমান করবার চেষ্টা করে, কোথায় যেতে পারে? এমন সময় একটি বন্য মুরগী ত্রাসে হঠাৎ কক্ কক্ করতে করতে পশ্চিম দিকে চলে গেল। তার ডানার ঝাপটও স্পষ্ট শোনা গেল। নিঃসন্দেহে কোনও আতঙ্কের বস্তু দেখে বুনো মুরগী আঁৎকে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় হতে পারে? ঠিক করতে না পেরে ওরা হেঁতাল গাছের ঝোপের ধারেই গেল। চারিদিকে রক্তের দাগ ছড়িয়ে আছে। খুঁজে দেখল, বাঘ সেখান থেকে 'সরে' গেছে আরও দক্ষিণ দিকে।

আবার ওরা চলল রক্তের দাগ ও থাবার চিহ্ন দেখে দেখে। হঠাৎ কলিমের মনে পড়ে, এখানে কোথায় যেন একটা ভিটে আছে। সুন্দরবনের ভিটে এক রহস্যময় বস্তু। বনে চলতে চলতে কোথাও হঠাৎ দেখা যাবে পোড়ো ভিটের চিহ্ন। দেখেই বোঝা যায়, সেখানে এক সময় মানুষের ঘর-বাড়ি ছিল। হয়ত দুটি বা তিনটি ঘরের ভিতের চিহ্ন রয়েছে। হয়ত একটা তেতুল, না হয় গাব, না হয় বেল, না হয় ডুমুর গাছ আশে-পাশে আছে। এই সব গাছ কিন্তু সুন্দরবনে আপনা থেকে হয় না। আর হয়ত পড়ে আছে অসংখ্য মাটির খোলামকুচি। এইসব ভিটেগুলি বেশ উঁচু। শুকনো খটখটে। খানিকটা ফাঁকা। বর্ষার প্লাবনে জীবজন্তুর আশ্রয়ের স্থল, শীতে তাদের নিশ্চিন্তে রোদ পোহাবার জায়গা। এইগুলি হয়ত বা এককালে জলদস্যুর আড্ডা ছিল, না হয় লবণ তৈরির কারখানা ছিল। কিন্তু সে সব অনেক অতীতের কথা।

ধীরে ধীরে চলে ওরা। আধ ঘন্টা লেগে যায় একশ হাত অতিক্রম করতে। দূর থেকে ভিটের উঁচু মাটি কিছুটা দেখা যায়। ভিটেকে ঘিরে চারদিকে হেঁদো বনের ঝোপ। চার-পাঁচ হাত উঁচু নিবিড় ঝাড়। তার গা দিয়েই আবার চারপাশে স্বাভাবিক বন শুরু হয়েছে।

কলিম ও আর্জান আর সোজা না এগিয়ে বাতাসের জন্য আবার পশ্চিম দিক ঘুরে এগুতে লাগল—অতি সন্তর্পণে। কিছুটা এগুতেই একটা ফাঁক দিয়ে গোটা ভিটে ওদের দৃষ্টিতে এল। ওরা এখন মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে। ভিটের উপর পড়ে আছে লাসটা। পেটের দিকটা খাওয়া হয়ে গেছে। হাত দুখানা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আরও দু-এক পা ওরা এগুলো। কোথাও শব্দ নেই। কলিম হাত দিয়ে আর্জানকে থামতে ইশারা করে দাঁড়াল। কিন্তু আর কোথাও কিছু দেখা যায় না। নিঝুম বন। কোনও জীবের চিহ্ন নেই।

কিন্তু কোথায়? কোন কিছুই লক্ষ্যে আসে না; চার চোখ দিয়ে ওরা তন্ন তন্ন করে দেখছে। পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। এদিক ওদিক দেখবার সময় মাথাটাও ঘোরাচ্ছে অতি ধীরে—পাছে বাঘের নজরে পড়ে যায়। বনের আইন ওদের জানা আছে। একপাশ থেকে আরেক পাশে মাথা ঘোরাতেও ওরা দুই মিনিট সময় লাগায়। চোখের মণিটাও যেন চট্ করে নাড়াতে চায় না! পাছে চলন্ত কিছু শত্রুর নজরে আসে। সহসা কলিমের নজরে পড়ল,—হেঁদো গাছের একটা পাতা মাটির সঙ্গে লেগেছিল, তা হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠল। দুজনেরই নিষ্পলক দৃষ্টি ঐ পাতাটির দিকে; কিন্তু কিছুই না—কিছুই ওরা দেখতে পায় না।

কলিম যেন কি বুঝে নিয়েছে; চলতে শুরু করল ছোট-ছোট পা ফেলে, অতি সন্তর্পণে। ভিটের দিকে নয়, ভিটের পেছন দিকে। আর্জানকে কিছু বলতে হয়নি; সেও কলিমের সঙ্গে অমনিভাবে অতি সাবধানে চলতে লাগল। যত ওরা এগুচ্ছে ততই ওরা গলা বাড়িয়ে ভিটের হেঁদো-ঝোপের পেছনটা দেখবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ কলিম ভীষণ চিৎকার করে উঠল,—ঐ যে শালা! শিকারীর কোন নিয়মকানুন না মেনেই চিৎকার করে উঠল,—ঐ যে শালা!!

বাঘ ঝোপের ফাঁক দিয়ে লাসের দিকে মুখ করে বসেছিল; গোটা পেছনটা ঝোপের বাইরেই ছিল। লেজটা গুটিয়ে গুটি মেরে বসেছিল। আড়ালে বসে লাসকে পাহারা দিচ্ছে।

পেছনটা দেখতে পেয়েই কলিম চিৎকার করে উঠেছে। সে ভুলেই গেছে যে, সে এখন বাওয়ালি নয়,—সে এখন বন্দুক হাতে বাঘ শিকারী।

বাঘও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে উঠে বসে সামনের দুই বাহু ভর করে গোঁ গোঁ করে উঠেছে। হিংস্র দাঁত বের করে, হিংস্র চাহনি দিয়ে গোঁঙাতে আরম্ভ করেছে।

থাক্ না তার হাতে বন্দুক! সে তো এই হিংস্রতম জানোয়ারকে খালি হাতে চ্যালেঞ্জ করতেই অভ্যস্ত। সে দেখাবেই—ঐ মূর্তিতে সে ভীত নয়! ঐ মুখ-বিকৃতিকে সে তোয়াক্কাই করে না! হিংস্র জানোয়ারের বিরুদ্ধে তারও হিংস্র চেহারা ফুটে উঠেছে। তারও দেহ যেন ফুলে ফুলে উঠছে। মুখে শ্লীল-অশ্লীল গালাগালি। চির অভ্যাসমত হাঁটু গেড়ে বসে গেছে।

পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এইভাবে কলিমের চ্যালেঞ্জ আর্জান কখনও দেখেনি। কি করতে হবে, সে চিন্তাশক্তি তার নেই। বাঘও যেমন গোঁ গোঁ করছে, আর্জানও তেমনি গোঁ গোঁ করতে লাগল, আর্জানও তার চেয়েও যেন জোরে জোরে গোঁ গোঁ করবার চেষ্টা করছে। বাঘ গোঁ গোঁ করতে করতে এক-একবার বীভৎসভাবে 'গাঁক্' করে ওঠে। আর্জানও সঙ্গে সঙ্গে 'গাঁক্' করে উঠছে।

কলিমের হঠাৎ জ্ঞান এসে যায়,—সে বাঘ তাড়াতে আসেনি, বাঘ মারতে এসেছে। হাঁটু গেড়ে ছিল, উঠে দাঁড়াল। বাঘের চোখে চোখে সে হিংস্রভাবে তাকিয়ে আছে, আর মুখে অনর্গল গালাগালি। গালাগালি দিতে দিতে তারও মুখে গেঁজা উঠে গেছে। বাঘের মুখ থেকেও লালা ঝরছে। কলিম বন্দুক উঁচু করেছে, বাঘও একবার লেজের বাড়ি মেরেছে। কলিম জানে, বাঘ তিনবার মাটিতে লেজের বাড়ি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে বন্দুক কানের কাছে নিয়েই দুটো টিপ একসঙ্গে টিপে দিল।

বাঘ একটুও হেলে না। কিন্তু সে লাফও দেয় না। রাগে গর্‌গর্

করছে, মুখ দিয়ে লালা ছিটকে পড়ছে, আর সামনের দুই থাবা দিয়ে এগিয়ে আসছে। কলিম যেন জ্ঞানহারা। সেও এক পা, দুই পা এগুচ্ছে —আয়···দেখে নেবো তোকে !···শালা !—গালির যেন শেষ নেই !

তপ্ত গুলি পেট বিদ্ধ করে বাঘের কোমরের হাড় ভেঙে দিয়েছে। মাজা খাড়া করতে পারছে না। সামনের দুই বাহু দিয়ে এগিয়ে আসছে, মাজা মাটিতে টানতে টানতে, হেঁচ্ড়ে হেঁচ্ড়ে।

সেই বিস্ফারিত জিহ্বা, দাঁত, আর লালার সামনে আর্জানের মনে হল, এবার বুঝি নিস্তার নেই ! কালবিলম্ব না করে কলিমের হাত থেকে একটানে বন্দুকটা কেড়ে নিল। হাতের টোটা বন্দুকে পুরেই সে অব্যর্থ গুলি ছাড়ে মাথা নিরিখ করে।

বাঘ পড়ে গেল কাৎ হয়ে। কলিম তবুও এগিয়ে চলেছিল। আর্জান বাঁ হাত দিয়ে তাকে টেনে ধরে। কলিম দাঁড়াতেই আবার আর্জানের গুলি। শায়িত বাঘের কানের পাশ দিয়ে এবার রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। বাঘ তখন মাত্র পনেরো হাত দূরে।

আর্জান বসে পড়ল। কলিমকেও সেখানে টেনে বসাল। বন্দুকে আবার গুলি পুরে নেয়। তারপর দম নিয়ে কোমর থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাতে বলল।

বাঘ পনেরো হাত দূরে পড়ে আছে। বিড়িতে টান দেবার পর কলিম হেসে বলে উঠল,—দেখেছিস শালার তেজ !

আর্জানের মুখে কোনও কথা নেই ; ঝরঝর করে ঘামছে।

কলিম অনেক কথাই বলছে, কিন্তু কোনটা আর্জানের কানে যায় —কোনটা যায় না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আর্জানের দেহ ও মন শান্ত হয়ে এল। আর্জানের মনে পড়ে, তার বাবার মৃত্যু কাহিনী। লুণ্ঠিত ব্যাঘ্রের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

বিজয়গর্বে কলিম বলল,—চল্, শালাকে একবার দেখি।

ওরা উঠে এসে ভাল করে দেখল। মেপে দেখল, পুরো আট হাত দীর্ঘ। অর্ধভুক্ত লাসের দিকে না গিয়েই ওরা ফিরে চলল। জোরেই চলল।

মাঝপথে কলিম একবার থেমে বলল,—দাঁড়া, একবার 'কু' দিয়ে নিই। বাবু তো গাছে। বন্দুক তার হাতে আছে। যদি জ্ঞান থাকে তো, আমাদের শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে গুলি করেও বসতে পারে!

কলিম কয়েকবার 'কু' দিল। দূরে বাবুর কাছ থেকে এবং বোট থেকেও 'কু'র উত্তরে 'কু' আসতে লাগল। বোটের লোকে সবাই মিলে উৎসাহে 'কু' দিতে লেগেছে।

সুন্দরবনে 'কু' দেওয়া এক অভিনব ব্যাপার। বনে নাম ধরে কেউ কাউকে ডাকাডাকি করে না। পাখির ডাকের মত জোরে 'কু' দেয়। হিংস্র জন্তু থেকে লুকোবার কত পন্থাই না মানুষ জানে!

কলিম ও আর্জানের মুখে সহজ হাসি দেখতেই রসিদ আলি সাহেবের বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। গাছ থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসে ওদের সঙ্গে বোটের দিকে চললেন।

মাঝপথে পিছন দিকে তাকিয়ে কলিম ভৎর্সনা করে উঠল—কি করেন বাবু! ও কি করেন!

রসিদ আলি সাহেব কোন কথা না শুনে বললেন,—দাঁড়াও, শিকারে এসে গুলি করব না—এ কেমন কথা!—বলেই তিনি রাইফেল তুলে ঘন বনের দিকে একটা চোট্ করে দিলেন।

আর্জান ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল,—রাইফেলের আওয়াজ তো ভীষণ, বাবু!

* * *

সবাই মিলে বাঘকে বোটে নিয়ে হৈ-হল্লা করে আপিসের দিকে যাত্রা করল। বোট যখন ঘাটে এল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। হাট ভেঙে গেছে। তবু লোকজন কিছু ছিল। উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়ে তোলে।

সবার ঔৎসুক্য কিছুটা কমে এলে কলিম ও আর্জান একত্রে রসিদ আলি সাহেবকে বলল,—বাবু, একটা আর্জি আছে। বাঘটাকে আজ একবার আমাদের গ্রামে নিতে চাই। কাল তো খুলনা সদরে যাবেন। ঐ পথেই না হয় নিয়ে যাবেন।

—তোরা তাহলে সদরে যাবি না ?

—নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব।

তারপর কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে রসিদ আলি বললেন, —আচ্ছা, নিয়ে যা। কিন্তু আমার বোটেই আমার লোকজন নিয়ে যাবে।

মনের আনন্দে ওরা সবাই রওনা হবে, এমন সময় আর্জানের হাতে তেলের খালি শিশি দেখে রসিদ আলি তাকে ডেকে নিলেন। তারপর নিজের ঘর থেকে শিশি-ভর্তি তেল ও দুটো ডাব দিয়ে বললেন,—যা, এইবার যা।

কলিম দেখে বলল,—যথা লাভ ! কিন্তু বাবু, এতেই শেষ ?

—না, না, হবেখন !

কালিকাপুরের ঘাটে বোট ভিড়তেই হৈ-হল্লা লেগে গেছে। সবাই হৈচৈ করে বাঘকে আর্জানের উঠানে নামিয়েছে।

আর্জানের মা অসুস্থ। শুয়েই ছিলেন। আর্জান ও বাঘের কথা শুনে তিনি একটা কুপি নিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে উঠানে এসেছেন।

আর্জান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,—আম্মা ! দেখ, এইখানে আমার গুলি লেগে দর্‌দর্‌ করে রক্ত বেরিয়েছিল।

মায়ের কিন্তু সেদিকে কান নেই। বাঘের কালো পিঠে হাত দিয়ে বললেন,—নারে আর্জান ! বাঘটা খুব পুরনো। খুব বুড়ো হয়ে গেছে, না ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই বাঘ !

তারপর আর্জানের পিঠে শীর্ণ ও দুর্বল হাত বোলাতে বোলাতে তাকালেন সেই সামনের হেঁতাল গাছটার দিকে। হেঁতাল গাছটার তলায় তখনও সন্ধ্যার দীপটি জ্বলছিল।

এগার

পরদিন রসিদ আলি সাহেব এসে সকলকে সঙ্গে করে বাঘ নিয়ে খুলনা যাত্রা করলেন। খুলনা দীর্ঘ পথ। এই দীর্ঘপথে বাঘ দেখার লোকের অভাব নেই। যেখানেই হাট ও বাজার, সেখানেই লোক জমে যায়।

লোক জমা হলেই কলিম বলে,—বাঘ তো তোমরা দেখলে, বাঘের শিকারীকে কি তোমরা দেখেছ?—বলেই কলিম আর্জানকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

খুলনায় পৌঁছে বনকর সাহেবের কাছে রসিদ আলি বাঘ নিয়ে গেলেন। সঙ্গে তার সেই রাইফেলটাও নিয়ে যেতে ভোলেন নি। বনকর সাহেবের ঘোষণা আছে, বাঘ মারতে পারলেই দুশো টাকা পুরস্কার মিলবে। তারই জন্য এত আয়োজন।

সবাই আশা করেছিল, আর্জানের ডাক পড়বে। কিন্তু তা তো হলোই না। বরং রসিদ আলি সাহেবের ইচ্ছায় বনকর আপিসের বড় সাহেবকে বাঘের চামড়াটাও উপঢৌকন দিতে হল। আপিস থেকে ফিরে এসে রসিদ আলি সাহেব পুরস্কার সম্পর্কে সবাইকে বললেন,—সে সব নাকি পরে মিলবে।

অবশ্য রসিদ আলি সাহেব ওদের সবাইকে একদিন প্রচুর খাইয়েছেন। আজও খাওয়ালেন।

খুলনা থেকে চলে আসার অনেক দিন পরে রসিদ আলি সাহেব একদিন কলিম ও আর্জানকে ডেকে দশ টাকা করে হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন,—এই নাও পুরস্কার! খুলনা থেকে টাকা এসে গেছে। আমি কি নেমকহারামি করি!

বাকি টাকার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। বনে বাস করে বনের ফরেষ্টবাবুকে কেউ চটাতে চায় না!

* * *

আর্জানের মা সেই যে শয্যা নিয়েছিলেন, তার থেকে আর ওঠেননি। মৃত্যুর সময় মা কদিন ধরে অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, তাই কোন কথা আর্জানকে বলে যেতে পারেন নি।

এবার সংসারে আর্জান ও ফতিমা মাত্র। মা মৃত্যুর আগে কিছুদিন যেন ফতিমার উপর বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর্জানের তা নজর এড়ায়নি। আর্জান ফতিমাকে চায় না এমন নয়, কিন্তু সে যেন মাঝে মাঝে বরদাস্ত করতে পেরে ওঠে না। এবার সংসারে ওদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ ও বিরোধ বাধে।

আর্জান বারবার বনে যেতে চায়; কিন্তু নানা ছুতায় ফতিমা তাকে যেতেই দেবে না।

আর্জানকে বাধা দেওয়া দুরূহ। সে বনে যাবেই। তাই ফতিমাও ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে আর্জানের উপর।

এইভাবে দু-বছর ওদের কেটে যায়। একদিন কাছারির নায়েব আর্জানকে ডেকে বলল,—দেখ্ আর্জান, কতদিন আর এমন করে দেনা শোধ করবি না। ও-সব চলবে না। জমিদারের ছেলের বিয়ে। টাকা এবার দিতেই হবে।

ধনাই মামুর সঙ্গে দেখা হতে আর্জান কাছারির কথা বলল। ধনাই মামুর অনেক সাক্‌রেত আছে; সে কাছারি বাড়ির খবর সব জানে।

সে বলল,—আরে, ওসব বাজে কথা। কি জানিস? নায়েব এখান থেকে চলে যাবার মতলবে আছে। যাবার আগে জমি হাত বদল করিয়ে কিছু সেলামি আদায় করতে চায়।

—কিন্তু আমি কি করি!

—করবিই বা কি! তোর তো অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। দেনা না করেই বা তোর উপায় কি? তোর যে জমি আছে তা তো আবার ভেড়ির কোলে। অত ধারে তো লোনা জল চুইয়ে আসবেই। তাই ফসলও পাচ্ছিস না।

—কেন! নায়েব ভেড়ি ভাল ভাবে মেরামত করলেই তো পারে!

—নায়েবের চালাকি জানিস না। ভাল ধান না হলে নায়েবের একদিক দিয়ে লাভ! দেনার দায়ে ফেলে জমি হাত বদল করাবে। নতুন পত্তনের সেলামিটা ওর পকেটেই আসবে। এমন সহজে টাকা আর আসে কিসে?

—কিন্তু তাতে যে বছর বছর জমিদারের গোলায় ধান কম উঠছে?

—হ্যাঁ! খুলনা সদর থেকে তিন ভাটি ঠেলে জমিদার আসছে এই আবাদের লোনা জল খেতে! তুমি বা আমি মরি, তাতে তার কি! খুলনায় বসে সন সন লাভের কিছু টাকা তার পকেটে উঠলেই হল।

আর্জান বুঝল, ব্যাপার গড়িয়েছে অনেক দূর। ভাল করে বুঝতেও তার বেশি দেরি হয় না। বৈশাখ মাসেই জানতে পেল, জমি আর তার নেই। এই জমি আর্জানের নিজের ছিল না। জমিদারের জমি। আর্জান বর্গা পেয়েছিল। আধি বর্গা। ফসলের অর্ধেক তার পাওয়ার কথা। পেত সে সিকি। তাও হাতছাড়া হল।

জমি হাতছাড়া হলে কি হবে, বন্দুক তার হাতছাড়া হয়নি। এবার জীবিকার সন্ধান পুরো ভাবে তারই সাহায্যে চলল। ফতিমা যাই বলুক, আর যা ইচ্ছা করুক, রোজ সে বনে যাবে। হরিণ পেলেই মারবে। আর তার মাংস বেদকাশীর হাটে, নারানপুরের হাটে, বড়দলের হাটে, হোগলার হাটে—যেদিন যে-হাট পাবে সে-হাটেই বিক্রি করবে।

চলল আর্জানের বন্য-জীবন। বনে বনে ঘোরে। রাত নেই, দিন নেই। কোন কোন দিন রাত্রেও বনে গাছের ডালে শুয়ে কাটিয়ে দেয়। বনে বসেই মাংস কাটে; হাটে গিয়ে বিক্রি করে। তারপর বাড়িতে আসে বিশ্রামের জন্য।

এই বন্য জীবনে সে তিনটি বাঘ মেরেছে। কিন্তু বাঘ মারার কোন পুরস্কার সে পায়নি। বাঘ মেরেছে তারই বে-পাশী গাদা বন্দুকে জালের কাঠি পুরে। এই বাঘ নিয়ে সদরে গেলে তার বন্দুকই যাবে মারা। তাই সে-মুখো হয়নি। বাঘেব চামড়া খুলে বিক্রি করে প্রতিবারে সে কিছু টাকা পেয়েছে বটে।

এমনি একদিনে কলিম আর্জানকে ডেকে বলল,—চল্, আর্জান, একদিন কাঠ কেটে আসি। কাঠের পাশ আমার কাছে আছে। চল্ যাই।

—এক ডিঙি কাঠ কেটে কি আর লাভ হবে?

—নারে! এবার তবলা কাঠের পাশ আছে। চল্ যাই।

তবলা গাছের কাঠ দিয়ে দেশলাই তৈরি হয়। তাই দামও যথেষ্ট।

আর্জানের কিন্তু লোভ হয়েছিল জায়গাটার নাম শুনে। তিনজনে ডিঙি করে যাত্রা করল—কলিম, আর্জান ও বিশে ঢালি। শিব্‌সা নদী দিয়ে ওরা 'সেখের টেক' পৌঁছল। তিন পোয়া ভাটির পথ।

সেখানে পোঁছে কলিম বলে,—জানিস, এখানে বাঘের বড় আড্ডা। এখানে গভীর বনের মধ্যে একটা পুরনো মন্দির আছে। বাঘের মস্ত ঘাঁটি।

সুন্দরবনে এ আর-এক অদ্ভুত ঘটনা! কোথাও পাকা বাড়ি, কোথাও মন্দির, কোথাও কেল্লা, কোথাও বা পরিষ্কার মিষ্টি জলের পুকুর। এখন অবশ্য সবই জঙ্গলাকীর্ণ। ঐতিহাসিকরা বলেন, এসব তৈরি হয়েছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে। প্রতাপাদিত্যের প্রতাপের নিদর্শন এই সব। ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি আর মগদের দমনের জন্য গভীর বনে তাঁর অনেক ঘাঁটিই করতে হয়েছিল।

আর্জান অবাক হয়ে বলল,—বাঘের আড্ডায় কাঠ কাটবে না কি!

কলিম যেন আশ্বাস দেয়,—না, না। এর থেকেও ভাল জায়গায় নিয়ে যাব। আমরা যাব আরও দক্ষিণে, মার্জাল নদীর বনে। সেখানে বন আর বালুর চর, দুটোই আছে! সেখানে কিন্তু এক রকম বাঘ আছে, তাকে 'কান'-ভাঙা বাঘ বলে। দেখতে কালশিটে। খুব বড়।—বলেই কলিম হাতের হাল ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো কানের কাছে নিয়ে বেঁকিয়ে দোলাতে লাগে।

বিশে ঢালি ও আর্জান তো হেসেই খুন। হাল-ছাড়া ডিঙি নদীর মাঝে এক পাক খেলো।

কলিমের রসিকতা সর্বত্র। এখন এমন হয়েছে, কলিমকে দেখলেই সবাই ভাবে—কিছুটা হাসিঠাট্টা করতেই হবে। ওরা হাসি ও আমোদে ভাটার টানে চলেছে। কলিম এক সময় এক হিন্দুর বাড়ির বিয়েতে কি ভাবে চেখে দেখার নামে মুখের এঁটো করে দিয়ে চারখানা বড় দইয়ের ভাঁড় বাগিয়েছিল—তারই গল্প জমিয়েছে। সামনে মার্জাল নদী।

এমন সময়ে দূরে একখানা পিটেলের ডিঙি আসছে দেখা যায়। পেট্রোল বোটকে ওরা পিটেলের ডিঙি বলে। ফরেষ্ট আপিসের লোকেরা বন্দুক-ধারী সিপাই নিয়ে সারা বনে এই ধরনের ছোট বোটে পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

ওদের দেখেই কলিম ডিঙি ঘুরিয়ে কুলে ভিড়িয়ে দিল। ফিস্-ফিস্ করে বলল,—আর্জান! বন্দুকটা গামছায় ঢেকে নিয়ে নেমে পড়। শীগ্‌গির!

বে-পাশী বন্দুক ধরা পড়লে আজই ওদের ধরে নিয়ে সদরের গারদে চালান দেবে। আর্জান উঠে গেলে কলিম বলল,—খুব ভাগ্যি! আগে থাকতেই দেখতে পেয়েছি ওদের। তা না হলে আজ রাত্রে 'পাকা বাড়ি'তে বাস করতে হতো!!

পিটেল বোট এসেই ওদের সোজা চ্যালেঞ্জ করল। অমনি কলিম একটা বাঁশের চোঙা দেখিয়ে বলল,—আছে, আছে, আছে!

—আছে বললেই হল! দেখা কি আছে? ও লোকটা কোথায় গেল?

—বাবু, ওকে পাঠিয়েছি একটা তবলার ঝাড় এখানে আছে, তাই দেখতে। ঝাড়টা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

—বললেই হলো! আচ্ছা, দেখা তোর কি আছে!

পিটেলের পুলিশ ডিঙির খোলটা তখন দেখতে লাগল। কলিম বাঁশের চোঙা থেকে কাঠ কাটার পাশটা বের করে ওদের সামনে ধরে। পাশ দেখে পিটেল বোট ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

যাবার সময় কলিম ওদের শুনিয়ে শুনিয়েই বলল,—বে-পাশ বা বে-ফাঁস, যাই বলো, তেমন কোন কারবারই আমরা করি না!

সুন্দরবনের চাষীর এসব ঘটনার কৌশল জানাই আছে। আর্জানকে নদী বরাবর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ডিঙিও এগিয়ে চলবে। পিটেল বোট একদম দূরে মিলিয়ে গেলে ডিঙি থেকে 'কু' দিয়ে সাড়া দিলে আর্জানকে নদীর কিনারায় এসে ডিঙিতে উঠতে হবে।

নিয়ম মত আর্জান এগিয়ে চলেছে। বন্দুকের মায়ায় সে বেশ খানিকটা বনের মধ্যে ঢুকে তারপর নদী বরাবর চলেছে। বেশ কিছুদূর গেছে। ডিঙি থেকে কোনও 'কু' এখনও আসছে না কেন, তাই ভাবছিল।

এমন সময় দূরে 'ট্রিউ, ট্রিউ' হরিণের ডাক। আর্জানের লোভ হল। লোভ হলে কি হবে! পিটেলের বোট বন্দুকের 'চোট্' শুনলে রক্ষা নেই। ভাবল,—নাঃ, ও কাজ করতে নেই। ভাবল বটে, কিন্তু যেদিকে হরিণ ডেকেছে সেই দিক দিয়েই তার যেতে হবে। তাই গাদা বন্দুকে ঘোড়া তুলে ক্যাপটা বসিয়েই নিল।

এগিয়ে চলেছে শিকার করবেনা ঠিক করেও শিকারীর মত এগিয়ে চলেছে—অতি সন্তর্পণে।

এদিকে কলিম হরিণের ডাক শুনেই বলল,—ঢালি, এই খেয়েছে! ছ্যাখ্ আর্জান এবার কি করে বসে! ডিঙি ঢিমে চালা. ঢালি!

পিটেল বোট তখনও মিলিয়ে যায়নি। উজান ঠেলে পাল খাটিয়ে যাচ্ছে। যেতে সময় লাগছে। পালটা এখনও দেখা যায়।

এক-পা, এক-পা করে আর্জান এগুচ্ছে। ওর কুঁজো হতে হয় না। এমনিতেই আর্জান বেটে, খুবই বেটে।

সামনে খানিকটা নিচু জায়গা। সেখানে ঘন গোলপাতার ঝাড়। নারকোল গাছের মোটেই গুঁড়ি না থাকলে, আর মাটি থেকেই পাতার ডগা গজালে যেমন দেখতে হতো—ঠিক তেমনি গোল গাছ দেখতে। ঘন ঝাড়ের মত গায়ে গা লাগিয়ে গাছগুলি হয়। খুবই ঘন। এপাশ ওপাশ কিছুই দেখা যায় না।

হরিণ থাকলে এরই ওপাশে আছে। আর্জান পাশ কাটিয়ে দেখতে দেখতে এগুচ্ছে। বন্দুকের ঘোড়া তোলাই আছে। গুলি করার মত করে বন্দুকও প্রায় কাঁধের কাছে ধরা। দেখতে পেলেই 'চোট্' করতে এক মুহূর্ত লাগবে না।

আর এক পা এগুলেই গোল ঝাড়ের ওপাশে সবটাই দেখা যাবে। পদক্ষেপ এবার আরও ধীর। শরীরের ওজনটা ডান পায়ে রেখেছে। গুলি করার মুহূর্তে খুঁটি নেবার মত করে। এবার বাঁ পা সামনে ফেলবে। চোখের পলক স্তব্ধ। বন্দুক কানের কাছে। টিপে আঙুল লাগানই আছে। বুকভরে একবার নিশ্বাস নিয়ে নিল,—যেন গুলি করার আগে আর নিশ্বাস নেবার দরকার না হয়।

সট্ করে বাঁ পা দিয়ে পদক্ষেপ দিল। কিন্তু একি! ভীতি-বিহ্বল চঞ্চল হরিণ নয়! ধীর স্থির বিরাটকায় ব্যাঘ্র। মাত্র দশ হাত দূরে। বাঘও যেন এই দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আর্জানকে দেখা মাত্র তুই বাহুর উপর খাড়া হয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। তুজনেই চোখা-চোখি। তার মৃত্যুর জন্য উদ্যত অস্ত্র কাঁধের উপর লাগানই আছে। আর্জান বন্দুকের নলকে এতটুকু নাড়ায়নি।

নলটি নাড়ালে হয়ত শিকারী-ব্যাঘ্র বুঝতো—অবকাশ নেই, তার মৃত্যুবাণ এখনই নিক্ষিপ্ত হবে। কই তা তো নয়! কোন সাড়া নেই তুপক্ষে, শুধু তুজনে চোখে চোখে তাকিয়ে আছে! তুজনই হতভম্ব কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তুজনেরই চোখ এবার ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠেছে। বাঘ গোঁ গোঁ করে উঠেছে, আর্জানও গম্ভীর আওয়াজ করে উঠেছে,—শালা! এগুবি তো শেষ করব!

আর্জান সব ভুলে গেছে তুনিয়ার। দৃষ্টি তার একমাত্র বাঘের চোখে। ভুলে গেছে ডিঙি, ভুলে গেছে কলিম, ভুলে গেছে বে-পাশী বন্দুক, ভুলে গেছে পিটেল!

—খবরদার! এগুবি তো শেষ করব!

বাঘের রাগ ক্রমশ চরমে উঠছে, গোঁঙানি এবার গর্জনে। আর্জানের গালাগালিও চরমে উঠেছে।

এ 'গুলি-খেকো' বাঘ কিনা আর্জান জানে না। তবে সে যেন বন্দুককে চিনেছে! বন্দুককে সামনে রেখে লাফ দিলে আঘাত পেতে হবে—এটা সে যেন ধরেই নিয়েছে। বাঘের লক্ষ্য, বন্দুকের নলকে পাশ কাটিয়ে আর্জানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বাঘের রাগ ও আক্রোশ এবার আরও চরমে। মুখে লালা ঝরছে। গর্জনও এখনও হিংস্র। সর্বাঙ্গ দোলা দিয়ে এক একবার ঝুঁকি দিচ্ছে। একবার বন্দুকের বাঁ পাশ কাটিয়ে ঝুঁকি দিচ্ছে, পরের বার ডান পাশ কাটিয়ে ঝুঁকি দিচ্ছে।

আর্জান প্রথমে গুলি করবার জন্যই উদ্যত হয়েছিল। গুলি করলেই নিজে হয়ে পড়বে নিরস্ত্র। এই স্বাভাবিক ভীতিতেই তখন মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল। তারপরই যখন বাঘ বাঁ দিকে ঝুঁকি দেয়, আর্জান বন্দুকের নল সেদিকেই ঘুরিয়ে ধরে ; আবার ডান দিকে ঝুঁকি দিলে, ডান দিকেই বন্দুকের মুখটা করে দেয়।

বাঘ একবার তুবার ঝুঁকি দিয়ে থামে ; আবার শুরু করে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আর্জানের কাছে বন্দুকের মুখ ঘুরানই যেন শেষ অস্ত্র মনে হল।

বাঘ এক এক ঝুঁকিতে এক ফুট তুই ফুট করে এগিয়ে পড়ছে। ঝুঁকি দেবার সময় তুই-তিন ফুট এগিয়ে পড়ে, আবার এক-তুই ফুট পিছিয়ে বসে। আবার ঝুঁকিয়ে দিয়ে তুই-তিন ফুট এগোয় ; আবার এক-তুই ফুট পেছয়। এ এক বীভৎস পাঁয়তারা। গোঁঙানি ও গর্জনে বন কেঁপে উঠছে। এক-এক গর্জনে বাঘের অগ্নিসম রক্তাভ মুখ-গহ্বর থেকে লালা ছিট্‌কে পড়ছে ছয়-সাত হাত দূরে।

বাঘ এবার এত কাছে যে, বাঘের লালা ছিটকে এসে পড়ছে আর্জানের মুখে ও দেহে। তবুও আর্জান শেষ দেখা দেখে নেবার জন্য বাঘের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের মুখ একবার এদিক, একবার ওদিক করছে।

মৃত্যুর মুখে আর্জানেরও শেষ পাঁয়তারা !!

বাঘের গর্জন কানে যেতেই কলিমের ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না! ডিঙি কূলে ভিড়িয়ে বলল,—ঢালি! মরেছে, আর্জান তবলা ঝাড় পেয়ে গেছে!! চল্ শীগ্ গির, ছুটে চল্।

—ভয় নেই, আর্জান! এসে গেছি!—চিৎকার করতে করতে ওরা ছুটে চলে। কলিমের হাতে কুড়ুল, আর ঢালির হাতে কাটারি।

শূলো আর কাদার মধ্যে ওরা হরিণের বেগে যেন ছুটে এল। দূর থেকে এই তাণ্ডব কাণ্ড দেখে কলিম চিৎকার করে উঠল —সাবাস্! সাবাস্! সাবাস্! এসে গেছি।

কলিম আগে এসে গেছে। ঢালি তার পেছনে পেছনে। কলিম এসেই সেই তার পুরনো গালি আরম্ভ করল, তর্জন গর্জন আরম্ভ করল। আর কুড়ুলখানা বন্দুকের মত করে উঁচিয়ে ধরল বাঘের দিকে। কলিম আর্জানের পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

একটু দূরে ঢালি আসছিল এগিয়ে। সে থতমত খেয়ে গিয়েছিল এই দৃশ্য দেখে। থেমে গিয়ে এদিকে আসবে কিনা তাই ভাবছিল।

এমনি সময়ে বাঘ তার চাহনি কলিম ও আর্জান থেকে সরিয়ে অকস্মাৎ ঢালির দিকে হানলো। বাঘের গতিক দেখে কলিম দুই কদম ডাইনে সরে ঢালির দিকে যাবার পথ আগলে বিকট ধমক দিয়ে ওঠে,—খবরদার শালা, আবার ওদিকে!

মুখ ফেরাবার উপায় নেই। বাঘের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে হবে। আস্তে আস্তে কথা বলার উপায়ও নেই—বাঘের দিকে অনবরত গর্জন ও গালাগালি করে যেতে হবে। তাই কলিম বাঘের দিকে তাকিয়েই গালি দেবার মত করে বলল,—ঢালি। আয় শালা, আমার পেছনে আয়।

এবার তিনজনে একত্রে। তিনজনেই একত্রে চিৎকার। তিনজনেই মারমুখো। আর্জান বন্দুক উঁচিয়ে, কলিম কুড়ুল বন্দুকের মত বাগিয়ে ধরেছে, আর ঢালি কাটারি নিয়ে এদিক-ওদিক কোপ মারছে।

বাঘ এতক্ষণে ঝুঁকি দেওয়া বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে গর্জনও বন্ধ করল। কিন্তু গর্ গর্ গোঁঙানি থামে না। আরও কিছুক্ষণ পরে বাঘ ওদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এদিক-ওদিক কয়েকবার দেখে নেয়।

গোল ঝোপের পাশে কেঁচকি-কাঁটার ঝাড়। এই গাছ দেখতে ঠিক অবিকল বড় আনারস গাছের মত। বাঘ মুখ ফিরিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে এক-পা দুই-পা করে রাজকীয় চালে কেঁচকি বনের পাশে গেল। তার বলদৃপ্ত পদক্ষেপে কোন ভীতির লক্ষণ নেই, কোন পলাতকের চিহ্ন নেই। হাত পনেরো গিয়ে আবার ওদের দিকে মুখ করে দুই বাহুর উপর উঁচু হয়ে বসল। মুখে গোঁঙানি—প্রতিবাদ ধ্বনি।

কলিম বলল,—চল্ এবার। খবরদার, পেছন ফিরবি না। বন্দুক শালার দিকে ধরে রাখ্।

ওরা আর কেউ কথা বলে না।

কলিম সাবধান করে,—খবরদার, গালি থামাবি না।—বলেই সেও গালি দিতে লাগল!

এক-পা দু-পা করে পেছন দিকে পা ফেলে সবাই পেছুতে লাগল। মুখ ওদের সামনে, চোখ বাঘের চোখে। একই ভাবে নদীর কূল পর্যন্ত চলে এল। বাঘের দৃষ্টি এতক্ষণে হালকা হয়ে এসেছে। একবার এদিক-ওদিক তাকায়, আবার ওদের দিকে তাকায়।

নদীর চরে এবার নামবে। নামলেই ওরা বাঘের চোখের আড়ালে পড়ে যাবে। অর্ধেক আড়ালে পড়েছে, অমনি বাঘ গলা বাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিয়েছে।

তা দেখেই কলিম গালির মত করে বলল,—দাঁড়া! আয়! উঠে আয়!—বলেই কলিম ওদের নিয়ে আবার বাঘের দিকে পাঁচ-ছয় হাত এগিয়ে এল। চিৎকার তখনও সমানে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর বাঘ যখন আবার বসল, তখন ওরা আগের মতই পিছনে পা ফেলে ফেলে চরে নেমে পড়ল। বাঘের চোখের সম্পূর্ণ আড়ালে এবার।

কলিম দ্রুত সতর্ক করে,—খবরদার! ছুটবি না। ছুট দিয়েছিস কি মরেছিস!! ছুট দিলেই শালা তেড়ে আসবে।

এবার ওরা বনের দিকে চোখ রেখে চিৎকার করতে করতে সামনা-সামনি এগুতে লাগল।

ডিঙিতে উঠেই এক ধাক্কা দিয়ে মাঝ-নদীতে ডিঙি ভাসিয়ে দিল।

কলিম এবার ধীর স্থির ভাবেই বলল,—আর্জান, ক্যাপটা এবার রেখে দে, ঘোড়াটা ফেলে দে।

আর্জান আপশোষের সুরে বলল,—গুলিটা করলেই হতো!

—গুলি!! সাবাস্ তোকে, তুই যে গুলি করিসনি! গুলি করলে তোর রক্ষা ছিল না!—কলিমের কথায় অভিজ্ঞ বাওয়ালির দৃঢ় ঝঙ্কার।

মার্জাল নদী। ধু ধু করছে। এপার থেকে ওপার প্রায় দেখা যায় না। এত বড় নদীতে কোথাও কোনও জীবনের চিহ্ন নেই। কোনো দিকে কোনো নৌকাও দেখা যায় না। পিটেল বোটের পালের রেখাও মিলিয়ে গেছে। সাদা ধবধবে নদী। যেন শ্বেত বস্ত্রের শান্ত অঞ্চল পড়ে আছে এপার ওপার দুই সবুজ বনের সীমানার মাঝে। তারই উপর দিয়ে আবারও ভেসে চলে ওদের ডিঙি—মার্জাল বনের তবলা ঝাড়ের সন্ধানে।

বারো

সেবার ভাদ্রমাসটা আর্জানের মন্দ চলেনি। তবলা কাঠ বিক্রি করে বিশ টাকা পেয়েছিল। পেলে কি হবে, আর্জানের অসুখ হয়ে পড়ে। অসুখ হলে অবশ্য খরচ বেশি কিছু নেই। লোনা দেশে ডাক্তার নেই যে খরচ হবে। তবে অসুখে পড়েছিল বলে দৈনন্দিন টুকটাক কিছু আয় করতে পারেনি।

আয় বন্ধ হলেও ফতিমা কিন্তু এ সময় টাকার খোঁটা বিশেষ দেয়নি। সারাদিন আর্জান বাড়িতে, তাতেই যেন সে একটা স্বস্তি অনুভব করত।

অসুখের সময় আর্জান বে-পাশী বন্দুকটা কলিমের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। অসুখে বেহুঁস হয়ে থাকলে কখন কি হয়, এই জন্য কলিমের হেফাজাতেই রেখে দিয়েছিল।

আর্জান ফতিমাকে বলল,—যাও না এবার, বা'জানের কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে এসো না!

—না, ওসব হবে না। এখন কি দরকার? কি হবে ওটা দিয়ে?

—হবে আর কি, কিছুতো আয়-টায় করতে হবে!

—কেন, অঘ্রান মাসে আবাদে কাজের কি অভাব? যাও না…… ধান কাটা আছে, ধান তোলা আছে, ধান বেচা আছে! আরও শুনতে চাও? মুকসুদ মেঞা তো 'জন' খুঁজতেই এসেছিল।

আর্জান চুপ করে গেল! এদিক ওদিক দুদিন ঘুরে কাজ কিছু জুটিয়ে নিল। দিন পনেরো পর একদিন আর্জান বাড়ি এসেই ফতিমাকে বলল,—এবার!

—এবার কি?

—এবার কি করে ঠেকাবে! নতুন নায়েব আমাকে তলব করেছে, শিকারে যেতে হবে। এবার কি করে ঠেকাবে?

—নায়েব তলব করলেই হবে! কি দেবে নায়েব শিকার করলে? জমি দেবে? দেবে এক বিশ ধান?

—নতুন নায়েবকে তাই কি বলা যায়! দাঁড়াও, সইয়ে সইয়ে সব করতে হয়!

—আচ্ছা বেশ যাও, কিন্তু ধান আমাকে দিতেই হবে। বলো নায়েবকে, দিতেই হবে।

আর্জান বনেও গিয়েছিল, নতুন নায়েবকে সঙ্গে করেও নিয়েছিল। গাছাল শিকারে একটা শিঙেল মেরে দিয়েছিল। পুরুষ হরিণকেই ওরা শিঙেল বলে। 'মায়া' হরিণের শিঙ হয় না। সবই হয়েছিল কিন্তু আর্জান একবারও জমি বা ধানের কথা কিছুই বলতে পারে নি।

ধান বা জমি কিছুই হলো না, কিন্তু এই সুযোগে আর্জানের আবার পুরনো জীবন শুরু হল। ফাল্গুন মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সে ক্ষতিমার মত নিয়েই নতুন নায়েবের সঙ্গে, বা কখনও তার নাম করে মাঝে মাঝে বনে শিকারে যেতে লাগল। এদিকে মাঘ মাসের পর আবাদে কাজ পাওয়া দায়। আর্জানের বন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই আবার আগের মত বনে যেতে হয়।

সেদিন বুধবার। হোগলার হাট। হাট বেলা বারোটায় বসবে। অগণিত লোক হাটে এসেছে। কপোতাক্ষীর খালে ডিঙি ও নৌকা ধরে না। নিকটে এত বড় হাট আর নেই।

আর্জান ছোট একখানা ডিঙি করে হাটে এসেছে। একলাই এসেছে। হরিণের মাংস বিক্রি করবে। সোজা বন থেকেই এসেছে। আসবার সময় গভীর অরণ্যে এক বান গাছের খোড়লে বন্দুক ও ছরার থলেটা রেখে এসেছে।

মাংস খুব বিক্রি হচ্ছে। টাটকা মাংস নিয়ে এসেছে। হরিণের মাংস বাসি হলে খেতে ভাল হয় বলে প্রবাদ থাকলেও আবাদের লোকে কিন্তু টাট্‌কা মাংসই ভালবাসে। তাই আজ আর্জানের মাংস খুব বিক্রি হচ্ছে।

এমন সময় একদল পুলিশ এসে আর্জানকে ঘিরে ফেলল। পুলিশ এদেশে বেশি আসে না। পাইকগাছা থানা ত্রিশ মাইল দূরে। তবে আজ পুলিশ এদিকে এসেছিল অন্য একটি বিশেষ কাজে। আর্জানের কথা ওরা জানে। সুযোগ পেয়েই আর্জানকে ধরল।

আর্জান ভেবাচেকা খেয়ে গেছে। দারোগাবাবু তর্জন করে বললেন,—আর্জান, বল্ কোথায় পেলি এই মাংস?

—বাদার হরিণ বাবু।

—বাদার হরিণ বুঝলাম! সে তোর বনকরবাবু বুঝবে। কিন্তু কি দিয়ে মারা হল?

—বাবু, নতুন নায়েব এসেছে; তার বন্দুক আছে। শিকারের বড় সখ তার। তাই তার সঙ্গে গিয়েছিলাম।

—বটে!

বাদানুবাদ এখানেই শেষ হয়। দারোগাবাবু বোটে করে এখানে এসেছিলেন। আর্জানের মনে কোনও সন্দেহ যাতে না জাগে তার জন্য দারোগাবাবু মিষ্টি কথা দিয়ে বাদানুবাদ শেষ করলেন।

আর্জানও প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরদিন ভোরে নতুন নায়েবের কাছারি ঘাটে পুলিশের বোট দেখতেই আর্জানের বুক দুর-দুর করে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফরেষ্ট আপিসের পিটেল বোটও এসে হাজির। দারোগাবাবু ইতিমধ্যেই ফরেষ্ট আপিসে খবর দিয়ে সুব্যবস্থা করেছেন। কালিকাপুরে কয়রা নদীর ওপারেই বন। বনে পুলিশের এক্তিয়ার নেই; নদী পার হলেই গ্রাম—সেখানে আবার ফরেস্ট আপিসের পিটেলের এক্তিয়ার নেই। তাই আর্জানকে ধরতে হলে—পুলিশ ও ফরেষ্ট আপিসের পিটেল, দুজনকেই চাই।

আর্জান বিপদের কথা কলিমকে বলতে গেলেই, কলিম তাকে আর ছাড়ে নি। অন্য কাউকে কিছু না বলে আর্জানকে একটা ডিঙি করে পুব পাশ দিয়ে কয়রা নদী পার করে বনে ছেড়ে দিল। যাবার সময় গামছা ভর্তি করে চিঁড়ে বেঁধে আর্জানের হাতে দিতে কলিম

কিন্তু ভোলে নি। আর্জানের বে-পাশী বন্দুক আগের দিন বনের মধ্যে যেখানে গাছের খোড়লে রেখেছিল, সেখানেই রয়ে গেল।

১৯৩৭ সাল। গভর্ণমেণ্ট আবাদের থানায় থানায় আদেশ জারি করেছে,—সব বে-পাশী বন্দুক আটক করতে হবে। সেই আদেশের বলেই পুলিশ আর্জানের পিছু নিয়েছে। অনেক গ্রামেই বে-পাশী বন্দুক বহু ধরাও পড়েছে।

এ-যাত্রা নতুন নায়েব আর্জানকে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি জবানবন্দী দিলেন যে, তাঁরই বন্দুকে আর্জান হরিণ মেরেছে। তবু পুলিশের সন্দেহ যায় না। আর্জানকে যখন বাড়িতে পাওয়া গেল না, তখন পুলিশেরা চলে গেল বটে, কিন্তু পিটেলের বোট গ্রামের পাশেই একটা খালের মধ্যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পাহারা দিতে থাকে নদী বরাবর। ওদের সন্দেহ, আর্জান এই নদী পার হয়েই গ্রামে ফিরবে। নদী পার হবার সময়েই হাতে-নাতে তাকে ধরতে হবে কারণ একবার নদী পার হয়ে গ্রামে পা দিলেই পিটেলের আর এক্তিয়ার নেই।

এদিকে আর্জান গভীর অরণ্যে মিলিয়ে গেল। এই বন যেন তারই বন! এ বনের নাড়ি-নক্ষত্র তার নখদর্পণে। প্রতিটি গাছ যেন তার চেনা। কত ভাবেই না এই বনের সঙ্গে তার পরিচয়। কখনও মাছ ধরতে, কখনও কাঠ কাটতে, কখনও বা গোলপাতা কাটতে, কখনও বা ময়াল সাপের অথবা 'তারকেলে'র চামড়ার লোভে এসেছে; আর এসেছে—বারবার এসেছে, হরিণের লোভে।

তবুও তার এই বনকে আজ নতুন লাগে। এতদিন সে এসেছে জীবিকার টানে, শিকারের নেশায়। কিন্তু আজ সে নিজে শিকারের বস্তু। হরিণ যেমন করে শিকারীর হাত থেকে বাঁচতে চায়, গাছের আড়ালে, ঝোপের আড়ালে, তার ক্ষিপ্র পদক্ষেপে,—তেমনি করে পিটেলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আর্জানকেও খুঁজতে হবে আশ্রয়। বন আজ তার কাছে আশ্রয়স্থল।

বনবিবিকে স্মরণ করে সে আজ বনের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। নিঃসঙ্গ, খালি হাত,—বন্দুকও তার নেই!

কোথাও হয়ত ঝোপ দেখে তার মনে হয়—এরই আড়ালে হরিণ নিশ্চয় শুয়ে আছে। না। তাদের আজ সে বিরক্ত করবে না। একটা ঝোপ দেখে তার মনে হয়—এও তো একটা বাঘের রোদ পোহাবার জায়গা। না! ওদিকে আজ সে যাবে না। বেশ কিছু দূর এগিয়ে দেখে, একটা ছোট বিলের মত জলা জায়গায় তিনটি-কুমির শুয়ে আছে। কাছে মানুষ দেখলে ওরা তেড়ে আক্রমণ করে। না! আজ ওদের এড়িয়ে যেতে হবে। আর্জান এগিয়ে চলে—আরও গভীর অরণ্যে এগিয়ে চলে। আর্জান বানরের দল দেখে দেখে এগিয়ে যায়। সুন্দরবনে বানরের দল এক নির্ভয়ের নিশানা! যেখানে বানর আছে, বুঝতে হবে সেখানে বাঘ অন্ততঃ নেই। গাছের উপর থেকে বানররাই বাঘকে সহজে দূর থেকে দেখতে পায়। দেখতে পেলেই বানরের দল কিচির-মিচির শব্দ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বানরের এই ডাক বনের সকল জীবের কাছে এক বিপদের সঙ্কেত। তাই আর্জান বানর দেখে দেখেই ক্রমে এগিয়ে যায়। বানর সাধারণত থাকে খালের কূলে কূলে। তাই আর্জানও নদী ও খালের ধারে ধারে এগুতে থাকে।

মনে তার চিন্তার ঝাঁক আসে। দারোগার কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে পিটেলের কথা, ফতিমার কথা, কালিকাপুরের কথা। কিন্তু এ সবই বিদ্যুতের মত এক একবার ঝিলিক মেরে মনের মধ্যে আবার মিলিয়ে যায়। গভীর বনে খালি হাতে কি সে হঠাৎ দেখবে, তাই-ই তার ভাবনা। হরিণ? হরিণ তো তাকে দেখেই পালাবে। সাপ? সাপ তো নিজের জীবন-ভয়ে পালাতে ব্যস্ত। বুনো শুয়োর? আর্জান জানে বুনো শুয়োর এলে কি করতে হবে। বাঘ? এইখানেই অস্বস্তি অনুভব করে সে। বন্দুক হাতে বাঘের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। সে লড়াই সে জানে। কিন্তু সে আজ খালি হাতে। সে জানে, কলিম একাই কি ভাবে খালি হাতে বাঘের মুখোমুখি হয়।

কলিম তখন কি করে তাও সে দেখেছে। কিন্তু সে তো কলিম নয়। সে কি করবে? কোনও কিনারা পায় না। চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। আসুক তো, তারপর যা হয় করা যাবে। তার বেশি আর সে ভাবতে চায় না। ভাববারও যেন সাহস নেই!

ঠিক করল, এদিক-ওদিক না ঘুরে সে তার নিজের বন্দুকটার খোঁজে যাবে। বন্দুক না হলে এভাবে সে কত সময় কাটাবে? ঠিক করলে কি হবে! বন্দুক তো বাঁশপোতা খালের কাছে। সে তো অনেক দূর।

বেলা চারটে বেজে গেছে। বনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ভাল ডালপালা আছে দেখে একটা গাছ ঠিক করল। তাতে উঠতে গিয়ে দেখে, বাঘের নখের আঁচড়ে গাছের ছাল ও কাঠ কেটে দাগ বসে গেছে এক ইঞ্চি গভীর হয়ে। দুটো থাবার দশটা নখের পরিষ্কার চিহ্ন। বাঘ বিড়ালের মত করে দুপায়ে দাঁড়িয়ে গুঁড়ির গায়ে আলস্য ছেড়েছে।

নখ-চিহ্নের দিকে তাকিয়ে আর্জান নিঃশব্দে বিড়ম্বনার হাসি হেসে ভাবল,—এক গাছে নিশ্চয় বাঘ দুবার আসবে না। ঠিক যেমন করে সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ভাবে, এক গোলার গর্তে দ্বিতীয় গোলা পড়বে না। কালবিলম্ব না করে সেই গাছেই আর্জান উঠে ভাল করে বসে গামছা থেকে কিছু চিঁড়ে খেয়ে নিল। কিন্তু পানি! কোথায় পাবে সে তেষ্টার পানি। নদীনালা পানিতে ভর্তি। কিন্তু সবই নোনা পানি। এবার সে আল্লার নাম করে সে-আশাও ত্যাগ করল।

এদিকের পিটেল বোটের লোকেরা কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকতে পারে। তাদেরও নাস্তা আছে, খাওয়া দাওয়া আছে। কলিম ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিয়েছে। পান, তামাক, ডিম, তরিতরকারি দিয়ে তাদের সঙ্গে যেন আত্মীয়তা জমিয়ে নিয়েছে।

পিটেলের বাবু বললেন,—তাতো হলো, কিন্তু আর্জান গেল কোথায় বলোতো?

কলিম বলল,—কাল তো হাটে যাবার কথা ছিল। তারপর

সেখান থেকে নাকি তার খালার বাড়িতে যাবার কথা। হয়ত সেখানেই আটকে গেছে।

—না কলিম ! দারোগা বলে গেলেন, আর্জান বাড়িতেই এসেছে। নিশ্চয়ই সে বনে গিয়েছিল।

—না বাবু, ও-কথাটি বলবেন না ! আমরা বাউলে মানুষ—কত সময় তো এ-কাজে সে-কাজে বিনা পাশেই বনে যাই ; কিন্তু আর্জান ! একদিনও বিনা পাশে বনে যাবে না। পিটেলদের বড্ড ভয় তার।

—আর বাঘের ভয় !

—তা বাবু যা বলেছেন।···আমরা বন-বাদাড়ে মানুষ, আমাদের বাঘের ভয় করলে কি চলে !

—কিন্তু বিনা পাশে বনে যাওয়া কেন ? জানো, সুন্দরবনে বিনা পাশে একটা পাতাতেও হাত দেওয়া নিষেধ। জানো না !

—জানি বাবু। কিন্তু আমাদের রান্না-বাড়ি তো আছে। শুকনো ডালপালাও তো দু-একখানা লাগে। তা ছাড়া ধরুন, এই তো সেদিন জয়নুদ্দির জামাইয়ের খোঁয়াড় থেকে একটা গরু বাঘে নিয়ে গেল। যেতে হলো বনের মধ্যে, বাঘকে এই মুল্লুক থেকে চালান দিতে। এমনি তো লেগেই আছে।

—তা বেশ ! তা বেশ ! রাত্রে বোটে এসো কিন্তু, গল্প শোনা যাবে।

কলিম সত্য মিথ্যা গল্প দিয়ে ওদের মাৎ করে রাখে।

আর্জান গাছের ডালে বসে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাছের তলায় কিছুই দেখা যায় না। এমন সময় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অনেক দূরে বাঘের গর্জন। একবার, দুবার, তিনবার। আর্জান জড়সড়। মাদারের কথা মনে পড়তেই সে আর কালবিলম্ব করে না ! গামছা দিয়ে নিজেকে ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

কিন্তু ওর মনে সন্দেহ—বাঘের এমন ডাক তো আর কখনও শোনেনি। এ তো শিকারের গর্জন নয়। তবে কি ?

আবার যখন বাঘ অমনি করেই একটানা ডেকে ওঠে, আর্জান

বেশ বুঝতে পারে, বাঘ এগিয়ে আসছে। তবে কি তারই গন্ধ পেয়ে এগিয়ে আসছে!

এমন সময় অন্যদিকে দক্ষিণ-পুব কোণে আরেকটা বাঘের ডাক শোনা গেল। আর্জান সশঙ্কিত, সে বুঝি বাঘের রাজ্যে এসে পড়েছে!

এ বাঘ ডাকলে দূরের বাঘ সাড়া দিয়ে ওঠে। আবার তার উত্তরে এ বাঘও ডেকে ওঠে। কয়েকবার এমনি ডাকাডাকির পর পশ্চিমের বাঘটি গর্জন করতে করতে ছুটতে লাগল। ছুটবার সময় আর্জান যেন বাঘের নিঃশ্বাসেরও শব্দ শুনতে পায়। বেপরোয়া হয়ে ছুটছে।

বাঘের মত্ততা দেখে আর্জান বুঝে নেয়, দূরের বাঘটি নিশ্চয় বাঘিনী। বসন্তে বাঘও খেলাধূলা করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। তাই সে ছুটেছে বাঘিনীর সাড়া পেয়ে। আর্জান নিশ্চিন্ত হয়ে গামছার বাঁধন খুলে এ ডাল থেকে অন্য ডালে আরাম করে বসল।

পরদিন ভোর হতেই আর্জান তার বন্দুকের খোঁজে বেরিয়েছে। বনের মধ্যে সহজেই দিকহারা হয়ে পড়তে হয়। বিশেষ করে সুন্দরবনে প্রায় সর্বত্র একই রকম দৃশ্য, একই রকম গাছ-গাছড়া, একই রকম খাল ও নদী। আর্জান দিক-হারা হয়ে পড়েছে। অনেক ঘুরল, তবুও বন্দুকের কোনও হদিশ পায় না। শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে অবশেষে বড় নদীতে খালের মুখে ফিরে এল। এখান থেকেই সে আগের দিন হরিণ মারতে বনের চত্বরে প্রথম প্রবেশ করেছিল। তারপর নিজের পদচিহ্ন অনুসরণ করে অবশেষে বন্দুকের খোঁজ পেল।

আজও তার সম্বল চিঁড়ে। কিন্তু মিঠে জল! পানি না হলে তো তেষ্টা মেটে না। আর্জানের হাতে তার বন্দুক। বন্দুকে জালের কাঠিও পুরে নিয়েছে। সে যেন আর কিছুই পরোয়া করে না। ফিরবার পথে এক গোল-ঝাড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। কয়েকটা গোল ফল ভেঙে তার পানিতে গলা ভিজিয়ে নিল।

আজ সে বাড়ি ফিরবে। যেমন করে হোক সে ফিরবেই। কিন্তু বনের পথে সময় ঠিক রেখে চলা কঠিন। কখনও পড়বে জলা

জায়গা, কখনও পড়বে খাল। হয়ত কাপড় খুলে সাঁতার দিয়ে পার হতে হবে। সব কিছু এড়িয়ে আর্জান অর্ধেক পথও আসতে পারে না। মনকে বোঝাল, আজও তার কপালে রাত্রে বৃক্ষ-বাস আছে।

গতদিনের মত আজও সে ঠিকঠাক করে গাছে উঠে বসে। কিন্তু বসতে না বসতে আর্জান চঞ্চল হয়ে উঠল। ভীতও হয়ে পড়ল। কি যেন বনবাদাড় ভেঙে আসছে। মড় মড় করে গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ। সমগ্র বন যেন দুলে উঠছে। চারিদিকে পাখির দলের ত্রাহি ত্রাহি ডাক। এদিকে-ওদিকে বনের জীবজন্তু ছুটে পালাচ্ছে। হরিণের পাল ছুটেছে তীরবেগে।

আর্জান কূল-কিনারা পায় না। সেও কি বনের হরিণের পালের সঙ্গে ছুটে পালাবে! কি করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। ঠিক করে শক্ত হয়ে বসে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল! কি ভীষণ জীব। সমগ্র বন তোলপাড় করে তুলেছে। আর্জানের মনে হল, বন্দুকের গুলিতে একে সে রুখতে পারবে না। বুক তার কেঁপে ওঠে। এক হাতে বন্দুক নিয়ে ডালের উপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করে। কিছুই তার লক্ষ্যে আসে না। দ্রুত এগিয়ে আসছে। গাছ-আগাছা দলাই মালাই করে ভেঙে তোলপাড় করে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

দৈত্য! হ্যাঁ, কলিম বলেছিল বটে দৈত্যের কথা,—আর্জানের মনে হঠাৎ খেলে যায়। দৈত্য! কলিমের আরেকটা কথাও মনে পড়ে— খবরদার! দৈত্যের সামনে কখনও মাটি ছাড়বি না। ভূমি স্পর্শ করে থাকবি।

সড়সড় করে আর্জান নেমে পড়ল নিচে। মাটিতে পা স্পর্শ করতেই সে যেন ভরসা পেল।

এবার আর্জানের দেহ যেন কে দোলাতে লাগল। প্রাণপণে গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে রইল। দেখতে দেখতে গাছের মাথার ডাল ভেঙে চূরমার হয়ে গেল। বনের শুকনো পাতা যেন ছুটে এসে আর্জানের দেহে তীরের মত বিঁধছে। দম আটকে মাথা নিচু

করে আর্জান গায়ের জোরে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকে। কে যেন ওকে ভীষণ জোরে মাটি থেকে উপরে তুলবার চেষ্টা করছে।

বেশিক্ষণ না। মাত্র পাঁচ মিনিট। এই সামান্য সময়ে ওকে যেন ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে। দেহে যেন আর কোনও শক্তি নেই। আর্জান মাটিতেই বসে পড়ে। আল্লার নামে শপথ করল, মাটি ছেড়ে আজ সে কিছুতেই গাছে উঠবে না।

বঙ্গোপসাগরের ঘুর্ণিবাত্যা বয়ে গেল সুন্দরবনের এই অঞ্চল দিয়ে দৈত্যের মত। এই দৈত্য বা দানবকে আবাদের মানুষ যমের মত ভয় করে।

পরদিন, আজ সে বাড়ি ফিরবেই। ভোর না হতেই হাঁটতে শুরু করেছে। দুপুর নাগাদ বন থেকে কয়রা নদীর ফাঁকা আলো দেখতে পেল। নদীর কুল বরাবর ওড়া গাছের ঝাড়। তারই আড়ালে আর্জান প্রায় বাঘের মত করে গুটি মেরে এগিয়ে এল। যতদূর দৃষ্টি যায়, কালিকাপুরের ঘাটে কোথাও কিন্তু পিটেলের বোটের সন্ধান পেল না।

আর্জান এবার ভয়ে ভয়ে 'কু' দিল। কোন সাড়া নেই। আবার 'কু' দিল। কোনও সাড়া ওপার থেকে আসে না। একটু বাদে কয়েকবার পর পর 'কু' দিল। এবারও কোন সাড়া নেই। আর্জান ভয় খেয়ে যায়। মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি পিটেল বোট আমাকে না পেয়ে কলিমকেই ধরে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ নজর করে থাকবার পর আর্জান দেখে, ফতিমাই ডিঙি খুলে এপারে আসছে। আর্জান নিঃসন্দেহ হল, কলিম নিশ্চয় ধরা পড়েছে।

ফতিমা এপারে আসতেই আর্জান মুখ বাড়িয়ে দেখা দিল।

—তুমি যে ?—আর্জান ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে।

—তবে কে আসবে ? পাড়ায় এখন মিনষে বলতে কেউ আছে নাকি !

—কেন, বা'জান কোথায় গেল ?

—যাবে আর কোথায় ! তোমার জন্য কান পেতে পেতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। চলো, এবার একবার ওপার চলো !

—কেন কি হয়েছে ?

—হবে আর কি ! চলো, এবার বোঝাপড়া আছে !

তেরো

সত্যি এবার ফতিমা বোঝাপড়া করতে চায়। উঠানে আসতেই ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,—ঘরে চাল বলতে ধান-কুড়াও নেই, উনি বন-বাঘ-হরিণ-বন্দুক করে বেড়াচ্ছেন! পারব না এ সংসার চালাতে। কেন, মনে ছিল না বিয়ে করার সময়? হয়ে যাক আজ বোঝাপড়া।

আর্জান এই ব্যবহারের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। বনে আসবার পথে কত ভেবেছে, এবার গিয়ে বাঘ বাঘিনীর কথা, দৈত্য দানবের কথা,—কত বলবে। সব কোথায় উবে গেল। ফতিমার কথায় তার নিদ্রাহীন, অভুক্ত, শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে যেন আগুন জ্বলে উঠল। কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

ফতিমা অনর্গল বলে চলেছে। আর্জান একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলল,—যা পার করো!

কলিম শুধু বাঘের ওঝা নয়। সে কলেরা-বসন্তেরও ওঝা। দুই বাঁকের মাথায় চন্দ্রঘোনা গাঁয়ে কলেরা হয়েছে, তাই সকালে জল-পড়া দিতে গিয়েছিল। আসবার পথে ভেড়ি থেকে হুঁকোর শব্দ পেয়ে কলিম তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে।

ভিতর-বাড়ির উঠানে এসে চিৎকার করে ওঠে,—এসেছিস্ আর্জান? পাশে ফতিমার উগ্রমূর্তি দেখে বলল,—তুই কি রে। কোথায় একটু আদর-যত্ন করবি, তা না খেঁকিয়ে উঠেছিস্, থাম তুই।

ফতিমার তখনকার মত থামা ছাড়া আর উপায় ছিল না। একখানা কুলো হাতে ছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিল তা দাওয়ার উপর। মুখ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে 'যেমন গুরু তার তেমন শিষ্য' বলেই হন্‌হন্ করে চলে গেল গোয়াল ঘরের দিকে।

—শুনেছিস্?—বলেই কলিম একটা ধাক্কা দিয়ে আর্জানের কাঁধটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আর্জান ত্রস্ত হয়ে উত্তর না দিয়েই প্রশ্ন করল,—পিটেল পুলিশের কি হল ?

—পুলিশ ! পুলিশ তো সেইদিনই কেটে পড়েছে। আর পিটেল !······পিটেলের বাবুকে মাৎ করতে কতক্ষণ লাগে ! তার পরদিনই ওরা চলে গেছে। কিন্তু একটা কথা, কাল বেদকাশীর হাট আছে। আমার সঙ্গে তোকে একবার যেতে হবে। পিটেল বাবু বলেছে,—তোর সঙ্গে একবার দেখা না হলে 'রিপোর্ট' ঠিকমত নাকি দেওয়া যাবে না। ভয় নেই তোর, কিচ্ছু ভয় নেই।

—যদি ধরে চালান দেয় !

—দূর পাগল ! কেন, অসুখ-বিসুখ হলে আমার কাছেই তো আসতে হবে ! কোথায় পাবে নোনা দেশে ডাক্তার ? বাবু ভাল লোক, কথা খেলাপ করবে না। কিন্তু তোর বন্দুকটা সাবধান। আজকাল আমার বাড়িতেই রাখবি। রাত্রেই দিয়ে আসবি। বলা যায় না, নায়েবের লোক তো আছে এ পাড়ায়।

*　　　　*　　　　*

কালিকাপুরে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে। কলিম আর্জানকে বনকর আপিসে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের দুজনকে হাত করার জন্য পিটেলবাবু খুব করে পিঠ থাবড়ে আদর করেছিলেন। বাঘের উপদ্রব তো আছেই,—তাই একসঙ্গে বাওয়ালী ও শিকারীকে হাত করা কম কথা নয়।

আর্জানেরও আগের জীবন শুরু হয়ে গেছে। কতদিন আর বনে না গিয়ে তার সংসার চলবে। বাচ্চা বা বুড়ো হরিণ যা পায় তাই মেরে নিয়ে আসে। মাঝে একবার 'তারকেল' মারবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। গো-সাপ সুন্দরবনে যথেষ্ট পাওয়া যায়, গো-সাপকে এদেশে 'তারকেল' বলে। এই সময় এক একটা তারকেলের চামড়ার দর হয়েছিল পাঁচ-ছয় টাকা।

বৈশাখ মাস। নতুন নায়েব চৈত-কিস্তি আদায় করে দেশে

ফিরবেন। যাবার সময় হরিণের মাংস সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কাজেই আর্জানের ডাক পড়ল।

সেদিন তুপুরেই আর্জান যেতে চেয়েছিল বনে। কিন্তু বিশে ঢালি মাঝে পড়ে ঠিক করল, কাল সকালে যাওয়াই ভাল হবে।

বিশে বলল,—কি হবে আজ গিয়ে? এক বেলাতে বসে শিকার না পেলে খালি হাতে ফিরতে হবে। তার চেয়ে কাল সকাল ও বিকাল তুবেলা চেষ্টা করে একটা না একটা পাওয়া যাবেই।

—ঠিক বলেছ ঢালি!—নায়েব মাংসের লোভে বলে উঠলেন। ঢালির মতলব বুঝে আর্জান তাতেই সায় দিল।

কাছারি বাড়ি থেকে আসবার পথে ঢালি মনের কথা খুলেই বলল,—বুঝলে-না শিকারী! এক কাজে তু কাজ হবে। সকালে যাব, মধু কাটব, আর বিকালে হরিণ নিয়ে আসব।

ঢালির মধুর লোভ খুব। তবে কখনও বন্দুক ছাড়া বনে যেতে চায় না। নায়েবের বন্দুক নিয়ে সকালে তিনজনে বনে উঠেছে। আর্জান, ঢালি আর সানাই মোড়ল। সানাই মোড়ল ওদের নতুন সঙ্গী। সানাই নায়েবের নবাগত পেয়াদা। বলিষ্ঠ চেহারা; যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। বুকখানি পাটার মত, কালো রং, যেন সব সময় তেলে চক্‌চক্ করছে। লাঠিয়ালের বংশ। লাঠি খেলাও ভাল জানে। নায়েব সব দেখে শুনে ওকে পেয়াদা বানিয়েছেন। পেয়াদার একবার বনে যাবার বড় ইচ্ছা।

মধু কাটবার সাজ সরঞ্জাম সবই আছে। সানাই-এর হাতে বেতের ধামা। সানাই নতুন লোক, তাই তাকে মাঝখানে দিয়েছে। ঢালি আগে আগে, আর আর্জান পেছনে।

যাত্রা করার সময় আর্জান সানাইকে বলল,—মোড়ল, ভয়ডর করোনা কিন্তু! আমরা আছি, তোমার কোনও ভয় নেই।

—ভয়! ভয় কেন করব? আমরা হলাম জাতে নমঃশূদ্র। ভয়ডর বলতে আমাদের কিছু নেই। তবে বনের খবর তোমরাই বেশি জানো। যা বলবে তাই করবো।

সানাই-এর নরম সুর শুনেই বিশে ঢালি বলে উঠল,—হ্যাঁ, এবার সে কথা মনে থাকে যেন ; বনে তুমি 'পেরজা' আমি পেয়াদা !

আর্জান কথা না বাড়িয়ে বলল,—নে এবার চল্।

বনে উঠলে সবারই কথা বন্ধ হয়ে যায়। এমন গম্ভীর আবহাওয়া সেখানে, আপনা থেকেই মনে হয়—এখানে কথা বললেই বিপদ !

ওরা তিনজনে নিঃশব্দে চলেছে। যে-বনে উঠেছে সেটা লোকলয়ের খুব কাছে। হরিণ বা বাঘ এ বনে বিশেষ দেখা যায় না। বিশে ঢালি তাই নিশ্চিন্ত মনে মধুর চাক দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে। বেশ এগিয়েও গেছে।

সানাই নতুন লোক। শূলো দেখে দেখে পা ফেলে চলতে গিয়ে বেশ পিছিয়ে পড়েছে।

এদিকে আর্জান যেন গা ছেড়ে দিয়েছে ; মধুর জন্য অত ব্যগ্রতাও নেই, আর বাঘ বা হরিণের জন্য অত সতর্কতাও নেই। তাই সে-ও সানাই থেকে বেশ পিছনে পড়ে গেছে।

যে-পথ দিয়ে ঢালি চলেছে, ঠিক সেই পথ দিয়ে সানাইও চলেছে। আর্জানও সেই বরাবর এগুবে। ওরা তিনজনেই এক লাইনে।

অকস্মাৎ আর্জানের চোখে কি যেন নড়বার ছায়া পড়ল। তারই ডান দিকে। বেশ কিছুটা দূরে।

শিকারীর চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে খুঁজতে লাগে। সাপ ! এতদূর থেকে সাপকে দেখা যাবে ? হতেও পারে ! হলেও কিছু করার নেই। একটুকু সাবধান হতে হবে, এইমাত্র। তারকেল ! তাও তো হতে পারে। হলেই বা কি ? ঢালি ও মোড়ল দুজনেই এগিয়ে গেছে। তাদের ডেকে তারকেলকে ঘিরতে ঘিরতে কোথায় পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ঢালি ও মোড়লকে কি সাবধান করবে ? না, মিছেমিছি সাবধান করতে গেলে ওরা ভীত হয়ে পড়বে। তবে কি আমার চোখের ভ্রম ? বাতাসে কি ডালের ছায়া নড়ে উঠল ? না, তা তো নয়, বাতাস তো নেই। হরিণ ! না, তা হতেই পারে না।

ছায়াটা মাটির সঙ্গে মিশে যেন নড়ছিল। চঞ্চল হরিণ এমন স্থির কখনও হয় না। তবে?

শিকারী দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটি তার বড় হয়ে উঠেছে। ঘ্রাণে অনুভব করার জন্য নাকের ডগা ফুলিয়ে ফুলিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। বেশি সময় নয়। পরমুহূর্তে সেই ছায়া আবার যখন নড়ে উঠল, তখন মাটির সঙ্গে মেশান কাল রেখাকে চিনতে আর্জানের দেরি হয় না!

অতোবড় বাঘ কিভাবে শুয়ে আছে! কেমন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে! পেছনের পা দুটো যেন লম্বা করে টান টান করে দিয়েছে। লেজটাকে সেই দুই পায়ের মাঝখানে লম্বা করে ফেলে নিয়েছে। মুঠো-হাত উঁচু শূলোর মাঝে শরীরটাকে বসিয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে লেপটে আছে। দূর থেকে কালো-হলুদ ডোরা কিছুই দেখা যায় না। শুধু পিঠের কালো রঙটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। মুখখানা তার সানাই-এর দিকে। এতটুকু শব্দ নেই, এতটুকু সাড়া নেই!

দেখামাত্র আর্জান সামনের গাছটার আড়ালে লুকিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ল। হাটু ভেঙ্গে গুলি করবার মত বসে গুঁড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে।

বাঘ এমনভাবে শুয়ে আছে, মাথায় গুলি করবার উপায় নেই। ঝুপ করে গুটি মেরে একটু এগিয়ে আবার সে আগের মত মাটির সাথে মিশে গেল। দু-একবার উঁকিঝুঁকি মারে, আবার এগিয়ে যায় সট্ করে।

এবার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবার সুযোগ থাকলেও গুলি করার উপায় নেই। আর্জান, বাঘ আর সানাই এক লাইনে। একটু এপাশ ওপাশ হলেই সানাই-এর গায়ে গুলি লাগবে!

আর্জানের মনে অস্বস্তি! ছট্‌ফট্ করতে থাকে। হাতে বন্দুক। ঘোড়া তোলাই আছে। সামনে শিকারের বস্তু। হিংস্র শিকার বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই। অতি সন্নিকটে। সে নিজে শিকারের

অলক্ষ্যে। শিকারের মন ও দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ। তবুও গুলি করবার উপায় নেই। সামনেই সানাই মোড়ল।

সানাই কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে চলেছে। শূন্যে দেখে পা ফেলে ফেলে। বাঘ উঁকিঝুঁকি মারে গাছের আড়াল থেকে। সানাই একটু থামলে সে মাথা নিচু করে 'ঘাপটি' মারে। আবার উঁকি মেরে দেখে গুটিগুটি এগোয়। পরক্ষণে আড়াল নিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

আর্জানও লুকোচুরি খেলে এগোয় বাঘের দিকে গাছের আড়ালে আড়ালে।

বাঘ জানে না, তার পেছনে কি ঘটছে! সেও লুকোচুরি খেলে এগোয় সানাই-এর দিকে। গুঁড়ির আড়ালে মাটির সাথে মিশে মিশে।

সানাই নিশ্চিন্ত। সেও জানে না, তার পেছনে সাক্ষাৎ মৃত্যু কিভাবে এগিয়ে আসছে!

সবার আগে চলেছে বিশে ঢালি। সেও জানে না, তার পেছনে তিনজনে মিলে কি পাঁয়তারা চালিয়েছে।

বাঘ এবার চার পা আস্তে আস্তে এক জায়গায় করেছে। আর্জান শঙ্কিত হয়ে ওঠে, আর দেরি নেই! ইচ্ছা হল, সে চিৎকার করে বলে ওঠে—'সাবধান! তফাৎ যা!' কিন্তু চিৎকার করলে একমাত্র লাভ হবে, মোড়ল আরও ভেবাচেকা খেয়ে যাবে। বাঘের আক্রমণ ঠেকানো যাবে না। নিশ্বাস রুদ্ধ করে আর্জান মুখ বন্ধ করে রইল। বন্দুকের নিরিখ সে আরও সূক্ষ্মভাবে করবার চেষ্টা করে। বন্দুকের মাছি যাতে একটুকু কেঁপে না ওঠে।

বাঘ লেজ দিয়ে মাটিতে আঘাত করেছে। একবার, দুইবার···। আর্জান আর মুহূর্ত দেরি করে না। বেপরোয়া চিৎকার করে উঠল, —সাবধান! সাবধান!

সানাই মোড়ল পেছনে মুখ ফিরিয়েছে! কিন্তু ঐখানেই শেষ! বাঘের বিকট হুঙ্কারে আর্জানের চিৎকার মিলিয়ে গেল। বলদর্পে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মোড়লের হাতে ছিল ধামা। বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের দায়ে মাথার উপর ধামাটা তুলে ধরে।

বাঘের লক্ষ্য ছিল মোড়লের ঘাড়। তার সামনের থাবা দুটি পড়ল ধামার উপর। থাবার চাপে মোড়ল বসে পড়েছিল প্রায়। শক্তিশালী হাঁটুর জোরে মোড়ল পরমুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বাঘ দুপায়ে দাঁড়িয়ে। দুই থাবা তার ধামার উপর। মোড়ল সবলে দুই হাত দিয়ে ধামা উঁচু করে 'পেলা'র মত দাঁড়িয়ে গেছে!

বিশে ঢালি ভাবতেই পারেনি এই বনে বাঘ আসবে। গর্জন শোনামাত্র কোথায় কি তা দেখবার চেষ্টা না করে প্রথমেই উঠেছে একটা গাছে। নিচের ডালে উঠে তাকিয়ে দেখে, বাঘ ও মোড়লের কাণ্ড। তাড়াতাড়ি উপরের ডালে উঠে চিৎকার করতে থাকে, 'আর্জান। আর্জান!' আর গাছের ডালপালা ঝাঁকি দিয়ে বাঘকে তাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। আর্জানের সাড়া না পেয়ে ঢালি আরও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

আর্জানের সামনেই বাঘ। বাঘের পিঠ তার দিকে। আর মোড়ল ঠিক বাঘের আড়ালে। ধামা থেকে থাবা নামিয়ে বাঘ আবার যে আক্রমণ করবে—সে-চেষ্টা তার নেই। দুই থাবা ধামার উপর রেখেই গোঁ গোঁ করতে লাগল। বিস্ফারিত হাঁ করে গজ্‌গজ্‌ করছে, আর একবার বাঁ পাশ দিয়ে, একবার ডান পাশ দিয়ে গলা বাড়িয়ে মোড়লের মাথা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। মোড়ল ডান দিকে মাথা নিলে সেদিকে গাঁ গাঁ করে হেঁকে শানিত দাঁত দিয়ে কামড়াতে চায়; আবার বাঁ দিকে মাথা নিলে সেদিকে আবার চেষ্টা করে।

বীভৎস হিংস্র মুখব্যাদান। জিহ্বা থেকে গল্‌গল্‌ করে লালা ঝরে পড়ছে, ছিটকে পড়ছে। এই লড়াই চলল বেশ কিছুক্ষণ। ধামা বেয়ে লালা যেন জল-ধারার মত মোড়লকে ভিজিয়ে দিল। চোখে মুখে সর্বত্র লালা ছিটকে পড়ছে এক একটি হিংস্র হাঁকে।

আর্জান বন্দুক ধরেই আছে। কিন্তু কোথায় গুলি করবে? গুলি যেখানেই করুক, সে গুলিতে মোড়লও জখম হবেই হবে। ছুটে

পাশে গিয়ে গুলি করবে ? বাঘ দেখতে পেলে ছুটবার অবকাশ দেবে না তাকে।

শিকার এখন তার থাবার মধ্যে। সে যেন রক্তপানের আগে তার সঙ্গে একটু খেলা করছে। হিংসা ও লালসা উগ্র করবার জন্য হিংস্র জন্তুমাত্রই শিকারের সঙ্গে খেলা করে থাকে। শিকার মরে গেলেও থাবা দিয়ে মরা শিকারকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে খেলা করে। এ যেন লব্ধ শিকার নিয়ে লালসা জাগাবার খেলা!

মোড়লের মুখে কোন চিৎকার নেই, আর্তনাদ নেই। তার খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবারই একমাত্র চেষ্টা। একবার যেন মোড়ল টাল সামলাতে পারে না। শূলোতে হোঁচট খেয়ে বাঁদিকে হেলে পড়েছিল আর কি! কিন্তু সামলে উঠল। হাঁটুতে যেন আর জোর নেই। তবু টান্ টান্ হয়ে রইল।

মোড়ল এই সময় বাঁদিকে এক ঝুলে তু-কদম সরে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও পেছনের পা দিয়ে তার বাঁদিকে তু-কদম সরে দাঁড়াল।

এই অবকাশ! আর্জানের দিক থেকে মোড়ল ও বাঘ প্রায় পাশাপাশি হয়েছে। মোড়লই বা আর কতক্ষণ যুঝবে! আর্জান কালবিলম্ব করে না। সে ঠিক নিরিখ করে বাঘকে খতম করতে পারবে, কিন্তু দৈবক্রমে মোড়লও যদি আহত হয়! তা হোক! মোড়ল তো আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। তার হাঁটুতে যেন আর জোর নেই।

আর্জান ঘোড়া টিপে দিল। দক্ষ শিকারীর লক্ষ্যভেদী তপ্ত লোহা। কিন্তু তাই কি ?

বাঘ দড়াম করে সেখানেই পড়ে গেল। সানাই মোড়লও সঙ্গে সঙ্গে কাৎ হয়ে পড়ে গেল।

আর্জান আঁৎকে চিৎকার করে উঠল,—সর্বনাশ !!

একটু দম নিয়ে বন্দুকে দ্বিতীয় গুলি পুরল। ঘোড়াটাও উঁচু করে দিল। তারপর এক-পা তু-পা করে এগুতে থাকে বন্দুক উঁচিয়ে।

বাঘ পড়ে আছে। তার তুই থাবার নখে ধামাটাও আটকে আছে। পাশেই মোড়ল এলিয়ে পড়েছে।

বিশ্বাস নেই ওকে ! আর্জান নিকট থেকে বাঘের বক্ষ লক্ষ্য করে আবার চোট্ করল। বুলেটের আঘাতে বাঘের দেহ সামান্য একটু কেঁপে উঠল মাত্র।

আর্জান ছুটে গিয়ে মোড়লকে ধরে। ধরবার উপায় নেই। সারা গায়ে লালা মেখে আছে। বুকের কাছে হাত দিয়ে দেখল, বুক ধুক ধুক করছে। বেঁচে আছে সে ! একবার কাৎ করে, একবার চিৎ করে দেখল, কোথাও কোনও রক্তের চিহ্ন নেই। গুলি তার গায়ে লাগে নি।

গালি দিয়ে ঢালিকে চিৎকার করে ডাকে—গাছে উঠে বসেছিস, শালা ! নেমে আয় শীগ্‌গির !

*　　　*　　　*

ডিঙিতে নিয়ে এসে প্রথমে মোড়লের মাথায় দুজন মিলে জল দিতে থাকে। নোনা জলও খানিকটা খাইয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এল।

কাছারি বাড়ি পৌঁছে আর্জান নায়েবকে বারবার বলে, মোড়লকে ভাল করে জল দিয়ে ধুইয়ে মানুষের বিষ্ঠা গায়ে মাখিয়ে দিতে। বাঘের বিষ থেকে বাঁচবার এই একটা ওষুধই আবাদের মানুষ জানে।

নায়েব তাতে রাজি হন নি ; মোড়লও ঘেন্নায় বিষ্ঠা মাখতে চায়নি।

পরে বাঘকে সবাই ধরা-ধরি করে কাছারি বাড়ির ঘাটে নিয়ে এল। হরিণ না পেলেও নায়েব কিন্তু বাঘ পেয়ে মহাখুশি। সদরে নিয়ে যাবার তোড়জোড় শুরু করলেন। আর্জানকেও যেতে বলেন। কিন্তু আর্জান উত্তরে বলে,—না, বাবু ! সদরে যেতে চাই না। সদরের খবর আমার জানা আছে। একবার গিয়েও দেখেছি। শহরের মানুষের মতলবই আলাদা !

নায়েবও আর পীড়াপীড়ি করেন না। তার মতলব তার মনেই রইল। কিন্তু তিনি না করলে কি হবে, আশেপাশের গ্রামের যারাই ছিল সবাই আর্জানকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তারা বলল—যাও-না আর্জান, গেলে লাভ আছে। বাবুও তো বলছেন যেতে।

বেগতিক দেখে নায়েব মনে মনে লাভ-ক্ষতির হিসাব করে বললেন, —থাক্, ও না যেতে চায় তো থাক্। আমিই ওকে বক্‌শিস্ দিয়ে দিচ্ছি। এই নে পঞ্চাশ টাকা। —বলেই আর্জানের হাতে নোটগুলি গুঁজে দিলেন।

নায়েবকে সবাই ধন্য ধন্য করল। কিন্তু যে দু-একজন খবর রাখে তারা পাশে সরে গিয়ে বলল,—আরে, পঞ্চাশ টাকায় যদি দু-শ টাকা আসে মন্দ কি!

আর্জান টাকা পেয়ে প্রথমটা খুশিই হয়েছিল! কিন্তু একটু পরে তার অস্বস্তি লাগতে থাকে। মুখে কিছু বলল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

নায়েব তোড়জোড় করে বাঘ নিয়ে একখানা বড় নৌকায় উঠলেন। নৌকা ছাড়ার মুখে আর্জান একবার নৌকায় উঠল। নৌকায় উঠে নায়েবকে বলল,—বাবু, একই নৌকায় উঠলেন। বাঘের গন্ধে তো শুতে পারবেন না!

কথা উঠতেই সবাই মতামত দিতে লাগল। কেউ বলল বাঘকে পিছনে রাখতে, কেউ বলল সামনে রাখতে।

কথাবার্তা ও বাঘ নিয়ে সবাই ব্যস্ত। সেই ফাঁকে আর্জান একবার সানাই মোড়লের কাছে গেল। সানাই তখন একটু সুস্থ আছে। ছই-এর আড়ালে হুঁকো টানছে। আর্জান তার গাঁট থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে সবার আড়ালে মোড়লের হাতে গুঁজে দিল। দিয়েই কলকি কেড়ে নিয়ে তাতে একটান দিয়েই নৌকা থেকে ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়ল।

এক ধাক্কায় নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে আর্জান বলল,—বাবু, পেয়াদাকে একবার ডাক্তার-কবরেজ দেখাবেন কিন্তু।

নায়েব নৌকা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন,—হ্যাঁ, দেখাব, দেখাব। আর্জান, তুমি কিন্তু ভিটের কথাটা ভেবে দেখো, ওরা বড্ড মুস্কিলে পড়েছে!

এর পরের ইতিহাস কালিকাপুরের লোকেরা এইটুকুই জানে যে,

সানাই সোজা তার নিজের বাড়িতে গিয়েছিল। নায়েব কোনও ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থাই করেন নি। দুদিন পরে জ্বর আসে জ্বরে প্রলাপ। বকতে থাকে। অবশেষে সানাই বাঘের লালার বিষে সর্বাঙ্গ ফুলে পচে মারা যায়।

চোদ্দ

আর্জান কাছারি ঘাট থেকে একা একাই বাড়িতে ফিরছিল! সারা পথটা সে ভেবেছে, ভিটের কথা। নায়েব কি তাকে শেষ পর্যন্ত ভিটে ছাড়া করবে! সে ভাবতেই পারে না। এই ভিটেতেই তার বা'জানের হেঁতাল গাছটা আছে। তার পাশেই রয়েছে আম্মার কবর। এ ভিটে যে তার। এই ভিটেতেই সে মানুষ হয়েছে। তবু নায়েব এই সর্বনেশে কথা বলে কেন? গাঁয়ের লোকেরা কি চায় সে কালিকাপুর ছেড়ে চলে যাবে? না, না, কেউ তা চায় না। আচ্ছা, যদি না চায় তবে ওরা নায়েবের সামনে কিছুই বলে না কেন?

আর্জানের চিন্তা গুলিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় আজকের শিকারের কথা। ওর সাহস যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। বাঘের চাতুরি ও শিকার-কৌশল সে স্বচক্ষে দেখেছে।—দেখেছে কেমন করে এই হিংস্রজন্তু শিকার করে। এর আগে অনেকগুলি বাঘ সে মেরেছে। কিন্তু তা সবই সামনা-সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সেই হিংস্রমূর্তির সামনে বুক কাঁপলেও সে পেছয়নি। তার সঙ্গে যুঝেছে, লড়াইতে কখনও হার মানেনি। মনে পড়ে কলিমের দুর্জয় সাহসের কথা। কিন্তু আজ যে বাঘের চাতুরিও জানে। কেমন করে সে মোড়লের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বিশে ঢালি! প্রাণের মায়ায় কোথায় উঠেছিল! ভিটের মায়া! ভিটের মায়ায় সে কি করবে? কেনই বা সে ভিটে ছাড়বে?

আবার সব গুলিয়ে যায়। ও যেন কি ধরতে পারছে না। অদৃষ্টের জাল যেন ওকে ঘিরে নিয়ে এসেছে। না, নায়েবই যেন সে জাল বুনেছে। কই, গাঁয়ের এরা তো কিছু কথা বলে না। না, এ ভিটে কিছুতেই সে ছাড়বে না!

আর্জান বাড়িতে এল। এবার এসেই যেন ফতিমার উপর অপরিসীম মায়া অনুভব করে। তাকে যেন সে এক্ষুনি কাছে পেতে চায়। এসেই তাকে কাছে ডেকে নিল। কোনও কথা না বলে তার হাতে বাকি যে পঁচিশ টাকা ছিল তা দিয়ে দিল। বলল—এই নাও, তোমাকে দিলাম।

হাতে টাকা পেয়েই ফতিমা খুশি হয়ে উঠল। প্রশ্ন করল,—কোত্থেকে আনলে টাকা ?

আর্জান ঘটনাটা বলতে লাগল। ফতিমার যেন সে-সব কানেই যায় না। তার দ্বিতীয় কাপড় নেই। প্রথমেই সে কাপড় কিনবে। সামনের হাটেই টুকটুকে লাল পাড় শাড়ি।

কাহিনীর শেষে আর্জান যেই বলল, –'হঠাৎ বাঘ মোড়লের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল···', অমনি ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল,—ও! বুঝেছি, তুমি সেই বাঘ মেরেছ! আর তারই এই পুরস্কার!—বলেই ফতিমা নোট ক'খানা ছুঁড়ে ফেলে দিল আর্জানের মুখের সামনে।

আর্জান যেন কেমন হয়ে গেল। কোন কথাই আর সে বলল না। চুপচাপ উঠে বাড়ির বাইরে চলে গেল।

আর্জান চলে গেলে ফতিমা অবশ্য নোটগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তুলে রেখেছিল। বুধবার হাটের দিনে তার থেকে আর্জানের হাতেও টাকা দিয়েছিল।

আর্জানের কিন্তু সর্বদা মাথায় ভিটের চিন্তা। ডাক্তার-আবাদ থেকে আছের সেখ এসে আর্জানের ভাগের জমি চাষ করছে। আছের আগেকার নায়েবকে একশত টাকা সেলামি দিয়ে এই জমি নিয়েছিল! আবাদের চালু নিয়ম—কাউকে জমি ভাগচাষ করতে দিলে, তাকে বসবাস করার ভিটেও দিতে হয়। কিন্তু এই জমির ভিটেতেই আর্জানের ঘর। তাই তাকে না তুললে আছেরকে বসান যাচ্ছে না। সেদিন নতুন নায়েব নৌকায় উঠে এই কথাই আর্জানকে বলেছিলেন।

আর্জান চেষ্টা করে, কি ভাবে নায়েবকে খুশি রাখা যায়। আবার

নায়েবেরও চেষ্টা, কি ভাবে আর্জানকে কৌশলে ভিটে-ছাড়া করা যায়। নায়েবের মনে মনে ভয় আছে,—আর্জান শিকারী, খুবই অবশ্য শান্ত, তবুও শিকারী তো! বন্দুক হাতে ঘোরাফেরা করে। বলা যায় না, রাগের মাথায় হঠাৎ কি করে বসে!

এবার ভাদ্র মাসে আর্জানের অবস্থা প্রায় অচল হয়ে উঠল। আর যেন সংসারের খরচ ওঠে না। এই সময় সুন্দরবনের বহু অংশই জলে জলাকীর্ণ হয়ে যায়। অতো জল ভেঙে হাঁটতে গেলে ছপ্ ছপ্ শব্দ হবেই। তাতে চকিত হয়ে হরিণ আগে থাকতেই পালিয়ে যায়। তাছাড়া আর্জানের বন্দুক বে-পাশী। বে-পাশী বন্দুকের জন্য চোরাই বারুদ মশলা কিনতে হয়। দামও দিতে হয় অনেক। আর্জান যেন কূল-কিনারা করতে পারে না।

কলিম এতদিন ধরে একটা কথা চেপে রেখেছিল। বেদকাশীর বনকর-বাবুর সঙ্গে কলিমের খুব ভাব। তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন,—কলিম, তুমি বলো না একবার আর্জানকে আমার আপিসে কাজ করতে।

কলিম তার উত্তরে বলেছিল,—না বাবু, তাই কি হয়। আমরা হলাম চাষী। ভিটে মাটি ছেড়ে আমাদের কি নোকরগিরি পোষায়?

রসিদ সাহেব তখন আশ্বাস দিয়েছিলেন,—না, না, সে ভাবনা নেই। আর্জানকে কি আর আপিসে বসে থাকার কাজ দেব। সে থাকবে পিটেল বোটে। মাঝি হয়ে থাকবে। বনে বনে ঘুরবে, আর বন্দুক তো বোটেই থাকবে। দেখো, আর্জান খুশীই হবে। দশ টাকা মাইনে পাবে আর বোটেই খাওয়া-দাওয়া করবে।

এ কথার উত্তরে কলিম বিশেষ কিছু বলতে পারেনি তখন। এবং সে আর্জানকে এসব কথা এ পর্যন্তও বলে নি।

এবার নিদারুণ অভাবে আর্জানের অবস্থা দেখে কলিম সে-কথা পাড়ে। আর্জান যেন হাতে রাজ্য পেল। পরের জোয়ারেই বেদ-কাশী গিয়ে রসিদ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা হল। চাকরি পেয়েও গেল। বনে বিনা লাইসেন্সে শিকার করা নিষেধ। আর্জান তো

বিনা পাশেই এ মুল্লুকের হরিণ শেষ করে দেবার মত করেছে। তাকে রোখা দায়। কাজেই রসিদ সাহেবও চাকরি দিয়ে আর্জানকে আটকাবার সুযোগ ছাড়তে চান না।

কিন্তু বাদ সাধল ফতিমা। কলিম যা ভেবেছিল তাই হল। ফতিমা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এতদিন আর্জান যা-ই হোক তার কাছেই ছিল। কিন্তু এবার সে তার কাছ-ছাড়া হবে। শুধু বন্দুক, বাঘ, আর বন করে বেড়াবে। সে কিছুতেই আর্জানকে এই চাকরি নিতে দেবে না।

কলিম বুঝিয়ে বলে,—দেখ্ ফতিমা, ওরকম করিস না। জানিস্, আর্জান কত বড় শিকারী? ওর সাহস দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। তাই তো বনকর-বাবু ওকে ডেকে সেধে চাকরি দিলেন।

বা'জানের মুখে আর্জানের প্রশংসা শুনে ফতিমা চুপ করে গেল।

কলিম বলে চলে, —জানিস্, আর্জানকে এদেশে সবাই এক ডাকে চেনে। কে আছে আবাদে যে একা অতোগুলি বাঘ মেরেছে? কার অমন বুকের পাটা আছে যে অমন করে বনে বনে একা ঘুরতে পারে?

ইতিপূর্বে আর্জানের প্রশংসা অনেকেই করেছে ফতিমার সামনে। সে-সব সময় ফতিমা মুখে যাই বলুক, আর্জানের ওপর তার একটা শ্রদ্ধা জাগত। তবু আর্জান ফিরে আবার বনে যাক—তা কিন্তু মোটেই সে সহ্য করতে পারত না। আর্জানের একগুয়েমি ও বনের নেশা ফতিমাকে চিন্তিত ও ত্যক্ত করে তুলতো।

কিন্তু এখন বা'জানের মুখে আর্জানের মনখোলা প্রশংসা শুনে ফতিমা কি জানি কেমন হয়ে গেল। কেমন যেন ওর আর্জানের জন্য মনটা নরম হয়ে গেল। কোথায় গেল ওর রাগ, কোথায় গেল ওর ক্ষেপে ওঠা!

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বা'জানের কাছ থেকে উঠে কাজে মন দিল।

ছদিন পরেই আর্জান পিটেল বোটে চাকরিতে যোগ দিল। আর্জানের নতুন জীবন। বোটে ওকে বেশি কাজকর্ম করতে হয় না। বনের এটা-সেটা গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। আর্জান বিনিয়ে গল্প করতে পারে না। দু-চারটি কথায় তার এক একটা বাঘ মারার গল্প শেষ হয়ে যায়। তবুও সবাই সেই দু-একটা কথা শুনবার জন্য কতভাবেই না ব্যগ্র হয়ে ওঠে!

ব্যগ্র হবার কারণ ছিল। আর্জানের সম্পর্কে কত লোকের মুখে কত গল্প শুনেছে পিটেলের লোকেরা, তার ঠিকঠিকানা নেই। শুধু শুনেছে না, আজ ওরা দেখছেও—আর্জান কেমনভাবে টপ্ টপ্ করে হরিণ শিকার করে আনে। কথা নেই বার্তা নেই বনে চলে যায়, আর আসবার সময় হরিণ সে একটা আনবেই। অথচ সে আসার আগে পিটেলের লোকেরা কত চেষ্টা আর কত কায়দা করে তবে শিকার করতে পেরেছে!

বছর ঘুরে যায়! আর্জান চাকরি করছে। মাসে মাসে দশ টাকা পায়। প্রথম প্রথম ফতিমাকে খরচের টাকা দিতে হত। কিন্তু এখন আর বেশি দিতে হয় না। আর্জান চলে যাবার পর থেকে ফতিমা বাড়িতে একা। কিন্তু অমনভাবে একা থাকতে বড় ভয় ফতিমার। কিছুদিন পরেই কলিম তাকে ডেকে এনেছে। রাত্রিতে কলিমের বাড়িতেই থাকে। ভোরে আবার নিজের বাড়িতে যায়। কাজকর্ম করে, রান্না করে, সন্ধ্যার আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে বাপের বাড়িতে চলে আসে। ফতিমার আম্মা এই টানা-হেঁচড়া জীবন যাপন করতে দিতে বেশি দিন রাজি হননি। ফলে এখন ফতিমা কার্যত বাপের বাড়িতেই থাকে আর ঘরদোর পরিষ্কার রাখবার জন্য দিনে একবার মাত্র নিজের বাড়িতে যায়। এই সুযোগে আর্জান কলিমের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু টাকা জমাতে থাকে। জীবনটা যেন সহজ হয়ে এসেছে।

কিন্তু কাল হল এইখানেই। বিপদ কখনও একা আসে না, এ কথা আর্জান মর্মে মর্মে অনুভব করল। কলিমের কলেরা হল।

কিন্তু সে কিছুতেই কোন ওষুধ খাবে না। ওষুধ খেতে ফকির আর বাওয়ালিদের নিষেধ আছে—কলিমও খেলো না কিছুতেই। কদিনের মধ্যে কথা জড়িয়ে এল, অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অবশেষে মারা গেল।

কলিমের মৃত্যুতে যেন কালিকাপুরে কিছুদিনের জন্য অন্ধকার নেমে এল। কারও মুখে আর কোনও কথা ছিল না—শুধু কলিমের কথা। আর্জান খবর পেয়েই ছুটে এল, তার মুখেও অন্য কোন কথা নেই।—কলিম তাকে কবে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, কখন কি বলেছিল, শুধু সেই কথাই তার মুখে। চারদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল। ছুটি ফুরলে আবার চলে গেল। কলিমের সংসারের কি হবে, তার সংসারেরই বা কি হবে—তা নিয়ে কোন কথাই সে বলেনি। মনমরা হয়ে যে-ভাবে এসেছিল সেই ভাবেই মনমরা হয়ে চলে গেল।

মাসের পর মাস ঘুরে যেতে থাকে। কলিমের মেঝ ছেলে সুখচাঁদ এখন জোয়ান হয়েছে। চাষ-বাস করে। তাছাড়া কলিম পাঁচটি গরু রেখে গিয়েছিল। কাজেই সংসার চলে যায়।

কিছুদিন পর আর্জান খবর পেল—আছের সেখ তার বাড়িতে চড়াও করেছে। ফতিমা রোজ নিজের বাড়িতে যেত, কিন্তু সে ভয়ে ভয়ে ইতিমধ্যে সব জিনিসপত্র সরিয়ে বাপের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। একদিন সকালে দেখে, আছের সেখ বাড়ি দখল করে বসেছে। ভাগচাষীর জমি বে-হাত হলে ভিটেও বে-হাত হবে—এই নিয়ম মেনে নিতেই হল। তাই বলে ফতিমা প্রথম প্রথম কিছুতেই মেনে নেয়নি। পাড়া মাতিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করেছে। করলে কি হবে? ধনাই মোড়ল একটা কিছু করলে করতে পারত কিন্তু সে যখন নায়েবের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাবে না, তখন ধীরে ধীরে মেনে নিতে হল নায়েবের ইচ্ছাকেই।

আর্জান সব কিছু খবর পেয়েও—বাড়িতে এল না কিছুদিন। সে নিজেকে অসহায় মনে করল। বোটের অন্য সবাইকে তার ভিটের

কাহিনী বলেছে,—বলেছে তার আম্মার কথা, তার ভিটের হেঁতাল গাছের কথা, তার আম্মার কবরের কথা! একটা কিছু করবার জন্যে বোটের সকলে বললেও আর্জান তখন তখনই বাড়িতে ফিরে এল না-—সে এসে যে কিছু করতে পারবে, এ ভরসা তার নেই। তার ভরসার খুঁটি সে হারিয়েছে—কলিম নেই।

পনেরো

আবাদের ভরসা হারালে কি হবে, বাদার ভরসা আর্জান হারায়নি। এখন তার গাদা বন্দুক নয়। এখন তার হাতে টোটা ভরা বন্দুক। বোটে অনেকগুলিই টোটা-বন্দুক। শিকারের কাজে বা আপদে-বিপদে সবচেয়ে সেরা বন্দুকটাই আর্জানের হাতে সবাই দেয়।

—দেখছিস্ আর্জান, দূরে ওপারে বাঁশের মাথায় কে যেন একটা সাদা কাপড় বেঁধে রেখেছে ?—বোটের পিটেলবাবু উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আর্জান গলুইতে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে একবার দেখে নিল। সেদিকে তাকিয়ে আর্জান বলল,—বাবু! জানেন আমরা এখন কোথায় ? ঝাপ্‌সী নদীর মাঝে। জায়গাটা বিশেষ ভাল না। ঐ 'দনে' দেখছেন, ঐ 'দনে'র মুখে নিশানা দিয়েছে।

যে সব খাল দুটি নদীকে যোগাযোগ করে দেয়, তাকে এদেশে 'দনে' বলে।

—কিসের নিশানা ?—বাবুর ঔৎসুক্য আরও বাড়ে।

—জানেন তো, এখানে অনেকদিন পরে ঘের পড়েছে। নিশ্চয় কোন দল এসেছিল কাঠ কাটতে। তারা মানুষ দিয়েছে। তাই ঐ নিশানা। যাতে আর কেউ ওখানে না ঢোকে। ওদিকে বিপদের সম্ভাবনা।

আর্জানের কথা শুনে পিটেলবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মনে মনে তাঁর আশঙ্কা, 'নলেনে'র বড় বনকর আপিসে এবার গেলেই এই বাঘ তাড়াবার কথা উঠবে, আর তারই ঘাড়ে হয়ত সে দায়িত্ব এসে পড়বে।

—চলুন না বাবু! দেখেই আসা যাক কি ব্যাপার।—বলেই আর্জান বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিল। কিনারায় এসে নোঙরও

ফেলে দিল। পিটেল-বোটগুলি পানসি নৌকার মত। শোবার খোপ, রান্নার খোপ এবং একটা আপিস খোপও আছে। আর এই বোটের সঙ্গে ছোট্ট একখানা 'জালি' ডিঙি আছে। এদিক ওদিক দ্রুত যাবার জন্য বা ছোট ছোট খালে ঢুকবার জন্য এই ডিঙির ব্যবস্থা।

আর্জান ও দুজন মাঝি 'জালি' ডিঙিখানি নিয়ে চলল দেখতে। আর্জান নিয়মমত বন্দুকটাও নিয়েছে।

আর্জান দেখে এসে বলল—বাবু! নিশানা দেখলাম কিন্তু কোনও বাঘের চিহ্ন তো পেলাম না। কিন্তু বাবু, ওরা বেশিক্ষণ এখান থেকে যায় নি। অল্প কিছুক্ষণ আগেই গেছে।

—কিসে তুই বুঝলি ?

—এই যে 'জো' দেখছেন, এই 'জো'র প্রথম পোয়াতে রওনা হয়েছে।

তখন ঝাপসী নদীতে আধা জোয়ার। সিকি জোয়ারের সময়, তার মানে দেড় ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে।

—কিন্তু কি করে বুঝলি ?—বাবু আবার প্রশ্ন করেন।

—যে বাঁশের খুঁটি পুঁতেছে, তাতে এক 'জো'র পানিরও দাগ এখনও পড়েনি।

তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে পাল টাঙিয়ে আর দুই দাঁড় ফেলে ওরা চলল সাঁই সাঁই করে সেই লোকদের ধরবার জন্য। আজ তো বিকেল হয়ে এসেছে। আজ রাতে ধরতে পারলে কাল সকালের ভাটিতে আবার এখানে আসতে পারবে। আর্জানের দৃঢ় ধারণা—সহজেই সে এই বাঘের নাগাল পাবে। ঝাপসী নদীর এই বনে সে অনেকবার এসেছে। এর আনাচ-কানাচ ওর সব জানা।

নলেন আপিসের আগেই পিটেল বোট সেই নৌকা ধরল। নৌকার লোকেরা সবাই মিলে যা বলল তাতে বোঝা গেল :

অনেক দূর থেকে এসেছিল কজনে মিলে গোলপাতা কাটতে। সাত দিন হল এসেছে। ঝাপসী নদীতে নৌকা রেখে গোলপাতা কাটছিল। গোলপাতা কাটার নৌকাগুলি প্রায় সবটাই খোলা। মাত্র হালের

পাশে ছোট্ট একটি খুপরি থাকে। তাতে কোনমতে চেপেচুপে তিন-চার জনে শুতে পারে। নৌকার বাকি জায়গাটা গোলপাতায় বোঝাই হয়। ওরা গত সাতদিনে অর্ধেকের বেশি বোঝাই করে ফেলেছিল।

আজ দুপুর গড়ালেই সকাল সকাল কাজ সেরে সবাই বন থেকে চলে আসে। এসেই সব ঠিকঠাক করে সবে গা ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করছে। হালের ধারে একটা বসবার জায়গা, তাকে কড়াল বলে। সেই কড়ালে একজন বসে ছিল। তার পাশেই খাবার জলের বড় একটা মাটির জালা। বনে কাজ করতে এলে জালা-ভর্তি মিষ্টি জল নিয়ে আসতে হয়। নদীর জল এত লোনা যে মুখে দেবার উপায় নেই।

জালার পাশে হাত দুই ফাঁকা, তারপরই শোবার খুপরি। এই খুপরির ভিতরে একজন বসে ছিল। সে কিন্তু ভয়ানক ভীতু। নৌকা ছেড়ে একদিনও বনে নামেনি। পারতপক্ষে সে খুপরিও ছাড়তে চায় না।

খুপরির পরে গোলপাতা রাখবার দশ-বারো হাত জায়গা। তখন খুপরির ছই বরাবর উঁচু হয়ে পাতা বোঝাই হয়ে গেছে। তারপর নৌকার গলুই। তৃতীয় জন একটি লগি হাতে করে গলুইতে দাঁড়িয়ে নৌকা ঠিক-ঠাক করে নোঙর করছিল। কড়ালের লোকটি তামাক ধরিয়েছে। তার সঙ্গে বসে আরামে তামাক খাবার আশায় গলুই-এর লোকটি তাড়াতাড়ি হাতের টুকটাক কাজ সেরে নিচ্ছে।

সুন্দরবনে বড় নদীতে নৌকা সাধারণত নোঙর করতে হয় তীরের কাছে। মাঝ-নদী গভীরও যেমন, স্রোতের টানও তেমনি বেশি। ওদের নৌকা কূল থেকে প্রায় দশ হাত দূরে। এদেশে সর্বত্র নদীর এক পারে ভাঙন, অপর পারে চর। ভাঙনের পারেই নোঙর ফেলেছে। ভাঙনের দিকে ওঠানামা করা সুবিধা। চরের পারে এমন কাদা যে পা হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাবে। সুন্দরবনের পলিমাটির কাদা নাম-করা। পা বসে গেলে টেনে তোলাই এক বিপদ। বাদার লোকে এই কাদার নাম দিয়েছে 'প্রেমকাদা'। একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না!

এপারে নদীর তীর বেশ খাড়াই। মাটি ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ছোট বড় গাছের শিকড় স্পষ্ট দেখা যায়। তীর বরাবর বলাসুন্দরী গাছের ঝাড়। গোল গোল পাতা। হলদে রঙের ফুলে ঝাড় ভরে আছে।

তামাক টানতে টানতে হালের লোকটি হঠাৎ থেমে গেল। ঝুর-ঝুর করে মাটি ঝরে পড়ল পাড় থেকে নদীর জলে। সেদিকে কান খাড়া করে বলল,—দেখ্‌তো, দেখ্‌তো কি পড়ল ?

—কি আর পড়বে! ভাঙনের মাটি পড়ছে! ––বলেই গলুই-এর লোকটি বলাগাছের ঝাড়ের দিকে একবার তাকায়। ঝাড়ের মাঝ থেকে একটা লিকলিকে ডাল মাথা বের করে আছে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে তুলছে।

আবার যে যার কাজে মন দিল। খুপরির লোকটির উৎকণ্ঠা মিছেমিছিই বাড়ল।

এমন সময়ে অকস্মাৎ বজ্রের হুঙ্কারে বাঘ লাফিয়ে পড়ে। ঝোপের ভিতর থেকে লাফ দিয়েছে হালের দিকে লক্ষ্য করে। গলুইতে নোঙর, কাজেই নৌকার হালের দিকটা স্রোতের টানে একবার এপাশ, একবার ওপাশ করছে। বাঘ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তার নখ-বিস্তারিত থাবা তুটি পড়ল নৌকার ডালিতে। ঠিক জলের জালা আর খুপরির মাঝখানে। আর তার গোটা দেহটা পড়ল ঝপাৎ করে নদীর জলে।

বাঘের গর্জনে আর আক্রমণে হালের লোকটি পাগলের মত হয়ে খুপরির দিকে ছুটে যেতে চায়। জলের জালা ডিঙিয়ে ফাঁকা জায়গাটা আসতেই সে পড়ে গেল ! সেখানে কোন পাটাতন ছিল না, —নৌকার খোলের মধ্যেই পড়ল। সামনেই বাঘের থাবা ডালির উপর। গর্জন করতে করতে বাঘ তুই হাতের উপর ভর দিয়ে নৌকার উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। এই হিংস্র মূর্তির সামনে হালের মাঝি অবশ। যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানেই মাথা নিচু করে বাঘের সামনে গুড়ি মেরে উবু হয়ে পড়ে রইল।

এক ঝাঁকানি দিয়ে বাঘ উঠে দাঁড়াল নৌকার উপর! নৌকাখানি ছলে উঠল। কিন্তু সেই সামান্য ফাঁকা জায়গায় অত বড় দেহ নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? পেছনের দু-পা ডালির উপর। সামনের এক থাবা একটি গুঁরোর উপর, আরেক থাবা লোকটার পিঠের উপর। গোঁ গোঁ করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে খুপরির দিকে তাকাল।

খুপরির ভিতরের মানুষটির কোন সাড়া নেই। মাথা বিছানায় গুঁজে চোখমুখ ঢেকে পড়ে আছে। ভয়ে আড়ষ্ট, যেন কোন চেতনা নেই।

বাঘ তখন সোজা খুপরিতে ঢুকে তার কোমরে গক্ করে কামড় বসিয়ে দেয়। কামড় দিয়েই উঁচু করে মুখে ঝুলিয়ে খুপরির ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গলুইতে লগি হাতে মানুষটি যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই আছে। কোন চেতনা, কোন সম্বিত যেন তার নেই। বজ্রাহতের মত শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

বিড়াল যেমন করে ইঁদুর মুখে করে নেয়, বাঘও তেমনি করে মানুষটিকে মুখে উঁচু করে নিয়ে গলুইতে গেল। চার পা এক জায়গা করে এক লাফে লোকটিকে মুখে নিয়েই তীরে উঠে গেল,—ধাক্কায় নৌকা কাৎ হয়ে জল উঠবার মত।

সেই ধাক্কায় গলুই-এর লোকটি ধপ্ করে ডালিতে পড়ে আঘাত পেল। আঘাতে বুঝি তার চেতনা ফিরে আসতে চায়। আবছা চেতনা নিয়েই লগি হাতে গোলপাতা আর ছই-এর উপর দিয়ে হালের দিকে ছুটে গেল।

'মার, শালা'!—বলে দড়াম্ করে লগি দিয়ে বাড়ি মারল মাটির জালার উপর। জালা চুরমার হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

হালের মানুষটি পিটেল বাবুকে কুপি জ্বেলে এনে দেখাল, তার পিঠে বাঘের থাবার চিহ্ন। কর্দমাক্ত পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে পিঠটা জুড়ে। সবাইকে দেখাবার জন্য তা মুছে ফেলেনি তখনও।

পরদিন সকালে পিটেল-বোট আবার ঝাপসী নদীতে ফিরে এল। সঙ্গে একজন গোলপাতার নৌকার লোকও আছে। সেদিন রাত্রে আর্জান আসতে চাইলে পিটেল বাবু বলেছিলেন,—আর্জান! তুমি সাহস কর এই বাঘের পেছনে যেতে?

—সাহসের কথা বলতে নেই বাবু! অতবড় শক্তিশালী জানোয়ারের সামনে কখন কে সাহস হারায় বলা যায় না!

—তুমি যা বলেছ, ঠিকই বলেছ।

—ওর এক এক থাবায় আঠারো মানুষের বল! আর অতবড় চতুর জীবও আর নেই! অতবড় জানোয়ারটা হেঁটে যাবে আপনার কানের পাশ দিয়ে—অথচ এতটুকু শব্দ পাবেন না।

পিটেল-বোটের একজন মাঝি বলল,—বাবু! এই সুযোগে আপনিও শিকারীর সঙ্গে যেতে পারেন।

আর্জান বাধা দিয়ে বলল,—না! না! ওরকম ভাবে বলতে নেই। নিজের ইচ্ছা ছাড়া এই জীবের সামনে যাবেন না। কথায় বলে, 'বাঘের দেখা, আর সাপের লেখা'।

কাজেই ঠিক হয়ে আছে, আর্জান একাই যাবে। সকালে গোলপাতার নৌকার মাঝি সাদা কাপড়ের নিশানা বেশ খানিকটা ছাড়িয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখিয়ে দিল, কোথাও তাদের নৌকা ছিল। সেখান থেকে অনেক দূরে, প্রায় মাঝ-নদীতে তিনটি নোঙর ফেলে পিটেল-বোট বাঁধা রইল। পিটেল বাবু অবশ্য বন্দুকে গুলি ভরে হাতের কাছেই রাখতে ভোলেন নি।

আর্জান একাই ছোট্ট ডিঙিখানা নিয়ে চলল। সেই বলাসুন্দরীর ঝাড়ে ডিঙির মাথা ঢুকিয়ে ডাঙ্গায় উঠে পড়ল। দূর থেকে আর্জানের ডিঙিখানা একটু একটু মাত্র দেখা যায়।

বাঘের পায়ের খোঁচ দেখে আর্জান প্রথমেই অনুমান করল, এ বাঘ নয়, বাঘিনী। পেছনের ও সামনের পায়ের দূরত্ব দেখেই বোঝা যায়, বাঘ ছোট কি বড়। তারপর সামনের থাবার আকার দেখে বোঝা যায়, বাঘ না বাঘিনী।

আর্জান এগিয়ে চলল পদচিহ্ন অনুসরণ করে। খুব বেশি সন্ত্রস্ত হবার কারণ ছিল না। বনটা খুবই পরিষ্কার। কোথাও বিশেষ ঝোপ-ঝাড় নেই। বহুদূর দৃষ্টি যায়। গাছের লম্বা গুঁড়িগুলি স্পষ্ট দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। যেন উৎসবের সামিয়ানার খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে, এখানে, ওখানে, সেখানে,—সর্বত্র।

শক্ত মাটিতে এলেই আর্জান বাঘিনীর খোঁচ হারিয়ে ফেলে, আবার নরম মাটিতে এলে থাবার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পায়। বেশ কিছুদূর এসেছে। সামনেই ডান হাতে একটা মাঝারি খাল।

বাঘিনী তার শিকার মুখে নিয়েই সোজা খাল পার হয়ে গেছে। এ পারের ফাঁকা বন তার পছন্দ হয়নি। আর্জান মুস্কিলে পড়ল ডিঙিতে ফিরে গিয়ে নিঃশব্দে ডিঙিখানা বেয়ে ঠিক এখানেই আবার ফিরে এল। সোজাসুজি খাল পার হয়ে আবার খোঁচ অনুসরণ করে এগিয়ে চলে।

এপারে বনে মাঝে মাঝে প্রায়ই ঝোপ ঝাড়। একটা ঝোপের দিকে এগুতে গেলে এপাশে ওপাশে তিন-চারটি ঝোপের দিকে লক্ষ্য রেখে তবে এগুতে হবে। পায়ের খোঁচ যে-ঝোপের দিকে গিয়েছে, বাঘিনী সেখান থেকে ঘুরে পাশের ঝোপের দিকেও যেতে পারে। এতদিকে লক্ষ্য রাখার ফলে আর্জানের গতি মন্থর। পনেরো মিনিটে দশ কদমের বেশি এগুতে পারে না। খালের এপারে এসেই আর্জানের স্থির বিশ্বাস হয়—নিকটেই বাঘ আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন ? তার উত্তর আর্জান হয়ত দিতে পারবে না। সুন্দরবন এমনিতেই নিস্তব্ধ ও গম্ভীর, কিন্তু বাঘ যেখানে থাকে সে-বন যেন থম্ থম্ করতে থাকে। গাছ-গাছড়া, ঝোপ-ঝাড়, জীব-জন্তু, পাখি, বাতাস, আলো—সব মিলিয়েই যেন তখন শিকারীর মনে এমনি একটা ধারণা জন্মায়।

কয়েকটি ঝোপ ছাড়িয়ে গেছে। হঠাৎ একটা ঝোপ দেখে আর্জানের মনে হল, এই জায়গায় নিশ্চয়ই বাঘিনী আছে। ঝোপটার অবশ্য কোনই বিশেষত্ব নেই। কেবল পেছনের গাছটা শুকিয়ে

গেছে, ডালে একটিও পাতা নেই। তাই সূর্যের আলো কিছুটা প্রবেশ করেছে।

আবার খোঁচ ছেড়ে দিয়ে আর্জান ঝোপটা লক্ষ্য করেই এগুতে লাগল। বন্দুকের দুটি ঘোড়াই তোলা আছে।

এবার আর কদম নেই। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আর্জান এগোয়। হঠাৎ আর্জান থেমে যায়। ঝোপের ওপাশে লাসের পা চোখে পড়ে। বন্দুক ধীরে অতি ধীরে কাঁধে বসিয়ে নিল! আরও দশ মিনিট ধরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুলে গোটা লাসটা দেখা গেল। কিন্তু কৈ? বাঘিনী তো নেই···

শিকারীর সর্ব প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করে আর্জান অর্ধভুক্ত লাসের কাছে গেল। কিন্তু বাঘিনীর কোন পাত্তা নেই।

বাঘিনী অনেকবার এ-পাশ ও-পাশ করেছে। তার চিহ্ন রয়েছে। অনেক খুঁজে আর্জান সন্ধান পেল, এই ঝোপ থেকে কোন দিকে বাঘিনী এগিয়ে গেছে। মনে মনে আশঙ্কা, হয়ত বা নিকটেই বাঘিনী আছে। শিকারীর দৃষ্টি দিয়ে ভাল করে চারিদিক দেখে নিল। তারপর খোঁচ দেখে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করল।

চলতে চলতে বহুদূর এগিয়ে যায়। এমনিতেই এবার খোঁচ দেখে আর্জানের মনে হচ্ছিল, যেন কাল রাত্রেই বাঘিনী হেঁটে গেছে। পায়ের চিহ্ন সদ্য নয়। হঠাৎ একটা থাবার দাগের উপর হরিণের খুরের দাগ দেখে আর্জানের দ্বিধা কেটে যায়—বাঘিনী কাল রাত্রেই ঠিক চলে গেছে।

আর্জান ফিরে এল। বোটেই ফিরে এল। স্থির করল, এবার নতুন ধরনের পরীক্ষা করবে। রাত্রে লাসের পাশে গাছে উঠে শিকার করবে। বাঘিনী নিশ্চয় আজ রাত্রে আবার আসবে। অবশ্য সুন্দরবনে এ ধরনের শিকার অভিনব। বাসি-খাবারে সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের কোন আকর্ষণ নেই। তবে মানুষের লাস,—এলেও আসতে পারে!

অন্ধকার নামবার আগেই আর্জান একাই ডিঙি করে যথাস্থানে

গেল। ডিঙিখানা একটু টেনে মালে তুলে রাখল। ডিঙি সাধারণত এ দেশে এইভাবেই চরের উপরে টেনে তুলে রাখে। প্রবল জোয়ার-ভাটার দেশে তুলে রাখাই নিরাপদ। তা না হলে স্রোতে ডিঙি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নেয়ও মাঝে মাঝে।

যথারীতি একটা গাছ বেছে নিয়ে তার উপর উঠে বসল। সারা রাত কাটাল, কিন্তু বাঘিনীর কোন সন্ধান নেই। বনে একটা টুঁ শব্দও নেই। শেষরাতে বুঝল, বাঘিনী নিশ্চয় নিকটে নেই। তাই ক্লান্তি কাটাবার আশায় একটা বিড়িও ধরাল। বিড়ির গন্ধ পেলে বাঘিনী লাসের ধারে আসবে না, তাই আর্জান সারা রাত বিড়ি খেতে পারেনি।

গাছ থেকে নেমে ভাবল, শেষ চেষ্টা একবার করে যাবে। দেখা যাক, কতদূর গেছে, আর কোন্ দিকে গেছে। পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর্জান এগিয়ে চলে। হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর এসে পড়ল,—প্রায় তিন মাইল। বনের ভিতর তিন মাইল সোজা কথা নয়।

দূরে একটা বুনো শুয়োর দৌড়ে পালাচ্ছে। সাদা দাঁত দূর থেকেই দেখা যায়। আর্জান গুলি করতে চায় না। গুলি করলেই যে জানাজানি হয়ে যাবে,—এই বনে মানুষ এসেছে।

কয়েক হাত সরে একটা মোটা গাছের পেছনে আড়াল নিল। শুয়োর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আর্জান চম্‌কে উঠল,—নিজেরই পায়ের ধারে অন্য একটি বাঘের পায়ের ছাপ! সদ্য ছাপ! হেঁটে চলে গেছে তার ডান দিকে। এই পায়ের ছাপ সে যাকে খুঁজছে তার নয়।

আর্জান বুঝল, বাঘের 'সাঁই'তে এসে পড়েছে। বাঘের এই আড্ডায় তাদের কে কোন্ দিকে আছে তা অনুমান করা এবার দুঃসাধ্য হবে।

দ্রুত ফিরে আসতে চাইল। চাইলে কি হবে? দ্রুত আসবার উপায় নেই। সামনের দিকে না দেখলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু দুপাশে আর পিছনে কড়া নজর রাখতে হবে।

তিন ঘণ্টায় ফিরে এল সেই লাসের ধারে। বেলা একটা। মাছি ভন্‌ভন্ করছে লাসের আশেপাশে। আর্জান অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বিফল মনে ডিঙির দিকে অগ্রসর হয়। ডিঙিতে

এবার উঠবে। বন্দুকের ঘোড়া নামিয়ে দিল। বন্দুকও এত হাল্‌কা ভাবে ধরেছে যেন পড়ে যায় যায়।

সামনেই ডিঙি। পনেরো গজ দূরে। চম্‌কে উঠে আর্জান ঝট্‌ করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। টান্‌ টান্‌ হয়ে ডিঙির উপর শুয়ে আছে বাঘিনী। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। আর্জানের দিকেই কাৎ হয়ে আছে। চোখ বুজে আছে, স্পষ্ট দেখা যায়। ডিঙির ডালি ছাড়িয়ে হাতের থাবা শূন্যে খানিকটা ঝুলছে। আর্জান বুঝল, কি বিপদ হতে পারে। বন্দুকে ঘোড়া তুলে নিরিখ করতে গেলে, ঘোড়া তোলার শব্দে বাঘিনীর নিদ্রা নিশ্চয় ভেঙে যাবে। তখন হয়ত বন্দুক তুলে নিরিখ করবার অবকাশ দেবে না। তাই ঘোড়া না তুলেই আর্জান বন্দুক নিরিখ করল। বন্দুক তেমনি করে রেখেই আস্তে আস্তে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘোড়া তুলে দিল। 'কট্‌'···নিঝুম বনে এ-শব্দটাও কি ভীষণ! অমনি চোখ মেলেই বাঘিনী ঘাড় উঁচু করেছে। অবসর নেই! মুহূর্তে আর্জান টিপে টান দেয়।

বাঘিনী এক লাফে ডিঙি থেকে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। গর্জন করে ওঠে। আর্জান বন্দুক ধরেই আছে। নলের ধোঁয়া উড়ে গেছে। বাঘিনী হাঁ হাঁ করে হেঁকে ওঠে!

দোনলা বন্দুকের দ্বিতীয় টিপে আর্জান টান দিল। কিন্তু আর্জান হতভম্ভ। চোট্‌ হয় না। মুহূর্তে খেয়াল হল, দ্বিতীয় ঘোড়া তোলা হয়নি! ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘোড়া তুলে নিরিখ করতেই দেখে, বাঘিনী টলছে। পড়ে গেল। কিন্তু গর্জন তার থামেনি। হুঙ্কারে বন কাঁপছে।

আর্জান স্তব্ধ। বন্দুক ধরেই রইল, কিন্তু গুলি করল না। বাঘিনী রাগে গর্‌গর্‌ করছে। উঠবার শক্তি নেই। একটা গাছ কেটে নিয়ে গেছে, সামনেই তার গুঁড়ি এক হাত উঁচু হয়ে ছিল। বাঘিনী রাগে ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে দাঁত দিয়ে সেই গুঁড়ি কামড়ে খান্‌খান্‌ করতে লাগল। মানুষ যে-ভাবে কাঠ চেলা করে, ঠিক তেমনি ভাবে খান্‌খান্‌ করে খণ্ড খণ্ড কাঠ টেনে ফেলতে লাগল।

আর্জান বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। বলা যায় না, বাঘিনী কখন আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। আর্জানের দ্বিতীয় বুলেট মাথা ভেদ করল।……বাঘিনী এবার নিস্তব্ধ!

ষোলো

—কি হলো আর্জান ? কি হলো ?—পিটেল-বোটের অন্য মাঝিরা জিজ্ঞাসা করে।

—হবে আর কি ! নলেন আপিসের বাবু তো বাঘিনী দেখে মহা-খুশী ! তখনই বাবু বাড়িতে নিয়ে কত কি খাওয়ালেন। তোরা তো দেখলিই।

—কিন্তু বকশিস ?

—কি আর বলি ! বাবু বললেন, 'আর্জান তুমি তো এখন সরকারী লোক। সরকারী লোকে সরকারী বন্দুকে সরকারী বন থেকে বাঘ মেরেছে,—এতে বকশিস আশা করে লাভ নেই।'

একজন বলল,—দেখেছিস্ নায়েবি কায়দা !

যে যা-ই বলুক আর্জানের কিন্তু এ সব ব্যাপারে গা-সওয়া হয়ে গেছে। সদর পর্যন্তও একবার সে গিয়ে দেখেছিল—এ ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না।

নলেন আপিস থেকে ফিরে বেদকাশীর এলাকায় আবার তার পিটেল বোটের কাজে মন দিতে হল। মাসের পর মাস কাটতে লাগল। বছরও ঘুরে যায়। ঝাপসী নদীর বাঘিনী মারার পর আর্জানের নামডাক আরও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে যে-ঘেরেই বাঘের উপদ্রব, সেখানেই আর্জানের ডাক পড়ে।

সে-ডাকে আর্জানও পিছ-পা হয় না। পিছ-পা হয় শুধু সংসারের ডাকে। সংসারের তাল যেন সে সামলাতে পারে না। বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়। কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। সমস্যা যেমন তেমনি রেখেই প্রতিবার ফিরে যায় পিটেলের চাকরিতে। ফতিমার হাজার ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করেই আর্জান বারবার চলে যায়।

একবার ফতিমা বলল,—আচ্ছা, তুমি কি বল তো ? আর কতদিন

এমনি ভাবে চলবে! বা'জান যখন ছিল, তখন না হয় যা হয় করতে, কিন্তু এখন কি তাই চলে? এ যে পরের সংসার। আমি পরের সংসারে আর কতদিন পড়ে থাকব!

সংসারের কথা উঠতেই আর্জানের নিজের ভিটের কথা মনে পড়ে। কি ভালই না বাসতো তার পুরনো ভিটেকে। সে-বেদনা চেপে গিয়ে আর্জান বলে,—আচ্ছা, আমাদের গরুটার কি হল? মেঝভাই কি গরুটা ভাড়া দিতে পেরেছে?

—পেরেছে না তো কি! পরের গোয়ালে থাকলে যা হবার তাই হয়েছে—শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—কেন, তুমি দেখতে পার না? গরুর খাওয়াটাও তুমি দেখতে পার না?

—নিজের ঘর নেই, গোয়াল নেই। উনি গরুর জাব্না দেখতে বলছেন!—রাগে, অভিমানে ফতিমা ফেটে পড়ে।

আর্জান কথার মোড় ফেরাবার জন্য হঠাৎ বলে—জানো? ফুফার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

—কোথায়?

—বেদকাশীর হাটে। সেদিন হাটবার, আমিও ছিলাম হাটে।

—কি বলল?

—বলল, তার ছেলের বিয়ে-থা দিয়েছে।

—দেবে আর না কেন? ছেলে আছে, ঘর আছে, বাড়ি আছে। আর তোমার! না আছে জমি, না আছে ঘর, না আছে দোর!—বলেই ফতিমা রাগে ও দুঃখে হঠাৎ থেমে যায়।

আর্জান যে-কথাই বলে ফতিমার কাছে, ঐ এক কথাই এসে পড়ে—ঘর নেই, দোর নেই, ভিটে নেই, মাটি নেই!

রাগে সেদিন সারাদিন ফতিমা আর কোন কথা আর্জানের সঙ্গে বলেনি।

পাঁচ দিনের জন্য আর্জান বাড়িতে এসেছিল। যাবার দিন ফতিমা আর্জানকে অনুনয় সুরে বলল,—একটা ঘর কোথাও বানাও গো! তুমি

যেখানে খুশি যেয়ো, কোনও বাদ সাধব না। আমি থাকব সেখানে। তুমি তো জানো, এবার আমি মা হবো……তোমার ছেলে হবে। তোমার ছেলেও কি পরের দোরে মানুষ হবে!

এমনিতেই আর্জান ভিটের কথায় নরম হয়ে যায়। ফতিমার নরম সুরে ও অনুনয়ে আরও অভিভূত হয়ে পড়ল।

মুখে শুধু বলল,—দেখি!

*　　　*　　　*

বাঙলার এই সুদূর দক্ষিণে জীবন যেন ঢিমে তালে চলে। আর্জানের জীবনকালে বাঙলার মাটিতে কত আন্দোলন হল। সেই ঢেউ যেন এখানে পৌঁছয় না। পৌঁছলেও তাতে কোন উদ্দামতা নেই। থানা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, সদর থেকে এক-শ' মাইল দূরে এই আবাদ অঞ্চল যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। মামলা-মকদ্দমা এরা করতে জানে না—করতে ভয় পায়। খুবই কম করে। তাই সদরের সঙ্গে এদের জীবনের যোগ খুবই কম।

শাসনকর্তা বলতে এরা চেনে—নায়েব গোমস্তা। কোর্ট এদের কাছে জমিদারের কাছারি। রাজা বলতে এরা বোঝে,—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জমিদার, জোতদার।

আর সবই এদের কাছে শোনা কথা মাত্র। স্বাধীনতা, পরাধীনতা, ইংরেজ-শাসন—সবই শোনা কথা। তবে তিন-চার বছর অন্তর যখন কেউ একবার সদরে যায়, তখন দেখে আসে ইংরেজ শাসন। কোর্ট দেখে, ষ্টীমার দেখে, রেলগাড়িও দেখে! তখন ধরে নেয়—এ সবই সাহেবদের কাজ।

আর আবাদের হাটে বাজারে মনোহারী দোকানে গেলে, মিলের কাপড়জামার দোকান দেখলে, এরা ভাবে সাহেবদের জন্যই নিশ্চয় এসব এদেশে এসেছে।

আন্দোলনের ঢেউ এদেশে সামান্যই পৌঁছয়! অসহযোগ আন্দোলন এল। কোন রেখাপাতই তার হলো না এদের উপর। কেবল

যখন সেই আন্দোলনের পর এদের হাটে কিছু দেশী কাপড় আসতে লাগে, তখন বোঝে,—একটা কিছু বা হয়েছে !

আইনভঙ্গ আন্দোলনের কোন চিহ্নই এদের জীবনে পড়ে না। এমনিতেই লবণ এরা নিজেরাই তৈরি করে খায়। লোনা দেশে লবণ তৈরির ব্যাপারে কোন সাড়া জাগে না।

তবে একটা বিষয়ে এদের মনে খুবই আশা আকাঙ্খা জেগে উঠেছিল,—প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আইনের পরিবর্তন হলেও এদের জীবনে কিন্তু কোন বিশেষ পরিবর্তন এল না।

কিন্তু এবার যা ঘটলো, তা যেন ওদের গোটা জীবনে আলোড়ন এনে দিল। জাপানী যুদ্ধ।—কি যেন একটা ওলট-পালট করে দেবে ! আর্জানের জীবনেও সেই ধাক্কা এল। সুন্দরবনেই নাকি জাপানীরা এসে যুদ্ধ করবে। বনের নদী-খালে মিলিটারী লঞ্চ চলতে শুরু করেছে। সাহেব সৈন্যরাও এখানে সেখানে সর্বদাই ঘোরাফেরা করে। এইসব সাহেব সৈন্যরা মাঝে মাঝে এসে আড্ডা গাড়ে বনকর আপিসগুলিতে।

রেদকাশীর আপিসে কাল একদল গোরা সৈন্য আসবে। আপিসের বাবু রসিদ সাহেব তাদের হরিণের মাংস খাওয়াতে চান। সদর আপিস থেকেও কড়া নোট এসেছে,--গোরা সৈন্যদের যেন আদর আপ্যায়ন করা হয়।

রসিদ সাহেব আর্জানকে ডেকে বললেন,--আর্জান ! হরিণ তো একটা মারতেই হয়। অতিথি আসছে। আপ্যায়ন তো করতেই হবে !

আর্জান ধীরে ধীরে বলে,—মুস্কিলের কথা বাবু ! এ সময় কি সহজে হরিণ পাওয়া যায় ? শীতকাল নয় যে হরিণ রোদ পোয়াতে চরে আসবে।

—সে কথা বললে হবে না। হয় আজ সকালে, না হয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে শিকার চাই-ই চাই।

—চেষ্টা করব। কিন্তু কথা দিতে পারি না।

—তা বললে হবে না ! তুমি গাছাল দেবে, না মাঠাল দেবে ?

—এই ভরা বর্ষায় কি ঘুরে ঘুরে হরিণ পাওয়া যায়! কোনও শুকনো মালে উঠে গাছাল শিকার করার ফিকিরে থাকতে হবে।

—তা বেশ, চলো আমিও যাবো।

আর্জান অন্য সময় হলে আপত্তি করত। কিন্তু এখন আপত্তি করে না। ভাবে,—ভালই হল। বাবু সঙ্গে থাকলে, হরিণ না পেলেও তার দোষ কেটে যাবে।

সকালেই আর্জান বনের মালে উঠল। সঙ্গে রসিদ সাহেব। জল ভেঙে এগিয়ে বনের মধ্যেই একটা উঁচু জায়গায় গাছে উঠে বসল। হরিণ এলে ন-টার মধ্যে আসবে, আর তা না হলে বিকেল তিনটের সময়। বারোটা বেজে যায়, কোন হরিণের পাত্তা নেই।

মাঝে একবার জলে ছপাং ছপাং করে কি যেন ঝোপের আড়াল দিয়ে চলে গেল।

রসিদ সাহেব ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, —যাও না আর্জান!

—বাবু, পাগল নাকি! শূলোর মধ্যে পানিতে হেঁটে শিকার ধরা যায়! পানিতে একটু শব্দ হলেই কোথায় চলে যাবে তার দিশে নেই!

রসিদ সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। শিকার বুঝি মেলে না। আর্জান বুঝিয়ে শান্ত করে রাখতে চায়। দুজনে গাছের ডালে খুবই কাছাকাছি বসে। গায়ে গা লাগিয়ে।

তিনটে বেজে গেছে। বাবু অধৈর্য। আর্জান আপ্রাণে বানর ডাকছে। এমন সময় একটা খুব মন্থর ভাবে ছপ্‌ছপ্ শব্দ হয়ে ওঠে। বাবু ভয়ে কেঁপে ওঠেন। আর্জান এক হাতে তাঁকে চেপে ধরে রাখে।

আর্জান বাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলে,—হরিণ! হরিণ!

আর্জানের আশঙ্কা, বাবু বাঘের ভয়ে পড়ে না যান! পড়লে আর শিকার হবে না; তাই কোনও হরিণ দেখতে না পেলেও একটু উঁকি মেরে দেখবার ভাণ করে বলল,—হরিণ! হরিণ!

একটু পরেই সত্যিই একটা হরিণ গাছের ধারেই এল। বাবু

এবার নিশ্চিন্ত, তবে তাড়াতাড়ি গুলি করবার জন্য ব্যস্ত। বন্দুক আর্জানের হাতেই।

আর কথা বলার উপায় নেই। বাবু ধাক্কা দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে চান,—কই! গুলি কর!

আর্জান কিন্তু গুলি করে না। বাবুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে কেবলই থামতে বলে।

হরিণ একদম গাছের নিচে এল, তবুও আর্জান গুলি করে না। কেমন যেন চিন্তান্বিত। গুলি করবার কোনও ভঙ্গি নেই। বাবুর চঞ্চলতা দেখে আর্জান অবশেষে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল,—ওর শিঙ নেই! 'মায়া' হরিণ!

চঞ্চলা হরিণীর চোখে বিশেষ চঞ্চলতা নেই। হরিণের দৃষ্টি উপরে যায় না। তাই সে নিশ্চিন্তে গাছের পাতা খেতে লাগে। কিন্তু আর্জান কি করবে? 'মায়া' হরিণ! সে জেনে শুনে জীবনে কখনও 'মায়া' হরিণ হত্যা করেনি। এ শুধু 'মায়া' হরিণ নয়—গর্ভবতীও! কেমন করে সে একে হত্যা করবে! শিকারী হয়ে শিকারীর সততা কি করে নষ্ট করবে!

কিন্তু বাবু! তার সাহেব সৈন্যের আপ্যায়ন! বাবু উতলা হয়ে ওঠেন। আর্জান বুঝি শেষ পর্যন্ত গুলি করবে না! কিছুতেই তা হবে না! রক্তচক্ষু করে আর্জানের দিকে তাকালেন। কথা বলার উপায় নেই। চোখ দিয়ে যত ভয় দেখানো সম্ভব তা আর্জানকে দেখালেন। এই রাগ শেষ পর্যন্ত কতদূর যেতে পারে, তা ভেবে আর্জান বিচলিত। তার চাকরিও হয়ত থাকবে না।

বাবু হাত বাড়িয়ে নিজেই বন্দুক ধরতে গেলেন।

আর্জান বাবুর হাত আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। এত কাছের শিকার তার চোখ লাগিয়ে নিরিখ করতে হয় না।

আর্জান কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে চোখ বুঁজে গুলি করে দিল, গর্ভিণী হরিণী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল।

আর্জান অস্ফুট ক্ষুব্ধস্বরে যেন একবার শুধু বলল,—'আমি মা হব ! আমি মা হব !'

*　　　　*　　　　*

গোরা সৈন্যরা ঠিকমতই এসেছিল। খানাপিনাও পুরাদমে চলেছিল। আর্জান কিন্তু কোনও অংশগ্রহণ করেনি। আর্জানের ক্ষোভের কারণ জানতেন বলে রসিদ আলি সাহেবও কোন পীড়াপীড়ি করেননি।

কিছুদিন পরে ইংরেজি মাসের সাত তারিখ এল। বনকর আপিসে মাইনে এসে গেছে। আর্জান মাইনে নিয়ে বাবুকে সেলাম দিয়ে বলল,—আমি বাড়ি যাব।

রসিদ সাহেব বললেন,—কেন ? মতলব কি ?

—না বাবু—আর বোধহয় চাকরি করতে পারব না। বাড়িতে বিপদ। গত হাটে খবর পেয়েছি। সংসারে ভয়ানক অসুখ-বিসুখ চলছে।—মিথ্যা কথা বলতে বাধলেও আর্জান মাটির দিকে চেয়ে বলেই ফেলল।

নিরুপায় হয়ে বাবু বললেন,—তা বেশ ! অসুখ-বিসুখ সেরে গেলেই চলে এসো কিন্তু।

—দেখি।—বলেই আর্জান বিদায় নিল।

*　　　　*　　　　*

—চাকরি ছেড়ে এসেছি—বলেই আর্জান বাড়িতে উঠল। ফতিমা সামনেই ছিল। বাড়িতে এসেই তার চিন্তার বোঝা প্রথমেই ফতিমার কাছে ব্যক্ত করতে পেরে আর্জান ভয়ানক খুশি। যেন তার মাথার বোঝা নামিয়ে দিল।

ভাল হল, কি মন্দ হল,—সে-বোধ ফতিমার নেই। আর্জানকে কাছে পেয়েই আহ্লাদে আটখানা। আনন্দে সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আর্জানের কথার কোন উত্তর তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সেই আরক্তিম মুখে মিষ্টি হাসি হেসে আর্জানের দিকে তাকিয়েই রইল।

আর্জান এমন হাসি ফতিমার মুখে কখনও দেখেনি যেন। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় ছুটে এসে ফতিমা দুবাহু প্রসারিত করে আর্জানের বুকে মাথা গুঁজে দিল।

আর্জান ফতিমার বাহু ধরে নাড়া দিয়ে তার মোহ ভেঙ্গে দিয়ে আদর করে বলল,—যাও, ভিতরে যাও। আমি তো এসেই গেছি। আর যাব না।

ফতিমা তাড়াতাড়ি আর্জানের পায়ের ধারে কাঠের বাক্সটা তুলতে যাচ্ছিল। কাঠের বাক্সটা আর্জানই এনেছে। বোটে তার যা কিছু থাকত তা ঐ বাক্সেই ছিল।

আর্জান ব্যস্ত হয়ে বলল,—না, না, তুমি যাও। পারবে না। আমিই নিচ্ছি।

ধীরে ধীরে আর্জান আবার পুরনো হয়ে উঠল কালিকাপুরে। সর্বদাই তার ভাবনা, কোথায় সে তার ঘর বাঁধবে। সবার সঙ্গে আলাপ করল —ধনাই মামু, কফিল, বিশে ঢালি প্রভৃতি সবার সঙ্গেই। কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারে না। নায়েব কালিকাপুরে কোথাও এতটুকু জায়গা রাখেনি আর্জানের ঘর বাঁধবার মত।

কালিকাপুরের উত্তর পুবে ডাক্তারের আবাদ। এই গ্রামও কয়রা নদীর তীরে। তবে এর দক্ষিণ দিকে মাত্র কয়রা নদী। তার ওপারেই সুন্দরবন। নদীর তীরেই এই আবাদের কাছারি বাড়ি। তার পরেই হারেজ সর্দারের বাড়ি। তারই নামে এই পাড়ার নাম— সর্দার-পাড়া। এই সর্দার-পাড়া যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছোট্ট একখণ্ড জমি পড়ে আছে। দুটো ভেড়ির মাঝখানে। লোনা জল ঢুকে ঢুকে এমন হয়েছে যে, এখানে দশ বছরেও কোন ফসল উঠবে না। লোনা জল বেশি উঠত বলেই ডবল ভেড়ি দেওয়া আছে।

হারেজ সর্দার আর্জানকে বলল,—আর্জান, তুমি এসো-না এখানেই। সর্দার মানুষ তুমি, 'সর্দার-পাড়া'তেই থাকবে। রাজি হও তো কাছারির সঙ্গে কথা বলি।

হারেজ ধনী চাষী। জমিদারের পক্ষেই সব সময় আছে। কিন্তু একটা গুণ আছে,—লোকে বিপদে পড়লে সে সাহায্য করতে সর্বদা অগ্রণী।

ভরসা পেয়ে আর্জান বলল,—তা বড়-মেঞা, আপনি যদি ডাকেন তো না এসে কি পারি ?

পুরনো ভিটের স্মৃতি আর্জানের মনকে পীড়িত করে। তাই সে তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। কালিকাপুর সে ছাড়তেই চায় যেন।

কদিনের মধ্যে ঠিকঠাক হয়ে গেল। নায়েব কোনও দলিলপত্র দেবে না। ত্রিশ টাকা দিতে হবে সেলামি। এবং তা আগেই দিতে হবে। এই কবছর চাকরিতে আর্জান প্রায় এক-শ টাকা জমিয়েছিল। তাই সেলামির টাকা সহজেই দিতে পারে। দেখতে দেখতে আর্জান ঘর তুলে ফেলল। আর্জানের পক্ষে ঘরের জন্য বিনা পয়সায় বন থেকে খুঁটি আর গোলপাতা যোগানো বলতে গেলে কিছুই নয়।

বিনা আড়ম্বরেই আর্জান ফতিমাকে নিয়ে সর্দার-পাড়ায় সংসার পাতলো। আর্জানের ভারি ভাল লেগেছে এই জায়গাটা। ওপারেই সুন্দরবন। তারই পাশে চর। অনেক বছর ধরেই এই চর পড়েছে। প্রায় একশতা গজ চওড়া। চরে ফাঁকা ফাঁকা নতুন নতুন ঝাঁকাল কেওড়া গাছ উঠেছে। হাল্‌কা সবুজ রঙ্‌। থাকে থাকে উঁচু হয়ে যেন পুরনো গাঢ় সবুজ বনের সঙ্গে মিশে গেছে।

ওপারে চর পড়ে,—পলি মাটিতে হালকা সবুজ নতুন বন জন্ম নেয়। আর এপারে পুরনো মাটিতে লোনা পড়ে,—স্থাপিত হয় নতুন মানুষের বসতি। আর্জান বন ও মানুষের মধ্যে যেন জীবনের যোগসূত্র খুঁজে পায়।

আর্জানের সংসারে এখন আর দুজন নয়। এখন তিনজন—আর্জান, ফতিমা ও তাদের ছেলে। ছেলের নাম রেখেছিল তুফান সর্দার ; আদর করে সবাই ডাকত 'তুফো'। সে বছর আর্জান শুধু নতুন ঘরই করেনি। নতুন ঘরে নতুন মানুষও এসেছিল। আর্জান ভুলতে পারবে না, সেদিনের কথা,—যেদিন তার গৃহে নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। সর্দার-পাড়ার সব ঘর থেকে মেয়েরা এসেছিল। শীতের সন্ধ্যা ছিল সেদিন ; আর্জানের বাড়ি গম্‌গম্ করছিল। ঘরে, আঙিনায় ও রাস্তায়, কোথাও আর্জান অন্ধকার থাকতে দেয়নি। যতগুলি পারে কুপি যোগাড় করে আলোয় আলোময় করে দিয়েছিল। —আর্জান ভুলবে না কোনদিন।

না ভুলবার আরও কারণ আছে। সে বছর থেকে আর্জান রাত্রে কখনও বাড়ি ছেড়ে বনে থাকত না। তাই বলে সে বনে যাওয়া ত্যাগ করেনি। না গিয়েও তার উপায় নেই। যে কয়েকটি টাকা পুঁজি করেছিল, তা অল্প কদিনেই শেষ হয়ে যায়। আজও পর্যন্ত কেউ জমি ভাগে দেয়নি তাকে চাষ-আবাদ করতে।

তবে বুদ্ধি করে আর্জান একটা কাজ করেছিল। বাঘ সে অনেক মেরেছে। অধিকাংশ সময় বাঘের চামড়া বা মাথার হাড় পায়নি। তবে কেউ কেউ বাঘের চামড়ার সঙ্গে মাথাটা আর নিত না। সেই সুযোগে আর্জান বাঘের মাথার হাড় আর দাঁত জমা করেছিল কিছু। সেগুলিই সে পিটেল বোট থেকে কাঠের বাক্স ভর্তি করে বাড়িতে এনেছিল।

লোনা দেশে মাঝে মাঝে গরুর মড়ক হয়। গরুর তেমন একটা অসুখে এদেশের লোক বাঘের দাঁত বা মাথার হাড় ঘসে কলা পাতায় মোড়ক করে খাইয়ে দেয়। তাতে নাকি অসুখ সেরে যায়।

আর্জানের এই হাড় থেকে তাই কিছু আয় হয়। সে যদি কিছু বেশি দাম চায়, তাও লোকে দেয়। কিন্তু ঐ কখানা হাড়ে আর

কদিন চলবে! কাজেই সংসারে আবার অভাব দেখা দিল। বনকেই বুঝি তার আবার ভরসা করতে হয়!······বনে না গেলে কোত্থেকে সে আয়ই বা করবে? দু-একদিন সে বনে গেছেও ইতিমধ্যে, কিন্তু বাধা ফতিমা।

সে আজকাল রাত্রে বনে যায় না বটে। তুফোই তাকে টেনে রাখে। তুফোকে ফেলে সে রাত্রে কোথাও যেতে চায় না। ভয়ানক ভালবাসে আর্জান তুফোকে। কিন্তু বনের দিকে দিনের বেলায় পা মাড়াতে গেলেও ফতিমা যেন আগলে ধরে আর্জানকে। কিছুতেই সে যেতে দিতে চায় না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সে এখন ভয় দেখিয়ে বলে,—বেশ! রইল তোমার তুফো,···আমি চললাম। তুফোকে তুমিই দেখো!

আর্জান অমনি নরম হয়ে আসে। ফতিমা কিন্তু এতেই ক্ষান্ত হয়নি। মনে মনে তার অনেক মতলব।

কালিকাপুর ছাড়বার সময় দুঃখে ও বেদনায় ফতিমার বুক ফেটে গিয়েছিল। কালিকাপুরের ধুলো-মাটিতে সে মানুষ হয়ে উঠেছিল, কালিকাপুরের ভিটেতে সে সুখের সংসার পেতেছিল। সে মাটি ও ভিটে ছাড়তে তার প্রাণ চায়নি। চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল যেদিন সে কালিকাপুর ছেড়ে আসে। সে ভিটেমাটি অনেকদিনই তাদের হাতছাড়া হয়েছে সত্য, তবু এতদিন সে সেখানেই তারই পাশে ছিল। আজ সেই কালিকাপুর তার চোখের আড়ালে।

কিন্তু কালিকাপুরকে যখন ছাড়তেই হল, তখন সে আর্জানকেও এইবার বন-ছাড়া করবে—এই তার পণ। কালিকাপুরের দুঃখকে সে ভুলতে চায় আর্জানকে জয় করে,—আর্জানকে বন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে। সত্যসত্যই সে অনুভব করতে চায়,—আর্জানকে যে চাকরি ছাড়তে হয়েছে, কালিকাপুরও ছাড়তে হয়েছে, এ যেন তারই জয়। এতে তার জীবনে দুঃখ এসেছে, বেদনা এসেছে, অভাব অনটন এসেছে—তবু এ যেন তার জয়! এইবার সে আর্জানকে বন থেকে ছিন্ন করতে চায়। এ জয়ও সে নিশ্চয়ই করবে!

ডাক্তারের-আবাদে এসে ফতিমা শুধু নিজের ঘর-বাড়ি নিয়ে সংসার পাতেনি। গোটা সর্দার-পাড়া নিয়েই যেন সংসার পেতেছিল। কাউকে 'বু', কাউকে 'ফুফু,' কাউকে 'চাচি' বলে ডেকে গোটা সর্দার পাড়া জুড়ে আত্মীয়তা পাকাপাকি করে ফেলেছে।

একদিন তো ফতিমা হারেজ সর্দারকে বা'জান বলেই ডেকে বসল। কাউকে বাবা ডাকলে তাকে খাওয়াতে হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে কৃষক সমাজে এই রীতি চালু। নানা পিঠে বানিয়ে হারেজকে একদিন ফতিমা ঘটা করে খাওয়াল।

এই সুযোগে ফতিমা হারেজ সর্দারকে অনেক কথা শুনালো···তার সংসারের অনেক জমাট দুঃখের কাহিনী। সবার শেষে ফতিমা বলল, —আপনি দয়া না করলে আমরা বাঁচি কি করে? আপনার কথা তো সবই নায়েব মশাই মানে। একটা কিছু কাজ দেন না জুটিয়ে?

হারেজ সর্দার কথা বলতে ওস্তাদ। বলল—কার জন্য? আর্জানের জন্য! তার কাজের অভাব কি। নাম-করা শিকারী। আর্জান একবার মুখ ফুটে বললেই তো হয়। এত বড় বন পড়ে আছে। বললেই আমি বনের···

—না, না, বন না!—ফতিমা হারেজ সর্দারের মুখের কথা থামিয়ে বেমানান ভাবেই চিৎকার করে বলল।

আর্জান উঠানেই ছিল। ফতিমার প্রতিবাদ কানে আসতে আলোচনায় যোগ দিতে সেও এগিয়ে এল।

হারেজ সর্দার বলে চলে,—বুঝেছি, বুঝেছি। আমিও তো তাই চাই। ডাক্তার-আবাদের এত বড় কাছারি।—কত কাজ আছে!··

আর্জান আসতেই তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল,—কি আর্জান? তুমি কি বল?

আর্জান যেন ভরসা পেয়েই উত্তর দিল,—বনে দাঁড়িয়ে বনবিবিকে কি অমান্য করা চলে! আপনার আশ্রয়ে আছি, যা বলবেন তাই করব।

এরপর হারেজ সর্দার এ-কথা সে-কথা তুলে যাবার সময় ফতিমাকে আশ্বাস দিয়ে গেল,—মনে রাখব তোমার কথা।

আর্জানের মনের যে অবস্থা তাতে সে কাছারিতে যে-কোনও কাজ পেলেই করে। অভাবের তাড়নায় এমন অবস্থায় হাজির হয়েছে যে, তার মনে কোনও বাচ-বিচার নেই। চাষবাসের জন্য জমি পাওয়া তার কাছে স্বপ্ন!......জমি থাকবে, গরু থাকবে, উঠান ভরে যাবে ফসলে, গোলা থাকবে তার উঠানে,—সবই স্বপ্ন। তাই সে-কথা আর মুখেও আনে না। সে চায় শুধু কাজ,—তা সে যে-কোন কাজই হোক।

কিন্তু বন!......বনকে সে কি করে মুছে ফেলবে তার মন থেকে, তার জীবন থেকে। বনে গেলে সে যে ভুলে যায় জীবন-মৃত্যুর কথা, ভুলে যায় তার সংসারের কথা, অভাব অনটনের কথা। ভুলে যায় জীবনসংগ্রামে তার ব্যর্থতা, দুঃখ ও গ্লানি। এই বনকে সে কি করে ভুলবে। নিজে ভুলতে চাইলেও ভুলবার তার উপায় নেই। বন তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকে!

ডাক আসে তার চারদিক থেকে। এই অঞ্চলে বনে যেখানেই বিপদ, সেখান থেকেই ডাক আসে আর্জানের।

*   *   *

—আর্জান! আর্জান!

নদী থেকে ডাক শুনে আর্জান ছুটে আসে ভেড়ির উপর। ষ্টীম-লঞ্চের একখানা বোট। বেনেখালি পিটেল আপিসের লোক তারা।

—কি সমাচার?—আর্জান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—শীগ্‌গির চলো! ফরেষ্ট অফিসারের ডাক পড়েছে।

—কোথাকার ফরেষ্ট অফিসার?—আর্জান ভয়ার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে। তার হঠাৎ মনে হল, হয়তো বা বেদকাশীর বাবু চাকরি ছাড়বার জন্য তাকে পাকড়াও করতে এসেছে!

—আরে! খুলনা সদরের বড়সাহেব—এফ্. ও.।—বোটের পিটেল বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন।

—তা, আসুন! বসতে আজ্ঞা হোক। পান তামাক খান।

—না, না, চলো শীগ্‌গির। তোমাকে পাব কি না ভাবছিলাম!

যদি বাঘ মারতে পার তবে ভাল পুরস্কার পাবে। বড়সাহেব নিজে বলেছেন।

—একটু অপেক্ষা করুন।—বলেই আর্জান বাড়ির ভিতরে ফতিমার কাছে গেল। তার মত আদায় করা দুরূহ, তা জেনেও আর্জান সোজাসুজি কথা পাড়ল। পুরস্কারের কথাটাও বলল। খুলনা সদরের বড়সাহেবের ডাক!—ফতিমা 'না' করতেও পারে না, 'হ্যাঁ' করতেও পারে না। গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আর্জান আর কত দেরি করবে! বলল,—কিছু মনে করো না, না গেলে যে মান-সম্মান থাকে না! কোনও ভয় নেই।

ফতিমার মনে ভয়ের কথাটা যে বড় নয় তা জেনেও, অন্য কোন কথা না পেয়ে শুধু 'ভয় নেই' বলে আর্জান বেরিয়ে পড়ল।

ছোট্ট জালি-বোটটায় যেতে আর্জানের বেশ মজা লাগছিল। সাদা ধবধবে বোট চার-পাঁচজনের বেশি লোক ধরে না। সাঁইসাঁই করে চলেছে। সাহেবী-বোট তাকে মনে করিয়ে দেয়,—সে সত্যিই আজ বড়সাহেবের কাছে চলেছে।

পথে যেতে যেতে সব ঘটনা শুনল। ওরা চলেছে কয়রা নদীর স্রোতে শিবসার একটি শাখা যেখানে মিশেছে। সেখানেই ষ্টীম-লঞ্চ নোঙর ফেলেছে। ২০৯নং লাট। সমস্ত সুন্দরবনটাই লাটের নম্বর দিয়ে ভাগ করা। এবার ১৯৪৫ সালে ২০৯নং লাটে ঘের পড়েছে। এই ঘেরে সুন্দরী গাছ প্রচুর। লোভে পড়ে বহু লোকে এখানে কাঠ কাটতে এসেছে। কয়েক শ' লোক কাঠ কাটছে। দলে দলে লোকেরা কাজ করে। যারা এসেছে তারা অধিকাংশই বিদেশী,—আবাদের লোক নয়।

ভীষণ একটা মানুষ-খেকো বাঘ এসেছে। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষ পেলেই খায়। কিন্তু যে-বাঘ একবার দু-একটা মানুষ শিকার করতে পারে—তার মানুষের প্রতি লোভের সীমা থাকে না। মরিয়া হয়ে সে মানুষ শিকারের সন্ধানে ঘোরে। এই ধরনের বাঘকে আবাদে মানুষ-খেকো বাঘ বলে। ২০৯নং লাটে এপর্যন্ত ছয়টি মানুষ খেয়েছে

বাঘটি। এ-দল থেকে, ও-দল থেকে এক একটা মানুষ মেরেই চলেছে। দল থেকে মানুষ মারা পড়লেও সে-দল একদিন দুদিন পরেই আবার কাজে লাগে। অনেক খরচ, অনেক যোগাড়যন্ত্র করে ওরা এসেছে! কোন দলই সহসা ফিরে চলে যেতে চায় না। দলগুলির সঙ্গে বাওয়ালি আছে। তারা মন্ত্র দিয়ে কারও কাছে রুমাল, কারও কাছে ধুলো পড়ে দেয়। তাই নিয়ে বাকি লোকেরা আবার কাজে নামে। কেউ মারা পড়লে সবাই মনে করে, সে নিশ্চয় রুমাল অপবিত্র করেছিল, ধুলোকে অমান্য করেছিল—বাওয়ালির কোনও দোষ নেই!

এসব সত্ত্বেও যখন বাঘে ছয় ছয়টি মানুষ নিয়েছে, তখন ওরা বিচলিত হয়ে সদরে ফরেষ্ট আপিসে খবর দেয়। তাই বড়সাহেব হাজির। জাত সাহেব,—নিজেরও শিকারের সখ আছে। এসেই বললেন,—কই, কোথায় কি হয়েছে? দেখি আমি নিজেই শিকার করব। বেনেখালি আপিসের বাবু উৎফুল্ল ভাব দেখিয়ে বললেন,—আপনি নিজেই করবেন স্যার? তা হলে তো সবাই সাহস পাবে। কি উপায়ে শিকার করবেন, স্যার?

বড়সাহেব বললেন—কেন? গাছে মাচা বেঁধে। ছাগল সঙ্গে করে নিয়েই এসেছি।

বড়সাহেব সুন্দরবনের খবর নিশ্চয় রাখেন! তাই বিট্ দিয়ে, বা পায়ে হেঁটে শিকারের কথা বাদই দিয়েছেন।

বাবু হাঁকডাক করে লোকজন নিয়ে কিছু দূরে এক খালের ভিতর গিয়ে মাচা বেঁধে ফেললেন। মাচার উপর গদিও উঠল। সন্ধ্যার আগেই নিচে ছাগল বেঁধে বড়সাহেব হ্যাট্-বুট্ পরে কোনমতে তো মাচায় উঠলেন।

বৃথাই কাটল সারা রাত। ধারে কাছেও বাঘ এল না।

রাত্রে সাহেবের সঙ্গে পিটেলের দু-একজন ছিল। এখন কি করা যায়, তা নিয়ে পরদিন সকালে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। একজন পিটেলের মাঝি সাহেবের সামনে বলেই ফেলল,—সাহেব! তোমার কাম না সুন্দরবনে শিকার করা!

কথার মধ্যে একটা ঠাট্টার ভাব ছিল। ভেবেছিল সাহেব বাংলা কথা ভাল বুঝতে পারবে না।

সাহেব কিন্তু কথার ভাব বুঝতে পেরে ঠাট্টা হজম করে নিয়েই বললেন,—তোমাদের এই নোংরা বনে কি শিকার করা যায়! আচ্ছা বেশ, কে পারবে তোমাদের মধ্যে শিকার করতে?

সবাই একবাক্যে বলল—আর্জান, আর্জান সর্দার।

তাই আর্জানের ডাক পড়েছে।

* * *

আর্জানকে দেখেই সাহেব বললেন,—কে?······তুমি? পারবে এই বাঘ শিকার করতে?

—পারি না পারি সে আপনাদের দয়া। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—বেশ, তাহলে যাও। ঐ দেখো, রাইফেল, একনলা, দোনলা, সবই আছে। বেছে যেটা খুশি নিতে পার।

আর্জান সবগুলিই নাড়াচাড়া করে একটা একনলা বন্দুক আর চারটি বুলেট নিল। একনলা বন্দুকটি তার ভারি পছন্দ হয়েছে। তাছাড়া এদেশের লোকের ধারণা, একনলা বন্দুকেই ভাল নিরিখ হয়।

ছোট্ট একটি মানুষ। খালি গা। পরনে একখানা লুঙি। লুঙিখানা টেনে মালকোছা দিয়ে গুটিয়ে নিল। কাঁধের উপর গামছা, তার কোণে দুটি বুলেট বেঁধে গলার সঙ্গে একটা প্যাঁচ দিয়ে ঝুলিয়ে রাখল। বাকি দুটি টোটা কোমরে গুঁজে নিল। বন্দুকটা কাঁধের উপর। দোহারা চেহারা। ফর্সা রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বাইরে থেকে দেখে মনেই হবে না, এই লোকটির এতখানি দুর্জয় সাহস।

কপালটি চওড়া। পাতলা চুল। ছোটখাট সাধারণ মানুষ আর্জান। কিন্তু থাকবার মধ্যে আছে বেশ বড় একজোড়া গোঁফ··· আধপাকা গোঁফ। আর আছে খুব শান্ত ধরনের দুটি বড় চোখ। সর্বদা বনে সতর্ক চাহনি দিতে দিতে চোখদুটি লালচে হয়ে গেছে।

লক্ষ্য করলে এই চোখের একটি বৈশিষ্ট্য ধরা না দিয়ে যায় না—পলক খুবই কম পড়ে। তিন-চার মিনিটের আগে পলক পড়তেই চায় না।

আর্জান সঙ্গে কাউকে নেয়নি। একাই চলল দুর্গম গহন-অরণ্যে মানুষ-খেকোর সন্ধানে। ২০৯নং লাট ওর চেনা আছে। চেনা থাকলে কি হবে? কোন দিকে গেলে বাঘের দেখা পাবে তার কোনও ঠিক নেই। তিন দিন আগে যেখান থেকে শেষ মানুষটি নিয়েছে, সেখানে বা তার ধারে কাছে আজও মানুষ-খেকোর থাকবার কোনও কারণ নেই। গত তিন দিন কোন দলই বনে ওঠেনি।

ঘণ্টার হিসাবে ঠিক কত আগে হেঁটে গেছে, বনের চাতালে থাবার দাগ দেখে তা অনুমান করা কঠিন। তাই খালের পাড় দিয়ে লক্ষ্য করে করে যাওয়াই ঠিক করল। কোন চিহ্ন পেলেই ধরতে পারবে, কোন জোয়ার বা ভাটার সময় মানুষ-খেকো খাল পার হয়েছে এবং কত ঘণ্টা আগে।

ছোট্ট মানুষটি হেঁটে চলছে সরু খালের পাড় ধরে। পা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত 'প্রেম কাদা'য় বসে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে আর্জান বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

যতই সাবধানে আর্জান চলুক, কাদায় পা তুলবার সময় 'ভক্' করে একটু শব্দ হচ্ছে। তা হোক একটু-আধটু শব্দ। একবার খোঁচ পেলে তখন সে সতর্কে চলবে। খাল এঁকে বেঁকে বনের গহনে প্রবেশ করেছে। আর্জানও গভীর অরণ্যে এখন।

এবার খালটা একটা বড় বাঁক নিয়েছে। দুর্গন্ধের ঝলক আর্জানের নাকে আসে। বাঁকের মোড়ে একটা বড় ধরনের গাছ। বাদুড় ভর্তি। এত বাদুড় যে, গাছের পাতা সব যেন ঢেকে গেছে। কিচিরমিচির শব্দ। বনের মধ্যে এত গাছ থাকতে এই গাছটাই কেন বাদুড়ের দল বেছে নিল, তা বোঝা দুঃসাধ্য। বনের মধ্যে অতগুলি জীবন্ত সঙ্গী পেয়ে আর্জানের ভালই লাগে।

গাছটা পাশ কাটিয়ে আবার সরু খাল ধরে আর্জান চলে। মানুষ-খেকোর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কোন বানর বা হরিণেরও

সাড়া নেই। বানর সাধারণতঃ নদীর ধারেই থাকে। কিন্তু হরিণ? নদীর চরে, বনের ভিতরে, সর্বত্রই হরিণের পদচিহ্ন। সুন্দরবনে যে-কোনও অঞ্চলেই হরিণের পদচিহ্ন অজস্র। এখানেও আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আর্জান একটি হরিণেরও সাড়া পায়নি। তবে, তাহলে……

হঠাৎ আর্জান দাঁড়িয়ে গেছে। পা যেমন হাঁটু পর্যন্ত কাদায় দেবে ছিল, তেমনই আছে। মাত্র ত্রিশ হাত দূরে ঘুমিয়ে আছে মানুষ-খেকো।

আর্জানের দিকে নয়, আর্জানের উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। একটা গাছ কারা যেন কেটেছিল মাটি থেকে দু-হাত গুঁড়ি বাদ রেখে। গাছটা তারা নেয়নি। সেইখানেই পড়ে আছে। তারই উপর মাথা রেখে বালিশ করে মানুষ-খেকো শুয়ে আছে। দু হাত উঁচু গুঁড়িটায় মানুষ-খেকোর মাথা আড়াল পড়েছে। মাথা দেখতে না পেলেও পিঠটা দেখে আর্জান বুঝল, অতিকায় বাঘ এবং বেশ পুরনো বাঘ। পিঠটায় কালসিটে পড়ে গেছে।

আর্জান নিস্তব্ধ। কিন্তু তাকে মুহূর্তমধ্যে ঠিক করতে হবে, কি কর্তব্য। গুলি করবে? কোথায় গুলি করবে? মাথায় আড়াল পড়েছে। দেহে এক গুলিতে ওর কিছুই হবে না। পাশে সরে গিয়ে মাথা নিরিখ করবে? ঘুম ভাঙেনি। কেন ভাঙেনি সেটাই আশ্চর্য! পাশে সরতে গেলে শব্দ হবেই। জেগে পড়লে এই বাঘকে রোখা দায় হবে! গুলি না করে ধীরে ধীরে পালিয়ে যাবে? তাতেও কাদায় নিশ্চিত শব্দ হবে। মানুষ-খেকো যদি জেগে দেখে আর্জান পালাচ্ছে, —তাহলে রক্ষা নেই! আর যারই হোক, পলাতকের বাঘের হাতে নিস্তার নেই!

এ সবই আর্জানের জানা কথা। কয়েক সেকেণ্ড লেগেছে ভাবতে। ততক্ষণে সে গাঁট থেকে গুলি বের করে বন্দুকে পুরেছে। বন্দুক নিরিখের স্থানে এনে ঘোড়া তুলে দিল। ঘোড়া তোলার শব্দে মানুষ-খেকো চোখ মেলেছিল কিনা আর্জান দেখতে পায়নি। তবে সে মাথা উঁচু করেনি।

যতদূর সম্ভব মাথার দিক ঘেঁষে আর্জান গুলি করে দিল। কাৎ হয়ে শুয়েছিল। পুবদিকে মাথা। এক ঝাঁকানিতে পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে লাঠির মত সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। পর মুহূর্তে আচমকা ঘুম থেকে ওঠার মত চার পায়ে দাঁড়িয়েই গর্‌গর্‌ করতে করতে দক্ষিণমুখে চলল। আর্জান উত্তর দিকে চরের কাদায় দাঁড়িয়েই আছে।

গুলি-খেকো বাঘের পেছনে তখন-তখনই অনুসরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুন্দরবনে শিকারীদের আহত বাঘের পেছনে তখন তখনই যাওয়ার রীতি নেই, নিষেধও আছে।

বাঘ অনেকক্ষণ চলে গেছে। আর্জান কয়েক কদম সরে বনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। ফিরে আসাই ঠিক করল।

* * *

—কি খবর আর্জান? দূর থেকে যেন গুলির ক্ষীণ আওয়াজ পেলাম?—আর্জান ফিরে এলে সবাই এক সাথে প্রশ্ন করে।

—চলো, বলছি।—বলেই আর্জান সোজা সাহেবের কাছে গিয়ে বলল,—সাহেব, হলো না! কাছে পেয়েও হলো না! তবে আমি ছাড়ব না। বাঘ গেছে দক্ষিণে। নিশ্চিত ২০৬ নং লাটে যাবে। কাল সেখানে লোকজন ও নৌকা নিয়ে যেতে চাই।

সাহেব বললেন,—সে হবে। আগে শুনি কি হলো?

সব শুনে সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন,—ভুল করেছ দ্বিতীয়-গুলি না করে। এমন মূর্খ তুমি!

আর্জান দৃঢ় উত্তর দেয়,—না, সাহেব! অতো মুখ্যু নই। উঠেই দক্ষিণমুখি চলতে থাকে। গুলি করলে, করতে হতো ওর পেছনে। তাতে ওর কিছুই হতো না। সুন্দরবনের বাঘকে তুমি চেন না সাহেব! দ্বিতীয়বার গুলি করলে লাভের লাভ হতো, আমি কোথায় দাঁড়িয়ে তা মানুষ-খেকো জেনে ফেলতো!!

* * *

পরদিন। আর্জান দল বেঁধে চলেছে ২০৬ নং লাটে। এখান

থেকে বারো মাইল দক্ষিণে। এই শিকারে সাহেবের অনুমতি ছিল বলে অনেকেই আর্জানের সাথে নৌকায় যেতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আর্জানের ছয়জন সঙ্গী হল। বেশ বড় একখানা নৌকায় খাবার-দাবার নিয়ে ওরা ২০৬ নং লাটে এসে হাজির।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিল, তার নাম ছিদেম। বয়স বছর কুড়ি। বলিষ্ঠ যুবক। ভয়ানক শিকারের নেশা। তার একান্ত ইচ্ছা, আর্জানের সঙ্গে সে বাঘ শিকার দেখবে। আর্জান দূর-সম্পর্কে তার মামু। ছিদেম বেনেখালি পিটেল বোটে কাজ করে।

আন্দাজ মত স্থানে আর্জান নৌকা লাগিয়ে সকাল সকাল বনে উঠল। আর্জান সাধারণতঃ কাউকে শিকারে সঙ্গে নেয় না। ছিদেম তা ভাল ভাবেই জানত। জানত বলেই সে বলল,—দেখ মামু, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না নাও, তাহলে তুমি বনে উঠে চলে গেলে তোমার পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে আমিও ঠিক পেছনে পেছনে যাব।

ছিদেম ছিল আর্জানের ভারি অনুগত। আর্জানও খুব ভালবাসত তাকে। শিকারী হবার অনেক গুণই ছিল তার।

ছিদেমের কথায় আর্জান বলে, --না, না, তোর তা করতে হবে না। চল্ তুই আমার সঙ্গে।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আর্জান আর ছিদেম সমস্ত বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ-খেকোকে খুঁজল। কোনই সন্ধান না পেয়ে খানিকটা মন-মরা হয়ে নৌকায় ফিরে এল।

নৌকা যেখানে নোঙর করা আছে তার থেকে আধ-মাইল দূরে একটা মস্ত বড় বালুর চর। চরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে খড়ের বন। নৌকার সবারই কেমন যেন সন্দেহ জাগে, এই খড়বনে বাঘ থাকলেও থাকতে পারে। রাত্রে সবাই পরামর্শের পর ঠিক করল, কাল খড়বনেই চেষ্টা করতে হবে।

ঘন খড়বন। মানুষের মাথার থেকেও লম্বা হয়ে উঠেছে। সকালে আর্জান একাই বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গেল। প্রবেশের রাস্তা নেই। জোর করে প্রবেশ করতে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে।

খুঁজতে খুঁজতে একটা জীবজন্তুর পায়ে হাঁটা পথ পেল। কিন্তু শুকনো খড়ের উপর কোন জন্তুর পায়ের চিহ্ন নেই। কিছুদূর এগিয়ে আর্জান আর অগ্রসর না হওয়াই ঠিক করল। এমন ঘন খড়ের বন, যে-কোনও সময় দু-হাতের মধ্যে বাঘের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তখন গুলি করলেও হাতাহাতির প্রশ্ন অনিবার্য।

আর্জান ফিরে এসে এবার সবাইকে নিয়ে চলল। তার বিশ্বাস, ধারে-কাছে কোথাও নিশ্চয় মানুষ-খেকো আছে। বেপরোয়া ভাবেই বন আর খড়বনের মুখে আর্জান বন্দুক হাতে হাঁটু গেড়ে যেন খুঁটি নেয়। নিয়েই অন্য সবাইকে ইঙ্গিত করে খড়বনে আগুন ধরিয়ে দিতে। দাউদাউ করে খড়বন পুড়ে গেল। দু-একটা বুনো শুয়োর আর খরগোস ছাড়া কিছুই বেরোয় না।

সেদিন ফিরে এসে আর কেউ বনে উঠবার নাম করে না। ভাবে, আর চেষ্টা করে লাভ নেই। তবু আর্জানের ইচ্ছা, কাল একবার শেষ দেখা দেখে যাবে। স্বস্তি পায় না মনে—মানুষ-খেকো যাবে কোথায়?

তৃতীয় দিন। আর্জান বনে ঘুরছেই তো ঘুরছে। সঙ্গে ছিদেম আছে। খাবার চিহ্ন যে পায়নি তা নয়। পেলেও সে-সব যে অনেক দিন আগের, তা বুঝতে আর্জানের দেরি হয় না। কাজেই তা অনুসরণ করে লাভ নেই।

আর দেরি করলে নৌকায় যেতে যেতে অন্ধকার নেমে আসবে। তাছাড়া এ-কদিনে আর্জান ক্লান্তও হয়ে পড়েছে।

হতাশ হয়েই দুজনে ফিরে আসছে। বনে উঠলে কথা বলা নিষেধ। নিতান্ত আবশ্যক মত দু-একটা কথা ফিস্‌ফিস্ করে অবশ্য ওরা বলছে। নৌকার দিকে যতই এগোয় ছিদেম ততই যেন গা ছেড়ে দেয়, অসতর্ক হয়ে ওঠে। আর্জান তা দেখেই ধমক দিল,—দেখে চল্!

বনের ফাঁকে নৌকার কাছাকাছি নদীর প্রতিফলিত আলো দেখা যায়। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে ছিদেম উত্তর দেয়,—আর তো এসেই পড়েছি!

আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখতে দেখতে ওরা নৌকার ধারেই প্রায় এসে পড়েছে।

হঠাৎ ছিদেম বসে পড়ে। পাঁচ-ছয় হাত পেছনে আর্জান। ছিদেম বসতেই আর্জান তার দিকে তাকাল। ছিদেম গাছের আড়ালে বসে মামুকে দেখিয়ে দেয়।

গুটি মেরে চার পায়ে বসে গলা বাড়িয়ে নৌকা দেখছে…… বন্দুকের আওতার মধ্যে আবার মানুষ-খেকো!

আর্জান মুহূর্ত দেরি করে না। ঘোড়া তোলার শব্দে মানুষ-খেকো ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। দক্ষ শিকারী এমন সুযোগ কখনও হারায় না। তপ্ত লোহার আঘাতে মানুষ-খেকো যেখানে বসে ছিল সেখানেই পড়ে গেল। গোঙাবার সুযোগও তার হয়নি। পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে। বিকেলের ঢলে পড়া সূর্যের আলোর রেখা গাছের ফাঁক দিয়ে তার গায়েও পড়েছে এক-আধটু।

দশ মিনিট পরে আর্জান কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে বলল,—চল্ ছিদেম! সাবাড় হয়েছে।

ছিদেম ভয়ে ভয়ে বলল,—না, মামু, আরেকটা গুলি কর।

—এক গুলিতেই শেষ করেছি।—গর্বের সুরে বলেই আর্জান কিছুটা এগিয়ে গেল। এক-তাল মাটি নিয়ে ছুঁড়ে মারল বাঘের গায়ে।

আর্জান উৎসাহের সঙ্গে বলল,—দেখ্‌লি তো—মরা, না জ্যান্ত?

হাঁ করে পড়ে আছে অতিকায় বাঘ। কানের কাছ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বিজয় উল্লাসে ছিদেম লেজটা ধরে একবার টানাটানি করল। আর্জানও সোৎসাহে বলল—দেখিছিস্ ছিদেম, ডান হাতের ধারে এই দাগটা! সেইদিন যে গুলি করেছিলাম, তারই দাগ।

দুজনেই তাড়াতাড়ি নৌকায় এল। সকলেই এবার মেতে ওঠে জয়ের উল্লাসে। বাঁশ, দড়ি ও কাছি নিয়ে সবাই নেমে পড়ল। মানুষ-খেকোকে ওরা এবার বাঁধাবাঁধি করে নৌকায় নিয়ে আসবে।

আর্জান বাধা দিয়ে বলল,—দেখো! আজ রাত্রে না-ই বা আনলে।

নৌকায় আনলে আজ আর ঘুমোতে হবে না। এমন গন্ধ ছাড়বে যে কেউ টিকতে পারবে না।

তবু দড়ি কাছি হাতে করেই সবাই বাঘ দেখতে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্জানের কথায় বাঘকে বনেই রেখে সে-রাত্রের মত সবাই নৌকাতে এল।

নিশ্চিত দুশো টাকা পুরস্কার মিলবে। বড়সাহেব নিশ্চয় এখনো আছে। কালই পুরস্কার আদায় করবে। আনন্দ আর ধরে না! নৌকায় যে-কয়টি মুরগি ছিল সবই জবাই করা হল। মনের আনন্দে চলল খাওয়া-দাওয়া।

পরদিন, বেশ ভোরে সবাই উঠেছে। বাঁশ, দড়ি ও কাছি নিয়ে সবাই একসঙ্গে মানুষ-খেকোকে আনতে চলল।

এসে দেখে—কি আশ্চর্য! বাঘ নেই। সবাই হতভম্ব। আর্জানের মুখে কথা নেই। সেও হক্‌চকিয়ে গেছে। এমন যে হতে পারে, তার কল্পনার বাইরে।

ছিদেম ব্যঙ্গ করে বললে,—বলিনি তখন মামু, আরেকটা গুলি করতে? কি? এবার দেখো আমার কথা ঠিক কি না?

আর্জান শান্তভাবেই বলল,—তোর কথাই ঠিক। কিন্তু আমি তো জীবনে এমন ঘটনা কখনও শুনিনি। মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে গেছে, তারপর আবার বেঁচে উঠল!

—তাহলে বলো, মানুষ-খেকো কাল মরেনি।

—তাই বা বলি কি করে? কাল তো তুই লেজ ধরে টানাটানিও করলি! দেহে গুলি করলে ওরা বেঁচে ওঠে—ওতে যেন ওদের কিছুই হয় না। সে খবর আমি জানি। কেন? কাল তুই তো দেখলি—সেদিন মানুষ-খেকোর হাতের পাশে যে গুলিটা করেছিলাম। যেন ওর কিছুই হয়নি। রক্তের দাগও খুঁজে বের করা দায় ছিল। কিভাবে বাঁচে জানিস্? বাঘের চামড়া তুলতুলে নরম। ধরে একটু টানলেই উঁচু হয়ে আসবে আধ হাত। গুলি খাওয়ার পর একটু নড়াচড়া করলেই চামড়ার ছেঁদাটা সরে যায়। মাংসের ছেঁদার মুখ তখন

পাশের চামড়া আটকে দেয়। রক্তপড়াও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভাবছি, মাথায় গুলি খেয়ে মানুষ-খেকো বাঁচল কি করে? এমন আশ্চর্য কাহিনী কখনও শুনিনি!

আর্জানের মনে যখন এইসব চিন্তা তোলপাড় করছে, তখন আর সবাই কিন্তু শুধু আপশোষ করেই মরছে। কেন কাল রাত্রেই নৌকায় নিয়ে আসা হল না। হলই বা দুর্গন্ধ! নৌকায় না আনলেও কেন ওর চার হাত পা বেঁধে মালে ফেলে রাখা হল না! কেনই বা টেনে নৌকার ধারে নিয়ে রাখা হল না! তাহলেও তো জ্যান্ত হয়ে উঠলে কেউ না কেউ ঠাহর পেত।—আপশোষের যেন অন্ত নেই!

না পাওয়া গেলে বিশেষ দুঃখ ছিল না, কিন্তু এ যে পেয়েও পেল না! এই দুঃখে ওদের গা জ্বলে যায়। সারা দিনটা কেটে গেল নৌকায়। আর্জান বিশেষ কথা বলে না। সে যেন কিসের একটা অশুভ সঙ্কেত মনে করছে। তা না হলে কোনও কারণ খুঁজে পাবে না কেন? সারাদিন ধরে কিছুই ঠিক করতে পারে না। নৌকাতেই বসে বসে কেটে গেল। মোটামুটি স্থির হল, কাল যা হয় করা যাবে।

পাঁচ দিনের দিন। সবাই ভোরে উঠেছে। আর্জান এটা-ওটা কাজ করে কিন্তু কথা বিশেষ বলে না।

—কি হল গো মামু? শিকারে যাবে না নাকি? কোনই তোড়জোড়ের ফিকির নেই যে?—ছিদেম আর্জানের ভাবগতিক দেখে প্রশ্ন করল।

আর্জান যেন ছিদেমের কথা শুনতেই পায় নি। চুপ করে বসেই আছে। ছিদেম কাছে এসে আবার প্রশ্ন করল,—কি গো মামু, তোমার মতলবখানা কি বলো তো?

—না, যাব না।

আর্জানের কথা শুনে সবাই ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল। যেন একসঙ্গেই প্রশ্ন করল,—কেন? কি হয়েছে?

আর্জান এক কথায় জবাব দিল—না, যাব না।

সবাই অবাক হয়ে যায়। আর্জানের গোঁ দেখে সবাই এবার ব্যঙ্গের সুরে নিজেরাই বলাবলি করে:

—ও বুঝেছি ! বড় শিকারী এবার ভয় পেয়ে গেছে !

—আরে না ! শিকারীর মায়া জেগেছে। মরা বাঘ জ্যান্ত হয়েছে কি না, তাই মায়া হচ্ছে !

—আরে তাও নয় ! আসলে বন্দুকটাই খারাপ। তাই ওর গুলিতে বাঘ মরল না।

ঠাট্টায় আর্জান বিরক্ত হয়ে বলেই বসল,—না. আমি যাব না। রাত্রে আমি 'খোয়াব' দেখেছি। বাঘটা ছিল বনবিবির বাহন। বনবিবি আমাকে বারণ করে বললেন,—'আমার এই বাহনকে মারবার চেষ্টা কোরো না।' বনবিবি নিজে এসে মানা করলেন।

স্বপ্নের কথা শুনে প্রথমে সকলে হক্‌চকিয়ে গেল। ছিদেম একটু চুপ করে থেকে বলল.—না মামু, এ তোমার বানানো কথা ! বনবিবির বাঘ এটা হবে কেন ? বনবিবির বাঘ কি মানুষ খেয়ে বেড়ায় ! বনবিবির বাঘ কি মানুষে দেখতে পায় !

ছিদেমের কথায় সবাই সাহস পেয়ে আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করল।

বিদ্রূপে বিরক্ত হয়ে আর্জান শেষপর্যন্ত বলল,—আচ্ছা, যাব কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার সঙ্গে কেউ যাবে না। আমি একাই যাব।

ছিদেম শর্ত শুনেই বলল,—না. মামু, তা হবে না। আমি যাব। তুমি আর কাউকে নিয়ো না। কিন্তু আমি যাবই যাব।

ছিদেম নাছোড়বান্দা। শেষপর্যন্ত তাকে সঙ্গে নিতেই হল।

* * *

আর্জান ও ছিদেম আবার মানুষ-খেকোর সন্ধানে চলল। এবার তাদের কাজ অনেকটা সহজ। কাল যেখানে গুলি খেয়ে নিস্তব্ধ হয়, সেখান থেকেই থাবার খোঁচ দেখে দেখে এগিয়ে চলল।

চলেছে তো চলেছেই। কত মাইল যে এগিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। মানুষ-খেকো এঁকে বেঁকে এ-বন থেকে সে-বন, এ-ঝোপ থেকে সে-ঝোপ করে এগিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও শুয়ে

গড়াগড়ি দিয়েছে,—তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। একবার একটা ভিটের দিকে গেছে। আর্জান অমনি শিকারের সতর্কতা নিয়ে চুপিসারে এগিয়ে গেল, কিন্তু সেখানে দেখে মানুষ-খেকো নেই। সেখানে এমন লুটোপুটি খেয়েছে যে সারা ভিটেময় লোম ছড়িয়ে আছে। দুজনে আবার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলে।

সামনে একটি খাল। বেশ বড় খাল। পঞ্চাশ হাত চওড়া হবে।

জল পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন দেখে ছিদেম চুপিচুপি বলে,—দেখেছ মামু? এখানে পানি খেতে নেমেছিল।

—দূর বোকা! ঐ ছাখ্, ওপারেও খোঁচের মত দেখাচ্ছে। সোজা পার হয়ে গেছে। চল্, পার হতে হবে।

দুজনেই কাপড় খুলে মাথায় কাপড় আর গামছা বাঁধল। ছিদেম মাথা বাঁচিয়ে আর আর্জান মাথা ও হাতের বন্দুক উঁচু করে সাঁতারে পার হল।

এপারে উঠে কাপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। খালটি ছেড়ে এক মাইলেরও বেশি এগিয়ে গেছে। সুন্দরবন সাধারণতঃ যেমন পরিষ্কার থাকে, এখানে ঠিক ততটা পরিষ্কার নয়। ছোট গাছ-গাছড়া যেন একটু বেশি।

চলতে চলতে আর্জান খোঁচের দিকে হঠাৎ একবার তীক্ষ্ণ নজর দেয়, তারপর দুপাশে গাছ-গাছড়ার দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে ওঠে। কোথায় গেল চুপিচুপি ইসারায় ইঙ্গিতে কথা, কোথায় গেল শিকারীর সতর্কতা! আর্জান চিৎকার করে উঠল,—সাবধান ছিদেম! বাঘ চক্র দিয়েছে! সাবধান!!

মানুষ-খেকো শিকারী-বাঘের এ এক অভিনব চাতুরি। সব বাঘই ভালো শিকারী হয় না। অনেক অভিজ্ঞতার পর মানুষ-খেকোরা এই বিদ্যা আয়ত্ত করে। যখন বোঝে কোনও শিকারী তার পেছনে লেগেছে, তখন সে আশপাশে লুকিয়ে ওৎ পাততে যায় না। তা করলে ঝানু শিকারী খুব সতর্কতার সঙ্গে খোঁচ অনুসরণ করে

বাঘকে সামনা-সামনি আক্রমণ করবেই। তাই মানুষ-খেকো আধমাইল-ব্যাপী গোলাকারে ঘুরতে থাকে।

গভীর অরণ্যে এক মহাবিপদ আছে। সহসা দিক-হারা হয়ে পড়তে হয়। সাধারণ শিকারী বুঝতেই পারে না,—সে সোজা হেঁটে চলেছে, না গোলাকারে হেঁটে চলেছে, বিশেষ করে সে-গোলাকার যদি দীর্ঘ জায়গা জুড়ে হয়। সুন্দরবনে চারিদিকে প্রায় একই গাছ, একই দৃশ্য। আর সূর্য যদি একটু মাথার উপরে ওঠে, তাহলে তো দিক্‌ভুল হবেই হবে।

মানুষ-খেকো তারই সুযোগ নেয়। শিকারী পিছু নিলে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে গোলাকারে দ্রুত চলতে থাকে। এক চক্রপূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষিতে সে শিকারীর ঠিক পেছনে এসে পড়ে। শিকারী ভাবে বাঘ তার সামনে ; বাঘ ততক্ষণে তার পেছন থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আর্জান অভিজ্ঞ শিকারী। কিন্তু সে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। যে মুহূর্তে বুঝল, সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠল,—সাবধান! ছিদেম, বাঘ চক্র দিয়েছে! সাবধান!!

আর্জান কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। মানুষ-খেকোর বজ্রহুঙ্কারে মিলিয়ে গেল আর্জানের সাবধান-বাণী। আর্জান সামনে, তিন-চার হাত পেছনেই ছিদেম। মানুষ-খেকো ছিদেমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে এক কামড় দিয়ে এক চাপে মট্ করে ঘাড় ভেঙে উধাও হল। মাত্র দুই সেকেণ্ড সময়। যেন উড়ে এসে উড়েই চলে গেল!. আর্জান বন্দুক ঘুরিয়ে ধরবারও অবকাশ পেল না।

আর্জান লাফিয়ে পড়ে ছিদেমকে টেনে তুলল। রক্তস্রোতে ভেসে গেছে। বুকে হাত দিয়ে বুঝল, ছিদেম জীবিত নেই। মৃত দেহ মাটিতে রেখে আর্জান দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষ-খেকোর কি আর কোনও মতলব আছে? আর্জান চঞ্চল হয়ে ওঠে। না, তার কোন চিহ্ন নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে চারদিকে। এই ছিল কপালে? খোয়াব? স্বপ্ন? সে তো নিষেধই করেছিল! সে নিজেও

আসতে চায়নি। ছিদেমকে তো সঙ্গে আনতেই চায়নি। কেন সে এল? কেন তুই এলি? মরতে এসেছিলি? বললাম বনবিবির কথা। বেশ, বনবিবির কথা না হয় না শুনলি, আমার কথা শুনলি না কেন? না, মানুষ-খেকো আর আসবে না। ও খাওয়ার লোভে আসেনি; তাহলে তো ছিদেমকে নিয়েই যেত। আর আসবে না। প্রতিশোধ নিতে এসেছিল! একটুও অবসর দিল না। বন্দুক তুলবারও সময় হল না!

—হল না! চল্ এবার! চল্!—জোরেই বলল, আর্জান বেশ চিৎকার করেই বলল। বুকভরা বেদনার দীর্ঘ নিশ্বাস চিৎকার করেই নিঃশেষ করল। তারপর, ছিদেমের রক্তাক্ত মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিল। নিজেদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে নৌকায় ফিরে এল। বন থেকেও ফিরে এল সেবারের মত।

আঠারো

ছদিন পর আর্জান বাড়িতে ফিরে আসে। ফতিমা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে দিন গুনছিল। আর্জান আসতেই তুফোর আনন্দ আর ধরে না! মায়ের কোল থেকে প্রায় জোর করে নেমে আর্জানের কাছে ছুটে গেল।

আর্জান তুফোকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। বনের খবর, পুরস্কারের কথা কিছুই বলে না। ফতিমা আর অপেক্ষা করতে না। পেরে নিজেই কথা পাড়ল, —কই! খবর তো কিছুই বললে না? কত টাকা পেলে, দেখি?

আর্জান হাসতে হাসতে বলল, —নাঃ, কিছুই হয়নি।

—তা বললে হবে কেন? ছদিন বনে কাটিয়ে এসেছ। তোমার সব মিথ্যে কথা। সাহেব-টায়েব কেউ আসেনি তাহলে!

ফতিমার মনে বিশ্বাস আনবার জন্য আর্জান সব ঘটনা বিশদ ভাবেই বলল। শুধু বলল না ছিদেমের ঘটনাটি। আগে থাকতেই ঠিক করে এসেছিল ছিদেমের কথা ফতিমাকে কিছুতেই বলবে না। এই ঘটনা শুনলে ফতিমা কি করবে তার ঠিক নেই। কিন্তু বিপদ এলো অন্য পথে।

কাহিনী শুনে ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে বলল,—বলিনি আমি? আমার কথা বনবিবি নিয়েছেন। তাই 'খোয়াবে' কথা বলেছেন। খবরদার! তুমি আর বাঘের পেছনে যাবে না।

আর্জান অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ব্যস্ত ভাবে বলল, —না, না গো না—সব বাঘ না! সব বাঘই কি বনবিবির বাহন হয়?

—হয় না তো কি! সব বাঘই বনবিবির বাহন!

ফতিমা কথাগুলি এত জোর দিয়ে বলল যে আর্জান দ্বিতীয়বার প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। ফতিমা কিন্তু এখানেই শেষ

করেনি। এর পর যখনই বনের কথা উঠেছে, তখনই বনবিবির স্বপ্নের কথা তুলে আর্জানকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে।

কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় ফতিমা হাসিখুশি মন নিয়ে আর্জানকে বলল, —কাল সকালে তুমি একবার কাছারি-বাড়ি যেয়ো,···বড়মেঞা যেতে বলেছেন।

কাছারির ডাক শুনতেই আর্জানের মনে আশঙ্কা জাগে। ডাক্তার-আবাদের ভিটাও বুঝি তার হাতছাড়া হয়,—এই তার ভাবনা।

ফতিমা আশ্বাস দিয়ে বলল,—না গো না, তোমার কোনও ভয় নেই। ভালই হবে। কালই যেয়ো।

ফতিমা অনেক কথাই পাড়ল। ডাক্তার-আবাদের অনেক মারপ্যাচের কথা উঠল। আজকাল ডাক্তার-আবাদের কাছারির সঙ্গে মহেশ্বরীপুরের কাছারির নাকি ভয়ানক বিবাদ চলছে। বিবাদের বিষয় হল, একটি খালের মাছ ধরা নিয়ে। জমিদারে জমিদারে ঝগড়া হলে হারেজ সর্দারের দাম বেড়ে যায়, প্রতিপত্তিও বেড়ে যায়। তার লোকজনও দরকার হয় এই সময়। তাই ফতিমা খুশি হয়ে অনেক কিছু আশা করছে।

কথামত আর্জান সকালেই কাছারিতে হাজিরা দিল। ফতিমা হাজার আশ্বাস দিলেও তার মনের আশঙ্কা কিন্তু দূর হয়নি।

দূর থেকে আর্জানকে দেখতেই হারেজ সর্দার কাছে ডেকে নিয়ে বলল,—আর্জান, বুঝলে কাল তোমাকে যেতে হবে চৌকুনির কাটা-খালে। জবরদখল করতে হবে। জবরদখল করে কাটা-খালে মাছ মারতে হবে।

—বড় মেঞা! আমি তো ওসব কাজে নামিনি কোনদিন। আমি ওসব পেরে উঠবো না।—আর্জান অনুনয়ের সুরে উত্তর দেয়।

—সে কি! তুমি অতবড় শিকারী! কিছুই করতে হবে না, শুধু কাছারির বন্দুকটা নিয়ে খাল ধারে বসে থাকলেই হবে। —হারেজ জবরদখলের কাজটি যেন সহজ করে দেখাতে চাইল।

তবুও হাঁ বা না, কোন কিছুই না বলে—এর নাম, তার নাম প্রস্তাব করে আর্জান কোনমতে বাড়িতে ফিরে এল।

হারেজ বুঝল, আর্জানকে দিয়ে এ কাজ হবে না। অসন্তুষ্টও হল। দয়া-দাক্ষিণ্য সে খুব করত। সে দেখেছে তাতে তার মান, সম্মান, প্রতিপত্তি বাড়ে। লোকবল তার হয়। এই লোকবলের জন্য জমিদারের কাছারিতে তার এত আদর। জমি জোরজবর-দখল লেগেই আছে এই অঞ্চলে, এবং সে-ব্যাপারে হারেজের উপরই ডাক্তার-আবাদের কাছারির ভরসা।

হারেজ আগে ভেবেছিল, আর্জান নামকরা শিকারী। সে থাকলে এইসব কাজে খুব সুবিধা হবে। কিন্তু এবার আর্জানের ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হল।

আর্জান এমনিতেই এইসব ব্যাপার পছন্দ করে না, ভয়ও আছে। তাছাড়া, কাছারি আসবার আগে মহেন্দ্র ঘটক তাকে ডেকে বলেছিল,—দ্যাখো, এসব ঝগড়াঝাঁটি, মারামারির মধ্যে তুমি যেয়ো না!

মহেন্দ্র ঘটক আর্জানের জীবনে নতুন লোক। বাড়ি তার খুলনা সদরের পুবে ডুমুরিয়া থানায়। ঘটকালি করার বংশ। কিন্তু সে অনেক কাল আগের কথা। এখন ব্যবসা করে বেড়ায়। সম্প্রতি মাছের ব্যবসা করে,—শুটকি মাছের ব্যবসা।

শীতের শেষে সুন্দরবনে প্রচুর চিংড়ি মাছ ধরা পড়ে। ডিঙিগুলি চিংড়ি মাছে ভর্তি হয়ে যায়। সুন্দরবনের শুটকি চিংড়ি ভারি মিষ্টি। তাই ব্যবসায়ীদেরও অভাব নেই। বনের সীমানায়, নদীর তীরে তীরে মাছ শুকিয়ে চালান দেবার 'খটি' বসে যায় অগণিত।

মহেন্দ্র ঘটক 'খটি' বানিয়েছে কয়রা ও মেঁশেলী নদীর মোহনায়। আর্জানের বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে। গ্রামের মধ্যে আর্জানের বাড়িই খটির সব থেকে কাছে।

এই সব খটির মালিকদের কাছারির সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লেগে যায়। শুটকি মাছের ব্যবসায়ে বেশ লাভ। জমিদারেরা সহ্য

করতে পারে না। কাছারির তরফ থেকে যতদূর সম্ভব সেলামী আর খাজনার বোঝা এদের উপর চাপাবার চেষ্টা চলে।

মহেন্দ্র ঘটক চালাক ব্যবসায়ী লোক। কাছারির লোকেরা যাতে বিশেষ জব্দ করতে না পারে, তার জন্য আশপাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে খুব খাতির করে নিয়েছে। সেই সূত্রেই আর্জানের সঙ্গে ঘটকের আলাপ।

তাছাড়া আর্জান এই খটিতে কাজ করে কিছু পয়সাও পায়। কাজেই সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠও হয়েছে।

আর্জানের ঘরের দাওয়ায় একদিন ওরা দুজনে বসে ছিল। পাশে ফতিমা পান সাজছিল। উঠি উঠি করে না উঠে ঘটক আর্জানকে প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, তোমার জমি গেল, বাড়ি গেল, কিছুই করলে না?

আর্জান বলল,—কি আর করব? হাতে এক পয়সাও ছিল না যে নায়েবকে খুশি করব!

ঘটক আবার প্রশ্ন করল,—কালিকাপুরের লোকেরা কিছুই করল না?

আর্জানের কথায় হতাশার সুর,—তারা আর কি করবে বলুন?

ফতিমা এবার মুখ খুলল,—পাড়াপড়শিরা? কেউ যদি একটা কথা বলে। টুঁ শব্দও করল না।...তারা কি করবে? যে করলে করতে পারত, সে-ই কিছু করল না। ধনাই মামু একটা কথাও বলল না। উনি? উনি তখন তো বনে বনে! কত কাঁদাকাটি করলাম। কত রাগারাগি করলাম। কেউ কিছু বলল না।

ঘটক বিস্ময়ে বলল, —আবাদের লোকেরা অমন কেন! আমাদের ডুমুরিয়া পরগনায় হলে কি হত জান? কেউ চুপ করে থাকত না — পাড়াপড়শি, গ্রামবাসী, কেউ চুপ করে থাকত না। জমিদারদের এত দাপট!......যাক্, চলো আর্জান, খটিতে যাবে নাকি?

ফতিমা ঘটকের কথায় উৎসাহিত হয়ে বলল,—ঠিক কথা, ঠিক কথা! আবাদের লোকে কেউ কিছু বলল না। কিছু বললে কি অমন করে আমার ভিটেমাটি চলে যেত!

আর্জান মাথা নিচু করে চুপ করেই আছে। অতীতের দিনগুলির কথা তার মনে পড়ে। স্বপ্ন জাগে মনে, গ্রামবাসী সব যদি এক হয়ে দাঁড়াত! ঘটকের কথা যদি সত্যি হত!

আর্জানের পিছনে চার বছরের তুফো লাঠি নিয়ে একটা মাকড়সার জাল ভাঙছিল। জালে একটি মাছি পড়েছে।

সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই মহেন্দ্র ঘটক বলল, —দেখেছ আর্জান!··· মাকড়সার জাল পাতা! একলা কিছু করতে গেলেই ঐ মাছিব মত জড়িয়ে মরতে হবে। এই জাল ছিঁড়ে তুমি একলা কোথাও যেতে পারবে না। কালিকাপুরেই থাক, আর ডাক্তার-আবাদেই থাক! একটা সুতো কাটবে তো আরেকটা সুতো তোমাকে জড়িয়ে দম বন্ধ করে দেবে। একলা এর কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায় না! —বলেই ঘটক তুফোর হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে মরা মাছিটাকে সামনে নিয়ে এল।

লাঠি কেড়ে নিতেই তুফো কেঁদে অস্থির। আর্জান তাড়াতাড়ি ফতিমার কাছ থেকে পান নিয়ে ঘটকের হাতে দিয়েই ছেলেকে কোলে নিল। বলল, —চলুন, এবার খটিতে যাই।

ঘটকের প্রতি আর্জানের আকর্ষণের আরেকটা কারণ ছিল। ঘটকের একটা দোনলা বন্দুক আছে। ঘটকের শিকারের বড় শখ। মাঝে মাঝে আর্জানের সঙ্গে হরিণ শিকারে যেত। কিন্তু এখন তার শখ, একটা বাঘ শিকার সে করবে। ইতিমধ্যে একবার আর্জান একলা হরিণ শিকার করতে গিয়ে একটা বাঘ মেরে আনে। তারপর থেকে ঘটকের ইচ্ছা আরও বেড়েছে। একটা বাঘ শিকার সে করবেই।

আর্জানকে বললেই সে বলত,—না, ও-কাজ করবেন না। দুজনে শিকারে যাবেন না। ওতে বিপদ আছে!

ঘটক তার উত্তরে বলত,—তবে তুমি আমাকে একা যেতে বল?

—একা গিয়ে আপনি পারবেন কেন? ওভাবে হয় না। বাঘের দেখা ভাগ্যের কথা। ঐ হরিণ শিকার করতে করতে যদি 'বড়মেঞা'র সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তবেই মারবেন।

—না, তা হয় না! তার মানে, আমার আর বাঘ শিকার হবে না! আচ্ছা, চলো না, তুজনেই বন্দুক নিয়ে যাব। তুমিও বন্দুক নেবে, আমিও নেব।

—তুজন! তাতে আবার তুই বন্দুক!······আরও বিপদ! তুই ঘোড়া তুলে বাঘের পেছনে কাছাকাছি চলা-ফেরা করা,—ও কাজ করতে নেই, বাবু! সে মূর্তি দেখলে কারও চেতনা থাকে না। কখন কিভাবে ঘোড়া-তোলা বন্দুকে চোট্ হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। তা হয় না!

—তোমার কেবল 'তা হয় না', 'তা হয় না'—তবে কি হয়?

—আচ্ছা, আপনার যখন অতই শখ, এক কাজ করা যাবে। তবে এ বছর না। সামনের সনে যখন আসবেন তখন একটু আগে আগেই আসবেন। একটা নতুন ফন্দি আঁটা যাবে।

উনিশ

হারেজের রাগের-ভাজন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্জান বুঝেছিল, এর মাশুল দিতে হবে। কিন্তু সে যে এত শীঘ্র, তা ধারণাও করেনি। হারেজের আরও রাগের কারণ ছিল,—মহেন্দ্র ঘটকের সঙ্গে আর্জানের অত মেলামেশা সে পছন্দ করত না।

একদিন আর্জানকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে হারেজ বলল,—সেই যে সেলামী দিয়ে সর্দার-পাড়ায় এসে বসেছ, তারপর তো আর কিছুই দিলে না। জমিদারকে আমি কি করে খুশি রাখব? পাঁচ-ছয় বছর তো হয়ে গেল, এবার কিছু দাও।

আর্জান কথা কমই বলে। চুপ করেই আছে। কিন্তু মনে মনে অনুভব করে,—বড়মেঞার মুখ দিয়ে যখন একবার কথাটা বেরিয়েছে তখন তাকে অবমাননা করা ঠিক হবে না। বড়মেঞাকে আর বেশি রুষ্ট করা উচিত নয়। ঝপ্ করে বলেই ফেলল - তা বড়মেঞা, আপনি বললে আমি দিতে বাধ্য থাকব! কিন্তু……

-না, না, কিন্তু-টিন্তু নেই। যা হয় পারো দিয়ো।

এর পর থেকে আর্জানের মন ভারাক্রান্ত। কোত্থেকে টাকা এনে সে বড়মেঞাকে খুশি করবে। রাত্রে ফতিমাকে সব বলল। সেও কোন উপায় বলতে পারে না। কিন্তু এই গৃহের প্রতি ফতিমার মায়া অপরিসীম। এর থেকে সে যেন আর বিতাড়িত না হয়! এই গৃহ যে তারই নিজ-হাতে সাজানো! ফতিমার মনের এই আবেগ আর্জান তার প্রতি কথায় যেন অনুভব করল।

পরদিন আর্জান মন দৃঢ় করেই প্রস্তাব করল,—গরুটাই বিক্রি করে দিই। এক বিশ ধান পাওয়া যাবে। কি বল?

ফতিমা সায় দিল,—বেশ, তাই কর। বড়মেঞাকেও কিছু টাকা দেওয়া যাবে, আর আমাদের কয়েক মাসের খোরাকও হবে।

ফতিমার এই রাজি হওয়াটা হঠাৎ নয়। কাল সারা রাত ধরে

সে ভেবেছে। কোনও পথ পায়নি! হারেজের কথার উপর সে মিছেমিছি নির্ভর করেছিল,—তাকে 'বা'জান' ডেকে আবেদন জানিয়েছিল আর্জানের যে-কোনও একটা চাকরির জন্য। এই তার প্রতিদান! এই সংসারে আবেদন-নিবেদনের কি কিছুই মূল্য নেই? চিন্তার স্রোত তার গুলিয়ে যায়। কিন্তু এখন সে কি করবে? গরুটার প্রতি তার ভয়ানক মায়া। তবু ক্ষুব্ধ মনে নিজে নিজের কাছেই প্রস্তাব করল,—দিক্, আর্জান গরুটা বিক্রি করেই দিক্। গভীর রাতে চোখ মেলে তাকাল। চারিদিকে অন্ধকার। আবার চোখ বুঁজে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়,—তা হোক্, যাক্ সব যাক্। আর্জান নিঃস্ব হয়ে যাক্। তা না হলে সে বুঝি বন ছাড়বে না! নিঃস্ব হয়ে সে যদি বন ছাড়ে, তবুও তার ভাল। কিন্তু তারপর?......... ঘটক! আসুক এবার ঘটক। সে হয়ত একটা কিছু পথ দেখাতে পারবে। অন্ধকারে ভরসার নিশানা পেয়ে ফতিমা তখনকার মত ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে আর্জান তার শেষ সম্বল গরুটি পরদিন বিক্রি করে দিল। হারেজ সর্দারকে দশ টাকা দিয়ে, সে বাকি টাকার ধান ঘরে আনল।

কিন্তু তাতে আর কদিন চলবে! চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ চলল, আষাঢ়ও চলল। শ্রাবণ মাস, মাঠে কাজ পাওয়া যায়। পরের খেতে জন খেটে শ্রাবণ মাসও গেল কোন মতে। কিন্তু তারপর? ঘটকের খটি পড়তে এখনও পাঁচ মাস বাকি। সে এলে আর্জানের কাজ বাঁধা আছে। কিন্তু সে যে অনেক দেরি!

কোনও পথ নেই। আর্জান হারেজ সর্দারের দ্বারস্থ হল। বড়মেঞা টাকা পেয়ে আর্জানের উপর কিছুটা খুশিই ছিল। বলল,—বেশ, তা এক কাজ কর। তুমি 'ঘোঘা'র তদারক কর। ধান কাটা অবধি তোমার এ কাজ রইল। মাসে মাসে খোরাকি ধান পাবে।

ভেড়ি তদারকের কাজ সাধারণতঃ প্রজাদের ভাগের ভাগ করতে হয়। কিন্তু ডাক্তার-আবাদে ভেড়ির দায়িত্ব কাছারির

হাতে। কাজেই অন্য আবাদে যেখানে বিঘা প্রতি দুই টাকা নিরিখ, ডাক্তার-আবাদে সেখানে আড়াই টাকা নিরিখ। তদারকের খরচ কাছারির। হারেজ তদারকের ধান কাছারি থেকেই নেবে। তবু লোক ঠিক করার ভার তারই হাতে।

আর্জান খুশি হয়ে সেলাম দিল। এ দেশের চলতি রীতি অনুযায়ী হাত বাড়িয়ে আশিস ভিক্ষা করে বলল, - যে আজ্ঞে, 'আশে' বড়মেঞা —বলেই আর্জান বিদায় নিল।

—নে, আর 'আশে' ভিক্ষে করতে হবে না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় ভেড়ির কোল-ছাড়া হলে চলবে না কিন্তু আর্জান !

ফতিমা খবর শুনতেই খোদাতাল্লার নাম স্মরণ করল। আনন্দে অধীর হয়ে তুফোকে জড়িয়ে ধরল।

আনন্দের আতিশয্য দেখে তুফো চিৎকার করে প্রশ্ন করে,— কি ? কি ? কি ?

ফতিমা ব্যগ্র হয়ে বলল, -তোর বা'জান এবার কাঁকড়া মাছ শিকার করে বেড়াবে।

তুফো শুনেই আব্দারেব স্থুরে বলল, -আমি কাঁকড়া মাছ খাব ! আমি কাঁকড়া মাছ খাব।

—দূর বোকা ! আমরা কি কাঁকড়া মাছ খাই ! মুসলমানের পোলা হয়ে ও-কথা বলতেই নেই।

* * *

আর্জান কিছুদিনের জন্য 'হালে পানি' পেল বটে কিন্তু কাজটা বড় কঠিন। গোটা আবাদের প্রাণ ভেড়ি। সব নদীরই দুপাশে ভেড়ি। ভেড়ি ভেঙে নদীর লোনা জল একবার আবাদে ঢুকলে সে বছরের ফসল তো মারা যাবেই, পর পর তিন বছর ভাল ধান হবে না। এই লোনা বিষের হাত থেকে ফসল ও জীবন বাঁচাবার জন্য অন্যান্য আবাদের মত ডাক্তার-আবাদেও চারদিকে ভেড়ি। চারদিকে মাপলে লম্বায় পাঁচ মাইল হবে। ডাক্তার-আবাদের

ভেড়ি নাম-করা ভেড়ি। উঁচু আট হাত। মাথায় চওড়া ছয়-সাত হাত। সবটাই নদীর মাটি কেটে গাঁথা।

আর্জানের কাজ হল, একেই তদারক করা। ভেড়ির এক নম্বর শত্রু হল গাছ-গাছড়া। ছোট গাছ হলে বিশেষ ক্ষতি হয় না; কিন্তু বড় গাছ হলেই ভেড়ির বাঁধন ফেটে যায়, আর সেই ফাটল দিয়ে নদীর লোনা-জল পথ করে নেয়। কাজেই আর্জানের একটা কাজ হল, কাটারি হাতে এই গাছ-গাছড়া কেটে বেড়ানো।

ভেড়ির দু-নম্বর এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষুদে শত্রু হল কাঁকড়া। লোনা জলে বড় বড় কাঁকড়া হয়। অসংখ্য কাঁকড়া। এরা ভেড়ির নিচে গর্ত করে বাসা বাঁধে। গর্ত করে প্রায় সুড়ঙ্গ কেটে ফেলে, আর সেই সুড়ঙ্গ পথে স্রোতের জল ঢুকে ঢুকে বাঁধের তলা ক্ষয় করে দেয়। প্রথমে এই পথে খেতে জল ঢোকে চুইয়ে চুইয়ে। বেশি দিন না দেখলে বাঁধ অবশেষে ধ্বসে পড়ে। এই ধরনের সুড়ঙ্গ-পথকে এদেশে 'ঘোঘা' বলে। এই ঘোঘা সারা-ই হল আর্জানের প্রধান কাজ। কোদাল হাতে, দিন নেই রাত নেই, আর্জানকে 'ঘোঘা মেরে' বেড়াতে হবে। তাই ফতিমা ঠাট্টা করে বলত, আর্জান এবার কাঁকড়া শিকারী!

'জোগার' দিকে,—অর্থাৎ পুর্ণিমা ও অমাবস্যায় এবং তারই কাছাকাছি তিথিতে ভেড়ি নিয়ে বড় বেশি সাবধান হতে হয়। জোগার জলে নদী পুর্ণমাত্রায় ভরপুর হয়ে ওঠে। স্রোতের টানও হয় প্রখর। জল যেন থৈথৈ করতে থাকে। এক এক সময় মনে হয় যেন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে এই মাটির প্রাচীর।

মাঝে দীর্ঘ ধানের খেত ধুধু করছে। তারই চারিপাশে প্রায় গোলাকার হয়ে ঘেরা এই ভেড়ি। বাঁধের এক পাশে কোথাও বড় নদী, কোথাও খাল। আবাদের খালকেও বিশ্বাস নেই। কখন ফেঁপে উঠবে তার ঠিক নেই। বাঁধের ভিতর দিকে মাঝে মাঝে কয়েক ঘর চাষীদের বসবাস। চাষীদের পাড়াগুলি এক মাইল দুই মাইল অন্তর।

রাস্তা বলতে একমাত্র এই ভেড়িই আছে। তবুও এ পথ নির্জন। লোকে নৌকায় বা ডিঙিতেই বেশি যাতায়াত করে। আজকাল যে-কোন সময় দেখা যাবে, এই নির্জন ভেড়িতে ছোট্ট একটি মানুষ কাটারি আর কোদাল হাতে নিয়ে ঘুট্‌ঘুট্‌ করে তদারক করে বেড়াচ্ছে। কোথাও কোনও জনমানব নেই। না-ই বা থাকল! আর্জান এতে অভ্যস্ত। জীবনের অধিকাংশ সময় তার কেটেছে একা, গভীর অরণ্যে।

আর্জান বহুদিন বনে যায় না। মাঝে মাঝে বনে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া নানা লোকের কাছ থেকে অনুরোধও আসে শিকারে যাবার জন্য। কিন্তু সে জোর করেই পাঁচ মাসের জন্য বনে যাওয়া বন্ধ করেছে। ভেড়ির কাজে অবহেলা করে, এ কাজ সে হারাতে চায় না। এ কাজ হারালে তার খোরাকি ধান যে বন্ধ হয়ে যাবে!

তাই বলে শিকারীর শিকারের অভাব হয়নি। তবে বাঘ বা হরিণ নয়,—এবার সাপ। অসংখ্য সাপ ভেড়ির গায়ে। বর্ষাকালে চারদিকে জল। কোথাও স্থান না পেয়ে নানা রকমের সাপ সব আশ্রয় নেয় এই ভেড়ির উপর। আর তারই মাঝে আর্জানকে ঘুরে বেড়াতে হয় রাতে ও দিনে!

একদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ি এসেই আর্জান চিৎকার করে বলল—তুফো! ও তুফান! শীগ্‌গির একটা কুপি নিয়ে আয়।

ফতিমা কুপি নিয়ে আঙিনায় এসেই বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল।

সামলে নিয়ে বলল,—কেন তুমি সাপ মারলে? বলিনি তোমাকে পইপই করে,—কখ্‌খনো সাপ মারবে না!

আর্জান পাঁচ হাত দীর্ঘ সাপটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল,—বলেছ তো! কিন্তু দেখেছ এর রং? খয়েরি রং। দাঁড়াস সাপ। মাটির সঙ্গে যেন মিশে থাকে। সন্ধ্যার দিকে যে-পথ দিয়ে ফিরব সেখানেই পড়ে ছিল। না মেরে যদি মাড়িয়ে দিতাম, তাহলে তোমার কি কোনও সুবিধা হত?

ফতিমা বলল,—তবু তুমি মারলে কেন? এ সাপ তো হিংসুটে নয়। কাউকে কিছু বলে না, শুধু গরুর বাঁট থেকে দুধ খেয়ে যায়। তোমার তো আর গরু নেই! যাও বা ছিল, তাও দিয়েছ বিক্রি করে।

আর্জান ফতিমার কথায় আর কান না দিয়ে তুফোকে ডেকে একবার সাপটাকে লম্বা করে দেখাল; তারপর লেজটা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর মধ্যে।

কদিন পর ভোরবেলা আর্জান চলেছে ভেড়ির উপর দিয়ে। অমাবস্যার 'জো' গেছে, কলটা একবার দেখতেই হবে। জমির নোনা ধুতে বা ধানের চারা বাঁচিয়ে রাখতে ঘেরের মধ্যে জমা বৃষ্টির জল কখনও আটক করে রাখতে হয়, কখনও বা ছেড়ে দিতে হয়। তার জন্যই কল বসানো। লম্বা কাঠের বাক্স বা গাছের ফাঁপা গুঁড়ি দিয়ে এই কল তৈরি। কলের দু-মুখে এমন ভাবে কপাট দেওয়া যাতে ঘেরের জল বেরুতে পারে কিন্তু নদীর লোনা জল ঢুকতে না পারে। ভাটিতে নদীর জল বেশ নিচুতে নেমে গেলে এই কল দিয়ে জল সহজেই বের করে দেওয়া যায়। ভেড়ির নিচের দিকেই কল বসাতে হয়। ভেড়ি এখানে একটু দুর্বল হয়েই পড়ে। কাজেই আর্জানকে এদিকে বেশি নজর রাখতে হবে।

* * *

শঙ্খচূড় সাপ! এমন ভয়াল সাপ আর নেই। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। রাগ ও হিংসা এর সর্ব দেহে। ছোবল মারবার সময় যেন শুধুমাত্র লেজের উপর দাঁড়িয়ে প্রায় মানুষের সমান উঁচু হয়ে ওঠে। ফণা বিস্তার করে যখন ফোঁস-ফোঁস করতে থাকে তখন মনে হবে, এর সামনে যেন আর রক্ষা নেই!

কলের দুপাশ সবুজ ঘাসে ভরে গেছে। সবুজ রঙের উপর হরিদ্রাভ শঙ্খচূড় বঙ্কিম দেহে দাঁড়িয়ে গেছে। ফুলে ফুলে ফোঁস-ফোঁস করছে। সামনে যেন কি একটা দেখেছে. তারই উপর এত রাগ! এই সাপটার কথা এ আবাদের সবাই জানে। হারেজও অনেকবার বলেছে এই সাপের ইতিকথা। এই শঙ্খচূড়ের জন্য কেউ

সহসা এই কলের ধারে আসতে চায় না ; হারেজ অনেকবার বন্দুক দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছে ; কিন্তু বন্দুক আনতে আনতে এর দেখা আর পায়নি। দূর থেকেও এর গতি নজরে রাখবার চেষ্টা করতে কেউ সাহস পায় না। দেখতে পেলে তেড়ে এসে ছোবল মারবে।

আর্জান পিছিয়ে এল। মাটির উপর যেন কোনও শব্দ না হয়, মাটির উপর শব্দ হলে অনেক দূর থেকে সাপ বুঝতে পারে। ধীর পদক্ষেপে আর্জান পিছিয়ে এল। কিছু দূর এসে ঝট্‌পট্‌ দশ বারো-খানা ছোট ও মোটা গাছের ডাল কেটে ফেলল। সবগুলি বগল-দাবা করে শিকারী এগিয়ে চলে। শঙ্খচূড়ের পেছনে আর্জান। উদ্যত ফণা লক্ষ্য করে আর্জান একটা ডাল সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল। বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্য থাকলে কি হবে, হাতের নিরিখ ব্যর্থ হল। সাঁ সাঁ করে শঙ্খচূড়ের পাশ দিয়ে ডালখানা বেরিয়ে গেল।

সচকিতে শঙ্খচূড় ঘাড় বাঁকায় আর্জানের দিকেই। মুহূর্ত দেরি না করে আর্জান পর পর তিনখানা ডাল ছুঁড়ে মারল। একখানা ওর মাজায় লেগেছে। ভাল ভাবেই লেগেছে। মাজা ভেঙে পড়ে গেল। যেখানে ভেঙে গেছে সেই অবধি খাড়া হয়ে আশপাশে ছোবল মেরে রাগে ও হিংসায় বিষ ঢালতে লাগল। এর পর নিশ্চিন্ত মনে আর্জান কাছে এসে শঙ্খচূড়কে পিটিয়ে শেষ করল।

*　　　*　　　*

বড়মেঞা ! বড়মেঞা ! এই নেন আপনার শঙ্খচূড়।—বলেই আর্জান হারেজের উঠানে সাপটাকে রাখল।

হারেজ দেখেই মহাখুশি। বলল—চলো, চলো, কাছারিতে নিয়ে দেখাই। কিন্তু শঙ্খচূড়কে মারলে কি করে ? তা তুমি সব পার, শিকারী ! তোমার অসাধ্য কিছু নেই !

হারেজের খুশিতেই আর্জান খুশি। ছেলেপিলের দল জমে গেছে। তারা সাপটাকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি দেখাতে চলল। বিপদ বুঝে আর্জান বলল,—না, না, এ আর দেখাতে হবে না।

হারেজ বলল,—যাক্ না, সবাই দেখে খুশিই হবে।

ছেলেদের দল সব বাড়ি ঘুরে অবশেষে আর্জানের বাড়ি হাজির।

—ও চাচি! ও চাচি! দেখে যাও, সাপ! সাপ! সাপ! ছেলেরা দু-তিন জনে একত্রে চিৎকার করে।

ফতিমা 'সাপ' শুনতেই চম্‌কে উঠে বাইরে ছুটে এল। মনে তার আশঙ্কা, আর্জানের কোনও অমঙ্গল হয়েছে।

—বা-বা! এত বড় সাপ! কি সাপ রে? জ্যান্ত আছে নাকি?—ফতিমা শিউরে ওঠে।

—জ্যান্ত কি করে থাকবে? শ—ঙ্খ—চূ—ড়! শ—ঙ্খ—চূ—ড়! —ছেলের দল স্পষ্ট উচ্চারণ করে করে বলল। নামটা ভারি ভাল লেগেছে ওদের।

—কে মারল রে?

—তাও জান না বুঝি? আর্জান চাচা, আর্জান চাচা!

ফতিমা গম্ভীর হয়ে যায়। দৃঢ়স্বরে বলল,—যা, যা, এবার নিয়ে যা এখান থেকে। বাঘ না পেয়ে এবার সাপ! মরণ আমার!…… কেন আমি মরি না!

আর্জান কাছারি থেকে গড়িমসি করে বেশ বেলা করেই বাড়ি ফিরছে।……কেন, সাপটা মেরেছি তাতে কি হয়েছে? শঙ্খচূড় যদি তাকেই কামড়াত, তাহলে কি ভাল হত! ফতিমার কি? তার তো আর ভেড়িতে ঘুরতে হয় না……কেন ফতিমার শিকার ভাল লাগে না? শিকার! সাপ আবার শিকার হয় নাকি? সাপকে হত্যা করেছি। হত্যা না তো কি? হত্যা ও শিকার মোটেই এক কথা নয়। হত্যার কি দরকার ছিল? সাপের লেখা আর বাঘের দেখা।… হ্যাঁ, এই কথাই সে ফতিমাকে বলবে। লেখা যদি থাকে তবে মারলেও আসে যায় না, আর না মারলেও আসে যায় না। কিন্তু না মারলে সে তার ভেড়ির উপর দিয়ে যাবে কি করে?…না, ভেড়ি তার নয়,—জমিদারের। জমিদারের ভেড়ি, মাটি, ভিটে, সবই জমিদারের। জমিদারের ভেড়িতেই শঙ্খচূড় এসেছিল……মেরেছি, বেশ করেছি – ফতিমার তাতে কি? কি ভয়াল সাপ, কি ভীষণ তার গর্জন!

বাড়ির উঠানে ফতিমাকে দেখে আর্জানের সব চিন্তা গুলিয়ে গেল।

—যাও! যাও! বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।—ফতিমা যেন গর্জে ওঠে।

—কোথায় যাব?—আর্জানও রেগে উঠে বলল। ভেবেছিল কি সব বলবে ফতিমাকে,—তা সে সব ভুলে গেছে।

—কোথায় যাব!! কেন, যাও ভেড়িতে গিয়ে মরো গে! ফের উনি মনসার গায়ে হাত দিয়েছেন। মরণ আর আমার নেই!—হাতের ঝাঁটা ফেলে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফতিমা যেন খেঁকিয়ে উঠল।

তারপরই কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল ফতিমা। আর্জান হতভম্ব। চুপ করেই থাকে।

কাঁদতে কাঁদতে ফতিমা বলল, মারো না! এতই যদি মারবার শখ, আমাকেই একদিন মেরে ফেল না—সব মিটে যাক্!—ফতিমার চোখের জল বাঁধ মানে না।

আর্জান ধীরে ধীরে হুঁকো থেকে কলকেটা নিয়ে আগুনের আশায় এগিয়ে এল। ফতিমার কাছেই এল। ফতিমার থুতনিতে হাত দিয়ে একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলল, —আচ্ছা গো বেশ, তোমার মনসার গায়ে আর হাত দেব না।

—না, তুমি কখ্খনো হাত দেবে না……কিছুতেই না!—বলেই ফতিমা আর্জানের হাত থেকে কলকেটা নিয়ে আগুনের জন্য রান্নাঘরে দ্রুতপায়ে চলে গেল।

কুড়ি

সামনে ঈদ্। মাঝে একটা রবিবার, তারপরই ঈদের উৎসব। এদেশের সবচেয়ে বড় হাট বড়দল। বড়দল এখান থেকে প্রায় এক জোয়ারের পথ। প্রতি রবিবার বড়দলে হাট বসে। ঈদের সওদা করবার এই শেষ হাট।

আর্জান ও ফতিমার পরামর্শ চলে, ঈদে তুফানকে কি দেবে? হাতে একটি পয়সাও নেই। তবু জল্পনা-কল্পনা চলে।

শনিবার সন্ধ্যায় ফতিমা আর্জানের সামনে দুটি টাকা রেখে বলল, -এই নাও, তুফোর একটা কামিজ আর পাজামা এনো।

আর্জান অবাক হয়ে গেছে। বলল,--কোথায় পেলে এই টাকা?

-কেন? মুরগির ব্যাপারী এসেছিল, তার কাছে সাদা মোরগটা বিক্রি করে দিয়েছি।

মুরগির ব্যাপারে সংসারে মেয়েদের একচ্ছত্র অধিকার। পুরুষদের এ বিষয়ে কোন কথা বলার উপায় নেই। কাজেই আর্জান একবার শুধু বলল, --সাদা মোরগটা বিক্রি করলে! বেশ! তুমি তো কিছু দিলে, কিন্তু আমি কি দিই?

ফতিমা হিসাব করেই রেখেছে। বলল,---হাট-খরচের জন্য দু-পালি ধান নিয়ে যাও। খরচ করে যদি বাঁচাতে পার তাহলে একটা কিস্তি এনে দিও। বেশ দেখাবে তুফোকে মাথায় কিস্তি পরলে!

হাটে যেতে হলে আজ রাত্রেই বারোটা নাগাদ জোয়ারে যাত্রা করতে হবে। ভোরে জোয়ারের শেষে ডিঙি বড়দলে পৌছবে। দুপুর নাগাদ হাট জমে ওঠে। তারপর ফিরবার পালা।

হাজার হাজার নৌকা ও ডিঙি এসে জমে বড়দলের হাটে। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোকের কেনা-বেচা। লাখো লাখো টাকার লেন-দেন হয়ে যায় একদিনে। এতবড় হাট এ অঞ্চলে আর নেই।

হারেজের ডিঙি করেই আর্জান হাটে এসেছে। এদেশের নিয়ম, অপরের ডিঙিতে কোথাও গেলে দাঁড় বেয়ে বা হাল ধরে সাহায্য করতে হয়। আর্জান একমনে সারা রাত হাল বেয়ে চলল। সবাই ঈদের সওদা করতে চলেছে। ডিঙিতে বসে সবাই তারই আলোচনা করে।

সকলের প্রসঙ্গ শেষ হলে আর্জানের প্রসঙ্গ এলেই হারেজ বলল,—আরে, ওর কথা ছেড়ে দাও! ও বাদার কেওড়া ফল, ভাসেও না, ডোবেও না!

সবাই হাসে, আর্জানও হাসে। হাসিতে আর্জানের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে।

বড়দলে উঠে যে যার মনে হাট করতে চলে গেছে। ধান বিক্রি করে ফতিমার কথা মত আর্জান সব কিনল। কিন্তু তুফোর জন্য নিজের জিনিষটাই কিনতে মুশকিলে পড়েছে। দোকানি কিস্তির দাম চায় বারো আনা। আর্জানের কাছে বারো আনা পয়সাই আছে, কিন্তু সে দশ আনার বেশি কিছুতেই দিতে চায় না। আর্জান একবার দোকানির কাছে আসে, দরাদরি করে, আবার চলে যায়। আবার আসে, আবার দরাদরি করে,—অনুরোধ করে।

একবার দোকানিকে বলল,—বেশ! তাহলে চললাম! —বলেই অনেক দূরে চলে যাবার ভান করে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

দোকানি চেঁচিয়ে বলল,—বেশ, এগার আনা দেবে?

আর্জান না শুনবার ভান করে আরও এগিয়ে গেল। সামনেই একটা খেলনার দোকান। খেলনা দেখতে দেখতে একটা ক্যাপ-বন্দুকের উপর আর্জানের নজর পড়ল। বুকের ভেতরটা তার যেন কেমন করে উঠল। বার বার দেখে। নিশ্চয় অনেক দাম। তা হোক, দাম করতে দোষ কি? কিন্তু যদি বলে বসে দু-টাকা! তা বলুক না, দেখতে তো আর দোষ নেই! আর্জান বন্দুকটা হাতে করে জিজ্ঞাসা করল,—কত টাকা দাম?

দোকানি বলল,—দুই আনা কম এক টাকা। চোদ্দ আনা। এই

ছাখো, কেমন গুলি চালান যায় ? —বলেই পট্ করে ক্যাপ লাগিয়ে আওয়াজ করল।

আর্জান মোহগ্রস্ত। মাত্র চোদ্দ আনা! তা হলে তো সে দর করতে পারে ! ভেবেই বলল,—বারো আনায় দেবে ?

দোকানি দিতে চায় না। আর্জানের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে আবার সাজিয়ে রাখে।

আর্জান এগিয়ে গেল আবার টুপির দোকানটায়। দূর থেকে কিস্তির দিকে তাকায় কিন্তু দর করে না। দোকানি আড়চোখে দেখল, আর্জান ঘুরে এসেছে। সেও অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

একবার টুপির দোকান, একবার খেলনার দোকান। বার-বার হাঁটাহাঁটি করে। কিছুই স্থির করতে পারে না। ফতিমা বলেছে কিস্তি আনতে। বললে কি হবে! সে তো প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি দেবে ?' না, আমার ইচ্ছার কথা নয়। তুফান কিসে খুশি হবে ? মাথায় কিস্তি পরলে তুফানকে ভারি মিষ্টি লাগবে! তা হোক, বন্দুকটা পেলে সে কিন্তু ভারি খুশি হবে। বন্দুকটা কিনলে সঙ্গে একবাক্স ক্যাপও দেবে। বেশ আওয়াজ। বন্দুকটাই কিনে ফেলি!······কিন্তু কাছে যে মাত্র বারো আনা পয়সা।

হঠাৎ আর্জানের চমক্ ভাঙে। পুব আকাশে কালো মেঘ করেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। হারেজ সর্দারের ডিঙি চলে গেল নাকি ?

ছুটে গেল ডিঙি দেখতে। ঘাটে ডিঙি নেই। মেঘ দেখে হাটের লোক সবাই চলে যাচ্ছে। হারেজ সর্দারকে অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু কোথাও ডিঙির খোঁজ পেল না।

হারেজ সর্দারও আর্জানের অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু কোথাও পায়নি। ঝড়ের লক্ষণ দেখে অবশেষে তারা চলে গেছে। ডাক্তার-আবাদের আর কোনও ডিঙি তো হাটে আসেনি।······আর্জান আর ভাবতেই পারে না,—ছুটে গেল বন্দুকের দোকানের দিকে।

তেল কিনেছিল দু-আনার। সেই দোকানে গিয়ে অনেক অনুরোধ করে অর্ধেক তেল ফিরিয়ে দিয়ে এক আনা নিল।

এবার আর্জান প্রায় দম বন্ধ করেই খেলনার দোকানে গিয়ে তেরো আনা পয়সা রেখে বলল,—না, না, আর তুমি কিছু বলো না! কিছু বলো না! নাও, নাও! —বলেই বন্দুকটা তুলে নিল।

দোকানি পয়সা গুনে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর্জানের চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে পারে না। আস্তে আস্তে ক্যাপের বাক্সটা আর্জানের হাতে তুলে দিল।

আর্জান অনেক খুঁজে অবশেষে একখানা ডিঙি পায়। তারা যাবে নারানপুর খালের মুখ দিয়ে। সেখান থেকে ডাক্তার-আবাদ হাঁটা পথে এক ক্রোশ হবে।

পথেই বৃষ্টি ও বাতাস শুরু হয়। ধীরে ধীরে ঝড়ো-হাওয়া দেখা দেয়। নারানপুরের খালের মুখে নেমে আর্জান ভেড়ির উপর দিয়ে ছুটতে থাকে। ভেড়ির শক্ত মাটির উপর বৃষ্টি পড়ে পিচ্ছিল কাদা হয়েছে। আর্জান পড়ে যায় যায়। তবু বুড়ো আঙুল টিপে টিপে ছুটতে থাকে। বৃষ্টিতে ভিজে শেষ হয়ে গেছে। তুফানের জামা আর বন্দুকটি কোনমতে বগলের নিচে রেখে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে।

দূরে কাছারিবাড়ি দেখা যায়। কেমন যেন সোরগোল বেশি। ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে আর শোঁশোঁ করে বাতাস বইছে—তবুও তার মধ্যে কাছারি-ঘর থেকে হাটের আওয়াজের মত শব্দ আসছে। কাছারির পাশে হারেজ সর্দার ও আরও ছ-সাত ঘর লোকের বাড়ি। বাড়িগুলি কেমন যেন নিস্তেজ। আর্জানের মনে শঙ্কা জাগে। নদীতে জোয়ার এসেছে। নদীর জল যেন ফুলে উঠেছে। বাতাসের বেগও ক্রমে বেড়ে ওঠে।

ফতিমা আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করে আছে। ইতিমধ্যে সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, অনেক আগেই হারেজ সর্দারের ডিঙি এসে গেছে, কিন্তু আর্জান তাতে ফেরেনি। আর্জান এলে অনেক কথা বলতে হবে, অনেক কথা জানতে হবে।

কিন্তু আর্জান আসতেই তুফান বন্দুক পেয়ে এমন মজা করতে থাকে যে, ফতিমা ও আর্জান সব কিছু ভুলে গেল।

এদিকে উঠানে জল এসে গেছে। ঝড়ের উদ্দামতা বাড়ছে। দমকা হাওয়ায় ঘরের চাল নড়ে উঠতে থাকে।

ফতিমা বলল, —জানো, এপাড়ার সবাই চলে গেছে। সবাই কাছারি বাড়ি গেছে। ওরা বলল, পুবে-হাওয়া দিয়েছে, লক্ষণ ভালো না। যে যার ঘর ছেড়ে কাছারিতে আশ্রয় নিয়েছে। আমাকেও ডাকতে এসেছিল। কিন্তু যাইনি। তুমি এখন কি করবে?

আর্জান চিন্তান্বিত হয়ে বলল, —আগে খেতে দাও তো! তারপর দেখি কি করা যায়।

আর্জান তাড়াতাড়ি কোনমতে খেয়ে নেয়। খাবে কি! বাইরের বাতাসের ঝাপটা আর শোঁশোঁ শুনবার জন্য কান পেতেই ছিল। ঘর ছেড়ে কি শেষ অবধি যেতেই হবে! মুখ ধুতে দাওয়ার এসে হাওয়ার গতিক সঠিক বুঝে নিতে চাইল। এসে দেখে, জলে জলাকার। মেঘের ঝিলিকে পরিষ্কার দেখতে পায়। কই, যখন সে আসে তখন তো এতো পানি ছিল না! দাওয়ার খুঁটি এক হাতে ধরে উঠানে নেমে পড়ল। স্থির জল নয় তো! কেমন যেন জলের টান পায়ে অনুভব করে। উন্মনা হয়ে ওঠে আর্জান। তাড়াতাড়ি এক-কোশ পানি তুলে মুখে দেয়। দিতেই পাগল হয়ে উঠল যেন—'ওরে নোনাপানি! শীগ্‌গির কর! যেতে হবে, এক্ষুনি যেতে হবে। ভেড়ি ভেঙে গেছে। শীগ্‌গির কর!'

আর্জান হন্যের মত জল ভেঙে ছুটে গেল পাশের বাড়ির দিকে। ভাগ্যি, আসবার সময় সেখানে 'খোল্-ভেড়ি'তে একখান্ ছোট্ট ডিঙি দেখে এসেছিল। কোনমতে টানতে টানতে ডিঙি ঘরের দাওয়ায় লাগিয়েই বলল—নাও, তাড়াতাড়ি করো। যা তুলবার তোলো! তোলো!

—আমার মরণ! আল্লা!—বলেই ফতিমা যা পারে তাই টেনে হিঁচড়ে ডিঙিতে তুলল। হাঁড়ি, কলসি, কাঠের বাক্স, সবই ধরাধরি করে তুলে ফেলল।

তুফান তার বন্দুক আর ক্যাপের বাক্স দুহাতে দুটো চেপে ধরে আতঙ্কে কেবলই বলে—কোথা যাবো ? কোথা যাবো ?

ফতিমা যেন কিছুই রেখে যেতে চায় না। ছোট্ট ডিঙিতে আর কত ধরবে ! তবুও হাঁড়ি-কলসি যেন কিছুই বাদ দিতে চায় না। দুটি মুরগি ছিল। তাদের পা বেঁধে ডিঙির খোলে ফেলে দিল।

তুফান এক-টানা বলেই চলেছে—কোথা যাবো ? কোথা যাবো ?

ফতিমা হন্তদন্ত হয়ে উঠেছে। বলল,—যাবি আর কোথায় ? যাবি যমের বাড়ি !—বলেই নিজের কথায় নিজে ভয় পেয়ে তুফানকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

আর্জান বলল,—খোলে বসো,—বসো এবার। দেখো যেন, তুফোকে বুকে জড়িয়ে রেখো। গরম করে রেখো ওকে। বড্ড পানি পড়ছে। দেখছো তো দমকা হাওয়া !

ফতিমা ডিঙির মাঝখানে ; আর আর্জান গলুইতে বসে লগি মেরে ডিঙি নিয়ে চলেছে। খুব সাবধানে যেতে হবে। চারদিক জলে জলাকার হয়ে গেছে। বিলের জল আর নদীর জল প্রায় একাকার। ভুলক্রমে যদি নদীর জলের টানের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে স্রোতে কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

নদী আর ভেড়ির মাঝে লম্বা লম্বা কেওড়া গাছের সারি। মেঘের ঝিলিকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আর্জান এগিয়ে চলে। ভেড়ি থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত ভিতরে সর্দার-পাড়ার সার-বাঁধা ঘরগুলির মাথা জলের উপর ভেসে আছে। কেওড়া গাছ আর ঘরের মাথার মাঝ দিয়ে লগি মেরে মেরে আর্জান ডিঙি ঠেলতে থাকে। দমকা হাওয়ার দাপটে ডিঙি যেন এগুতে চায় না। প্রায় গলা-জল। 'না ! হলো না।'—বলেই আর্জান জলে নামল। জল ভেঙে ভেঙে ঠেলে নিয়ে চলল ডিঙি।

তুফান মাকে আপ্রাণে জড়িয়ে ধরেছে। একটুও যাতে বৃষ্টি ওর গায়ে না লাগে তার জন্য ফতিমাও কয়েকখানা কাঁথা মুড়ি দিয়ে তুফানকে লেপটে ধরেছে বুকের মধ্যে। কাঁথার ফাঁকে ফতিমা

কিছুই দেখতে পায় না। দেখবেই বা কি? গাঢ় অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দমকা হাওয়ায় কেওড়া গাছের ডাল মড়্‌মড়্‌ করে ওঠে। তবুও কাঁথার আড়াল থেকে বিদ্যুৎ ঝিলিকে ফতিমা দেখবার চেষ্টা করে কতদূর এল। অনেক দূরে কাছারি-বাড়ির আলো মাঝে মাঝে দেখা যায়। আর শুনতে পায় মাঝে মাঝে আর্জানের ভরসা—'ভয় নেই! ভয় নেই!'

হঠাৎ আর্জানের ভয়ার্ত চিৎকার ফতিমার কানে আসে—'গেলাম রে! জন্মের মত গেলাম।' আচমকা ডিঙিখানাও দুলে ওঠে। মুখের কাঁথা ছুড়ে ফেলে ফতিমা দেখে,—কোথাও আর্জান নেই! কোনও আওয়াজও শোনা যায় না। ফতিমা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, 'কোথায় গেলে! কোথায় গেলে!' ফতিমা দাঁড়াতে চায়, তুফান চিৎকার করে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে। কোনও চিহ্ন নেই। ঝিলিকের আলোকে কর্দমাক্ত জলের তোলপাড় ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

আর্জান নেই! ফতিমা হতভম্ব। কি যে করবে। কোথায় যাবে! শুধু চিৎকার করে—কোথায় গেলে? কোথায় গেলে? তুফানও তারস্বরে ডেকে আকুল,—বা'জান! বা'জান!

মায়ের ও সন্তানের চিৎকার মেঘগর্জনে ডুবে যায়। দুজনে যেন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, ডিঙিও যেন দুলে-দুলে ডুবে যায়-যায়। দমকা হাওয়া ডিঙিকে বুঝি এবার ঠেলে নিয়ে যাবে। তুফানকে খোলে বসিয়ে রেখে ফতিমা চিৎকার করতে করতে লগি টেনে ধরল।

মড়্‌মড়্‌ শব্দে কেওড়া গাছের একখানা ডাল ভেঙে পড়ল। ফতিমা লগি মারবে কি করে? দমকা হাওয়া তাকে ডিঙির উপর দাঁড়াতে দেয় না। কিন্তু আর্জান! কোথায় গেল সে? সে নেই! তড়িৎ বেগে চিন্তার পর চিন্তা খেলে যায়—শঙ্খচূড়! শঙ্খচূড়কে সে মেরেছিল। মনসার গায়ে হাত দিয়েছিল। বলিনি তখন!! লোহার বাসরেও কালনাগিনী প্রবেশ করেছিল। আল্লা, এ কি করলে তুমি! শঙ্খচূড়! শঙ্খচূড়ই!......ফতিমা চিৎকার করে উঠল,—কোথায় গেলে, কোথায় গেলে!

লগি মারতে ফতিমা জানে, ডিঙিও চালাতে জানে। ভাটি দেশের মেয়ে-মরদ সবাই নৌকা চালাতে জানে। কিন্তু শাড়ির উপর দমকা হাওয়া লেগে তাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। না, আর না! ফতিমা জলেই নেমে পড়ল। যেমন করে আর্জানও নেমেছিল।

তুফো এবার বা'জান ভুলে 'আম্মা, আম্মা' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মা-ও বুঝি বা'জানের মত চলে যাবে!

ফতিমা যেন আর সহ্য করতে পারে না। গোটাকতক কিল্ বসিয়ে দিয়ে এক ধাক্কা মেরে তুফোকে খোলের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু তুফোর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে দমে গেলে তার চলবে কেন! তখনই উঠে আবার আম্মার কাছে এল। ছোট্ট মুঠি দিয়ে আম্মার বাহু জড়িয়ে ধরল।

ফতিমা বুক-জলে দাঁড়িয়ে ডিঙি ধরে রেখেছে। একটা দমকা হাওয়া চলে গেলে চিৎকার করে ওঠে—কোথায় গেলে! কোথায় গেলে!

ফতিমা এখন কি করবে! কাছারির আলো এক এক ঝলকে দেখা যায়। ডিঙি নিয়ে যাবে সেখানে? তারপর পাড়ার লোকদের ডেকে এনে আর্জানকে খুঁজবে!…···না! তার মন চায় না এই জায়গা ছেড়ে যেতে। আর্জান যাবে কোথায়! মরলেও তো ভেসে উঠবে এইখানেই। তখনও যদি তার প্রাণ থাকে! লক্ষীন্দরও বেঁচে উঠেছিল। না, সে যাবে না। কিন্তু তুফো! ওকে বাঁচাই কি করে! 'কোথায় গেলে! কোথায় গেলে!'—আবার চিৎকার করে ওঠে।

ডিঙি সে যেন আর ধরে রাখতে পারে না। কি একটা যেন আসছে। বিদ্যুতের স্পষ্ট আলোকে পরিষ্কার দেখল, কি যেন একটা ভেসে আসছে। ভ্রূ আর চোখের জল এক হাত দিয়ে মুছে নিয়ে ভাল করে দেখবার জন্য বিদ্যুতের ঝিলিকের অপেক্ষায় থাকে। ওদের ডিঙির দিকেই আসছে। আম্মাকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে তুফো চিৎকার করে বা'জানকে ডেকে উঠল।

খড়ের বোঝা। কে যেন তার গরুর জন্য যত্ন করে রেখেছিল, তাই বানের জলে ভেসে আসছে। ফতিমা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যেমন-তেমন ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক ডিঙি টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

না! এমন করে হবে না! সামনের কেওড়া গাছটার দিকে চলল। গাছ যখন ওখানে আছে, নিশ্চয় ডুব-জল হবে না। গুঁড়ির সঙ্গে গলুইয়ের দড়ি বেঁধে ফেলল। গাছের ওপাশেই নদী। কয়রা নদী। দড়ি ছিঁড়ে একবার ডিঙি নদীর জলে গেলে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই! ভাটির দেশের মেয়ে তা জানে। জোর করেই বাঁধল। জলরাশির মাঝে আর্জানকে সে খুঁজে বের করবেই! ডিঙি হয়ত বাঁধন মানবে,······কিন্তু তুফো!

ডিঙি ছেড়ে এক পা যেতেই তুফো পাগল হয়ে উঠল। ফিরে এল ফতিমা। জলে দাঁড়িয়ে ডিঙির গলুইতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তুফো এবার মায়ের চুলের মুঠি টেনে ধরেছে।

* * *

'—আয়! শীগ্‌গির ডিঙি নিয়ে আয়! আয়!' —ডাক শুনতেই ফতিমা সচকিতে মাথা উঁচু করে। একটানে বাঁধন খুলে ডিঙি নিয়ে চলল শব্দ লক্ষ্য করে।—আছে,······আর্জানেরই যেন গলা! আল্লা! আছে আর্জান, এখনও বেঁচে আছে!

উঁচু ভিটের মাটি পায়ে ঠেকতেই আর্জান হাঁটু গেড়ে খুঁটি নিল। কুমির থম্‌কে গেছে। খুঁটি পেয়ে আর্জান ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। মাত্র কোমর-জল এখানে। কুমিরও জলের উপর ভেসে ওঠে, কিন্তু দাঁতের কামড় এতটুকুও শিথিল করতে চায় না। তা হোক! আর্জানের চিন্তা, খুঁটি তাকে ভাল করে নিতে হবে। ভিটের মাটিতে ভাল করে পা বসিয়ে দিয়ে ডিঙির জন্য চিৎকার করে উঠল,—আয়! শীগ্‌গির এদিকে আয়!

ছোট কুমির। ডান হাতের বাহু আর পিঠের ডানার মাংসপেশী একত্রে কামড়ে ধরে একটানে জলের তলে নিয়ে গিয়েছিল। শিকারী আর্জান জ্ঞানহারা হয়নি। লড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জলের নিচে অন্য হাত দিয়ে মারবার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি।

জলের ভিতর সে তখন ভাসছিল। কুমির তাকে মুখে করে শোঁ শোঁ করে নিয়ে চলেছিল! লড়বে কি করে সে? কোনও খুঁটি তার নেই। একবার জলের উপর ভাসিয়ে তুলেছিল। কিন্তু দম নিতে না নিতে আবার জলের তলে নিয়ে যায়।

হঠাৎ যেন আর্জানের পায়ে একবার মাটি ঠেকে। কুমির চলেছিল মাঠের দিকে। দুই বাড়ির মাঝ দিয়ে সে যাবে। সামনে ছিল একটা পুরনো পোড়ো ভিটে। বিলের এত খবর কুমির জানবে কি করে?

কুমির ছোট হলে হবে কি, লেজের জোরে হেঁচকা টান দেবার চেষ্টা করে। আর্জানও এবার নিচু হয়ে বেঁকে হেঁচকা টান সামলাবার চেষ্টা করে।

কাছে আসতেই আর্জান ফতিমাকে বলল,—ডিঙিতে উঠে নে,··· পানিতে না, পানিতে না!

কোনমতে গলুইতে বুক লাগিয়ে ফতিমা ডিঙিতে উঠে লগির খোঁচায় এগিয়ে গেল। তুফো বা'জানকে দেখে খোলের মাঝে এক-একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এক-একবার দাঁড়ায় আর ধপাৎ করে পড়ে যায়। বাঁ হাতে তার বন্দুকটি ধরাই আছে।

ডিঙি কাছে পেতেই আর্জান বাঁ হাত দিয়ে গলুই জাপটে জড়িয়ে ধরল। দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে বলে ওঠে,—মার্ শালাকে! শালাকে মার্!

লম্বা লগি দিয়ে ফতিমা দড়াম্ দড়াম্ পিটতে থাকে কুমিরকে।

এক-একবার যেই কুমির তার টান শিথিল করে, অমনি আর্জান গলুই ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে দমাদম্ ঘুষি মারে তার নাকে মুখে। আবার কুমির হেঁচকা টান দিতে গেলেই গলুই জড়িয়ে ধরে আপ্রাণে! মুখে তার গালি। ফতিমাকে বলে,—মার্ চোখে মুখে! গুঁতো মার্!

তুফানও যেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ছোট্ট বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে কুমিরের দিকে। গুলি করে ওকে সে মারবে!

ক'জনে মিলে এই সংগ্রাম ও চিৎকার চলে। কিছুক্ষণ পরেই কুমির হঠাৎ কামড় ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

কুমির ছাড়তেই রক্তের স্রোত আর্জানের গা বেয়ে পড়তে থাকে। যেন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়তে চায়। হাত দিয়ে চেপে ধরবার চেষ্টা করে ক্ষতস্থান।

শরীর অবসন্ন। তা হোক। বাঁচবার তার শেষ চেষ্টা করতে হবে। তখনই জলের তলে ডুব দিয়ে একতাল মাটি তুলল। কুমিরের দাঁতে তার বাহুতে তিনটি ও পিঠের মাংসে তিনটি বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। তখনও তা দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত ঝরছে। সজোরে সেখানে কাদামাটি চেপে দিল। মাটি ঠেসে চেপে ধরে কোনমতে ডিঙিতে উঠল। দেহের শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে এসেছে। গলুইতে এলিয়ে শুয়ে পড়ে বলল,—কাঁথা ছিঁড়ে বাঁধ্‌। জোরে বাঁধ্‌।

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে। জ্ঞান সে হারাবে না। তাই বুঝি যন্ত্রণায় জোরে চিৎকার করতে থাকে। তার ভয়, পাছে সে অজ্ঞান হয়ে যায়!

ফতিমা হন্তদন্ত হয়ে যত চেপে সম্ভব বেঁধে দিল। একটু পরে লগি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল,—এবার তাহলে চলো কাছারি-বাড়ি?

আর্জান যেন আর্তনাদ করে ওঠে,—খবরদার! ডিঙি একটুও সরাবি না। খবরদার! একটুও না!

দম নিয়ে আবার বলে,—ডিঙি একটু সরিয়েছিস্‌ কি রক্ষা নেই, ও-শালা আবার আসবে! পলাতকের রক্ষা নেই!

ফতিমা অবাক হয়ে বসে পড়ে। লগি পুততে থাকে। তুফান আর্জানের গায়ের কাছে বসেছে। তাকে স্পর্শ করে আর্জান ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

বৃষ্টিতে তুফান ভিজে ভূত হয়ে গেছে। আর্জান এবার আস্তে আস্তে বলল,—ওরে! একদম ভিজে গেছে। বাক্স থেকে কাঁথা নিয়ে

ওকে জড়িয়ে রাখো। রাত যেটুকু আছে এখানেই থাকতে হবে। তা না হলে ডিঙি ছাড়লেই শালা পিছু নেবে। নিকটেই আছে। ভয় পেলে রক্ষা নেই! ঐ না কাছারির আলো দেখা যায়? তা হোক, নড়ো না। এখান থেকে একটুও নড়বে না।

ধীরে ধীরে ঝড় ও বৃষ্টি কমে আসে। রাতও শেষ হয়ে আসে। পুব আকাশে আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। আর্জান জোর করে উঠে বসে চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, —চলো, এইবার চলো। দেখো, শালাকে তবুও বিশ্বাস নেই! পিছনের দিকে নজর রেখো।

কাছারি আসতেই সবাই ধরাধরি করে আর্জানকে তুলল। সারারাত সবাই আর্জানের কথা বলেছে। অল্প জায়গায় অত লোক। সবাই বসেই ছিল। কারও ঘুম নেই। সবাই যার যার ঘরদোরের চিন্তায় ব্যস্ত। তাছাড়া ভাটির টানে জল কমে এলেই সকলকে ভেড়ি মেরামতের কাজে হাত দিতে হবে। ছয় ঘণ্টার মধ্যে ভেড়ির মেরামত না করতে পারলে, লোনা জলে আবার মাঠ ভরে যাবে।

ঝাড়ফুঁক যে যা জানে তা আর্জানের উপর করতে লাগল। এমন সময় কাছারির পেছনের বারান্দায় গরুর ভীষণ আর্তনাদ। ঝড়ের আগে যে যার গরুবাছুর ঐ বারান্দায় রেখেছিল। গরুর আর্তনাদ শুনে আর্জান চমকে উঠে বসে বলল,—ঐ, ঐ, শালা এসেছে! ঠিক পিছুপিছু এসেছে!

আর্জানের আশঙ্কা মিথ্যা নয়। হারেজের মোটা ছাগলটাকে কুমিরটা নিয়ে গেল। ভাটার টানে বিলের জল একটু কমে এসেছে। অল্প জলে স্পষ্ট দেখা যায়, —ছাগলটাকে টেনে নিয়ে গেল।

একুশ

কুমিরের কামড়ে আর্জান বেশ কিছুদিন শয্যাগত। কর্মক্ষমতাও নেই। তবু তাকে শয্যা ছেড়ে উঠতেই হবে! ফতিমা আর কতদিন এবাড়ি-ওবাড়ি ঢেঁকির কাজ করে অন্নের সংস্থান করবে? তাই আর্জান একদিন জোর করেই উঠে গেল কাছারি-বাড়ি।

হারেজ সর্দারের সঙ্গে দেখা হতেই আর্জান একথা সেকথা তুলবার পর কাজের জন্য আবেদন জানাল।

হারেজ বেশ তীক্ষ্ণ স্বরেই বলল,—কাজ! ভেড়ির তদারক? বন্যার তোড়ে ভেড়ি তো ভেঙেই চুরমার হয়ে গেছে। ভেড়ি নেই, তো ভেড়ির তদারক! তুমিই তো দায়ী। তুমি যদি ভেড়ি ভাল করে দেখতে, তাহলে কি বাঁধ ভেসে যেত?

অপ্রস্তুতভাবে আক্রান্ত হয়ে আর্জান বলল,—আমি দায়ী! যে-বন্যায় গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গেল, তার জন্য আমি দায়ী! মনে আছে না বড়মেঞা, শঙ্খচূড়ের কথা! রাত নেই দিন নেই ঘুরে বেড়িয়েছি এই ভেড়ির উপর দিয়ে! বুক পেতে এই বাঁধকে রক্ষা করেছি।.........আর আমিই হলাম দায়ী!

যে-আর্জান কোনদিন কথা বলে না, তার মুখে এত কথা শুনে হারেজ থতমত খেয়ে গেছে। অল্প কথায় আলাপ শেষ করবার জন্য কাটা জবাব দিল,—কোনও কাজ আমার হাতে নেই।

আর্জানের ঠোঁট আবেগে কাঁপছে। সংযত হয়ে বলল,—বেশ! —বলেই সে কাছারি ছেড়ে চলে এল।

বাঁধ ভাঙলে অনেক কাজ আছে। কোথাও বাঁধ রিপু করতে হয়, কোথাও নতুন কল বসাতে হয়, কোথাও বা নতুন করে ভেড়ির গাঁথুনি তুলতে হয়। কাজ অনেক, কিন্তু এবার কাছারি নতুন চাল চেলেছে। এতদিন কাছারি থেকেই ভেড়ির সব কাজ করান হতো।

এবার প্রজাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার যেমন জমি আছে সেই হিসাবে পরিমাণ মত তাদের নিজেদেরই বাঁধতে হবে। এতে প্রজারা একভাবে খুশিই হয়েছিল। তাদের আশা, এতে তাদের খাজনা নিশ্চয়ই কমে যাবে। কিন্তু আর্জানের এল সর্বনাশ। আর্জানের কোনও জমি নেই। তাই তার কোন কাজও নেই। এত কাজের মধ্যেও তার কোনও কাজ মিলবে না!

ফতিমা চিন্তিত হল। এইবার বুঝি আর্জান আবার বনকেই ভরসা করে। না, সে কিছুতেই দেবে না আর্জানকে বনে যেতে। কালিকাপুরের ভরসা গেছে, হারেজ সদারের ভরসাও গেছে,—ডাক্তার-আবাদের ভরসাও এবার গেল। ফতিমা এবার মনে মনে ভরসা করে মহেন্দ্র ঘটকের উপর। এবার সে এলেই তাকে বলবে,—তাদের দেশে নিয়ে যেতে। সবাই তারা চলে যাবে। যেমন করে তারা একদিন কালিকাপুর ছেড়েছিল, তেমনি করেই ডাক্তার-আবাদ ছেড়ে চলে যাবে ঘটকের গ্রামে। আর্জানকে নিয়ে সে নির্বাসনে যেতে চায়। এই নির্বাসন সংসার থেকে বনে নয়—বন থেকে সংসারে! আর্জান আবার যেন বনে না যেতে পারে। কোন দিনও না। না, কোনও দিনও না!

* * *

গতবারে আর্জানের কথা অনুযায়ী এবার মহেন্দ্র ঘটক সত্যিই আগে থাকতেই এল। পৌষ মাসেই খটিতে এসে পড়েছে। প্রতি বছর গ্রামে ফিরে সুন্দরবনের কত গল্প করে গাঁয়ের লোকের কাছে। নিজের শিকারের গল্পই বেশি। একবার খটি থেকে যাবার সময় হরিণের মাংস নিয়ে গিয়েছিল এবং গ্রামের সবাইকে খাইয়েছিল।

সেই অবধি গ্রামে মহেন্দ্র ঘটকের নাম-ডাক—খুব বড় শিকারী। কিন্তু এবার একটা বাঘ না মারলে 'বড় শিকারী'র আর সম্মান যে থাকে না!

কিন্তু আর্জান যে-নতুন ফন্দির কথা বলেছিল,—তা সে ভুলেই

গিয়েছিল। ঘটক আসতেই আর্জান ভারি খুশি হল। ফন্দিটা তারও কাছে নতুন। অনেক শিকারীর মুখে এই কৌশলের কথা শুনেছে। তবে এই ফন্দিটা নিজে হাতে করেছে এমন লোকের সঙ্গে তার আজও দেখা হয়নি।

আর্জানের হাতের আর পিঠের ঘা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বড় বড় দাগ হয়ে রয়েছে। ঘটক তা দেখেই চমকে উঠে বলল,—ও কি আর্জান?

আর্জান হাসতে হাসতে বলল,—আর বলেন কেন বাবু! মরতে মরতে বেঁচে গেছি!—বলেই সে কুমিরের আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনাল।

কুমিরের দাঁতের ছটা স্পষ্ট দাগ গুনতে গুনতে ঘটক বলল,—বাঘ-শিকারী তো বাঘের পেটেই যায়, তুমি শেষে কুমিরের পেটে যাচ্ছিলে!

আর্জান বড় বড় গোঁফের ফাঁক দিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে বলল,—না বাবু! বাঘের পেটে আমি যাব বলেই তো বেঁচে আছি!

আর্জান উৎসাহ নিয়ে নতুন ফন্দির তোড়জোড় করতে লাগে। হাট থেকে বড় একটা মাটির হাঁড়ি কিনল। বেশ মজবুত হাঁড়ি। পাকা বেত জোগাড় করে খুর দিয়ে চেঁচে চেঁচে একখণ্ড পাতলা ও চওড়া বেতের ছিল্‌কে বানাল।

ফন্দির কথাটা ঘটককে আজও পর্যন্ত খুলে বলেনি। ঘটক জানবার জন্য ব্যগ্র। জিজ্ঞাসা করলেই আর্জান বলে,—হবে, হবে,—বলব!

না বলার কারণ ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে ছেলেমানুষি করলে বিপদ হতে পারে।

কয়েকদিন পর আর্জান বলল,—এবার সব তৈরি। শুধু খেয়াল রাখবেন, কবে বাঘ ডাকে। সন্ধ্যার দিকেই খেয়াল রাখবেন। কোন দিকে ডাকছে তাও কিন্তু খেয়াল থাকে যেন।

ঘটক আবাদে আসার পর কয়েকবার আর্জানের বাড়িতে এসেছে। এলেই ফতিমা আর্জানের আড়ালে ঘটককে মনের কথা খুলে বলত।

তাদের সবাইকে ডুমুরিয়া গ্রামে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করত।—মনে মনে চলে যাবার যতই ঠিক করুক না কেন, 'নির্বাসনে যাবার' কথাটা মুখ ফুটে বলতে ফতিমার বাধত। তবু সে বারবার বলত।

ঘটক প্রশ্ন করত,—কেন? কেন তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ?

উত্তরে ফতিমা শুধু ওপারের বনটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত।

ঘটক বুঝিয়ে বলে,—আরে মাছকে জল থেকে তুলে নিলে কি বাঁচে? বন!.........বনকে আর্জান কি ভালবাসে জানো?

বনের নাম শুনতেই ফতিমা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে,—না,—না,—বন চাই না! আমাদের নিয়ে যেতেই হবে। যাব আমরা এদেশ ছেড়ে দূরে.........বহুদূরে!

দু-একদিন যেতে না যেতেই একদিন সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ডেকে উঠল। খুবই কাছে। ওপারে বনের একটু ভিতরে। ঘটক তখন একাই খটিতে। তাড়াতাড়ি আর্জানকে খবর দিতে চলল। সিকি মাইল পথ। চারদিকে অন্ধকার। ওপারে বন। বাঘ ঘন ঘন ডাকছে। বনে এই রাত্রে বাঘের সন্ধানে উঠতে হবে! ঘটকের বুক কেঁপে উঠল। কেমন করে এই সিকি মাইল ভেড়ির পথ পেরিয়ে আর্জানের বাড়ি পৌছবে! বন্দুকটা সঙ্গে নিল। দুটি গুলিও পুরে নিল।

প্রায় এক নিশ্বাসে এই দীর্ঘ পথ দৌড়ে আর্জানের বাড়ি হাজির।

—আর্জান! আর্জান! আর্জান!

—শুনেছি, শুনেছি, আমিও শুনেছি—বলেই আর্জান বাইরে এল।

ঘটক আলোতে এলেই আর্জান বলল,—এ কি করেছেন? বন্দুকের ঘোড়া তুলে রেখেছেন! শীগ্‌গির ঘোড়া নামান।

নিজেই বন্দুকটা নিয়ে আর্জান ঘোড়া নামিয়ে বলল,—কিন্তু বন্দুক এনেছেন কেন?

—কেন? শিকারে যাবে না এখন? বাঘ যে ডাকল!

—পাগল নাকি ! বাঘ ডাকলেই বাঘের পিছনে যাওয়া যায় ! এই রাত্রে !

—তবে ?

—তবে আর কি ! কাল যেতে হবে। তবে ঠিক রাখবেন কিন্তু, কোন্ দিকে বাঘ ডেকেছে।

—কিন্তু তোমার ফন্দিটা কি ?

—হবে, পরে হবে, বলব !

পরদিন বিকাল চারটা নাগাদ আর্জান ও মহেন্দ্র ঘটক একটা ডিঙি নিয়ে চলল। ডিঙিতে শিকারের সাজসরঞ্জাম সবই নেওয়া হয়েছে। এই নতুন কায়দায় শিকার হবে, কি হবে না—তা আর্জান জানে না। সেজন্য এপর্যন্ত কাউকে সে বলেনি।

ডিঙি ছেড়ে দেবার পর আর্জান ঘটককে বুঝিয়ে বলল—তার ফন্দিটা কি। হাঁড়ির নিচে গাছ-কাটা দা-এর মাথা দিয়ে কুরিয়ে কুরিয়ে একটা ফুটো করেছে। নিচে দিয়ে বেতের ছিল্‌কের মাথা ঢুকিয়ে হাঁড়ির ভিতর দিয়ে লম্বা করে বের করল। তারপর ছিল্‌কের নিচের দিকে বড় বড় গিঁট দিল। যাতে টানলে বেরিয়ে না আসে।

হাঁড়িটা ঘটককে দিয়ে বলল,—এবার হাঁড়িটা দু-পা দিয়ে চেপে দাঁত দিয়ে জোরে বেতটা টেনে ধরুন।

—তারপর ?

—বলছি, তারপর !

ঠিকভাবে ধরে আর্জানের কথামত একখানা ভিজে নেকড়া নিয়ে হাঁড়ির ভেতর থেকে বেতের উপর চেপে টান দিতেই ব্যাঘ্র-গর্জনের আওয়াজ বেরুল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,······

আর্জান বলল,—না, ঠিকমত হলো না। প্রথম দু-তিনবার জোরে হবে, তারপর ঘন ঘন হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। থাক্, এখানে আর দরকার নেই। জায়গা মত গিয়ে করা যাবে।

—কিন্তু জায়গা মত বাঘ আসবে কেন ? সে তো কাল রাত্রে ডেকেছিল এখানে। এতক্ষণে কোথায় চলে গেছে তার কি ঠিক আছে ?

—না, ঠিক যে পথে কাল বাঘ গেছে, ঠিক সেই পথেই ফিরবে, ফিরতে ও বাধ্য।

বছরে এই সময়ে বাঘ ডাকতে শুরু করে বাঘিনীর জন্য। শীতের শেষ দিকে বসন্তের মুখে হালকাভাবে খেলাধুলা করবার জন্য বাঘ ও বাঘিনী পাগল হয়ে ওঠে। বাঘিনীর দেখা পাবার জন্য বাঘ বন থেকে বনান্তরে ডাকতে ডাকতে যায়। কিন্তু ঠিক যে-পথে যাবে, ঠিক সেই পথেই ফিরবে। নিজের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরবে। এতটুকু এপাশ ওপাশ হবে না।

এরই সুযোগে সুন্দরবনের মানুষেরা 'কল-পাতা' শিকার করে। বাঘ যে-পথ দিয়ে চলে গেল সেখানে একটা বন্দুক রেখে আসবে। একটা তে-কাঠার উপর এক বিঘৎ আট আঙুল উঁচু করে বন্দুকের নলটা রাখে। তারপর টিপের সঙ্গে কালো সুতো বেঁধে বাঘের পথের উপর আড়াআড়িভাবে একটু উঁচু করে টানা দিয়ে আসে। ফিরবার সময় বাঘের পায়ে লেগে সুতোয় টান লাগতেই বন্দুকে চোট্ হয়ে যায়।

এই পন্থাকে এদেশে 'কল-পাতা' বলে। এতে কোন সময় বাঘ মারা পড়ে, কখনও বা পড়ে না। মাপজোখ একটু গোলমাল হলেই চোট্ হলেও গুলি বাঘের গায়ে লাগে না। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আবাদের লোকে বলে,—এই জানোয়ার এমন চতুর যে কল-পাতা হয়েছে সন্দেহ করলেই সে মুখে ডাল-পালা নিয়ে এগুতে থাকে। তাতে কালো সুতোটা কাঠিতে লেগে আগেই চোট্ হয়ে যায়।

আর্জানের নতুন পন্থায় কিন্তু অত হিসাব-নিকাশের দরকার নেই। বাঘের থাবার খোঁচ খুঁজবারও আবশ্যক নেই। মোটামুটি কোনদিক থেকে কোনদিকে গেছে তা গত রাত্রের ডাক থেকেই বুঝে নিয়েছে!

সেই আন্দাজে বনে উঠল। ডিঙিখানা দূরেই রাখল। ডিঙি দেখে বাঘের সন্দেহ হতে পারে। একবার সন্দেহ হলেই বাঘ সাবধানী হয়ে পড়বে।

হাঁটতে হাঁটতে নদীতে একটা বড় খালের মুখে গেল। বাঘ

দক্ষিণমুখো গেছে ; কাজেই আর্জান উত্তর পাড়ে খালের মোহানার কোণে রলাসুন্দরীর ঝোপের আড়ালে বসল।

ঝোপের আড়ালে বসল বটে, কিন্তু একদম খালের মুখেই। যাতে খালের ওপার বেশ পরিষ্কার দেখা যায় ; বন্দুকের নলের মুখও যাতে এপাশ-ওপাশ ঘোরান যায়। আর্জান এবার হাঁড়ি আর বেত নিয়ে ব্যাঘ্র-গর্জন আরম্ভ করল। ঘটক বন্দুক হাতে তৈরি হয়েই আছে।

বড় নদীতে বেশ হাওয়া দিয়েছে। সেই হাওয়ায় নকল ব্যাঘ্র-গর্জন ভেসে যেতে লাগল। নদীর ওপার থেকে তার প্রতিধ্বনি আসতে থাকে। ঘটকের মাঝে মাঝে ভ্রম হয়, ঐ বুঝি বাঘের উত্তর। প্রথম প্রথম ঘটকের মজাই লাগছিল,—খেলার মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু যতই দেরি হতে থাকে ঘটকের শঙ্কা বাড়তে থাকে। বাঘের আক্রমণের নানা ছবি তার মনে ভেসে ওঠে।

শঙ্কা বাড়ুক, তবু সে শক্ত হয়ে আছে। ভরসা তার মনে, সামনে পঞ্চাশ-ষাট হাত চওড়া খাল। বাঘের আসতে হলে খাল পার হতে হবে। আর্জান বলেছে, বাঘ ঐ দিকে গেছে, ঐ দিক থেকেই আসবে।

আর্জান একটু ব্যঙ্গস্বরে বলল,—অমন করে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে না! বাঘ তো আর শিকারে আসছে না যে অমন করে চুপিসারে আসবে! বাঘ আসছে আজ অভিসারে!

ঘটক কোন উত্তর দেয় না। ঢোক গিলে আবার স্থির হয়ে বসে।

আর্জান 'বাঘ-ডাকছিল' প্রথম প্রথম চার-পাঁচ মিনিট অন্তর। আস্তে আস্তে ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার দশ বা পনেরো মিনিট অন্তর ডাকছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। সূর্যের আলো কোথাও নেই বললেই হয়। গাছের মাথায় হয়ত বা কোথাও এক-আধটু স্তিমিত রৌদ্ররেখা তখনও আছে। ডান দিকে বড় নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি তখনও শুভ্র রঙে চক্‌চক্ করছে, কিন্তু সামনের খালের জলে বনের ছায়ায় অন্ধকার নেমে আসে।

আর্জান ঘটকের গায়ে হাত দিয়ে বলল,—শুনলেন, অনেক দূরে একটা আওয়াজ?

ঘটক কথার উত্তর না দিয়ে বন্দুকের ঘোড়া তুলতে যায়।

—না, না, এখন ঘোড়া তুলবেন না!—বলেই আর্জান হাত দিয়ে থামিয়ে দিল।

আর্জান এইবার একটানা কয়েকবার ডাক দিল। ডাক থামাতেই বাঘের উত্তর এবার স্পষ্ট শোনা গেল। শুধু স্পষ্ট নয়, সে ছুটে আসছে।

ঘটকের বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে। লজ্জায় তা সে এখনও বলতে চায় না। কার কাছে বলবে? আর্জান? তার চেহারা পাল্টে গেছে। মানুষ যেমন রেগে উঠলে তার চেহারা পাল্টে যায়, বাঘ নিকটতর হতেই আর্জানের চেহারাও তেমনি পাল্টাতে থাকে। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেছে। হাত পা ইশ্‌পিশ্‌ করতে থাকে, যেন কি একটা করবে! তীব্র ও প্রখর দৃষ্টি। সে-দৃষ্টিতে যেন আশেপাশের কোন কিছুই ছায়াপাত করে না। আর্জানের যেন অন্য কোনও কিছুরই অনুভূতি নেই! গাছপালা, ঝোপ, খাল, মহেন্দ্র ঘটক—কোনও কিছুরই যেন অনুভূতি নেই। ঘটকের কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহসও হয় না।

বাঘ চলে এসেছে। আর্জান তবু আরেকবার বেতে টান দিয়ে ভীষণভাবে গর্জন তুললো। ওপারে ঝোপের পেছনেই বাঘ। আর্জান দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝবার চেষ্টা করে বাঘের মতলব। বাঁ হাত দিয়ে ঘটকের ডান হাত চেপে ধরে, যেন ঘোড়ায় সে হাত না দেয়। ঘটকের হাত যেন শক্ত হয়ে আসছে। এক ঝাঁকানি দিয়ে আর্জান তার চেতনা এনে দিল।

না,—বাঘ সামনা সামনি পার হবে না। খালটি বনের ভিতর গিয়ে হঠাৎ বেশ সরু হয়ে গেছে। আর্জানের বুঝতে বাকি রইল না, সেখান থেকেই বাঘ খাল পার হবে। বাঘ সেদিকেই গেল।

একটানে আর্জান ঘটকের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল। কেড়ে নিয়েই ডান হাতে বন্দুক আর হাঁড়ি নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে ঘটককে টানতে টানতে জলে নামল।

একবার শুধু চাপা গলায় বলল,—ওপার।

সাঁতরে ওপারে গিয়ে ঘটকের যেন একটু সম্বিত ফিরে এসেছে। আবার ঝোপের আড়াল। বন্দুক আর্জানের হাতে। ঘটককে ইঙ্গিতে হাঁড়ি নিয়ে আওয়াজ করতে বলল।

ঘটক যেন আওয়াজ বের করতেই পারে না। কেমন যেন হয়ে গেছে! টানতে গিয়েই হাত থেমে যায়। আবার টানতে যায়, আঙুলে যেন জোর নেই।

ওপারে ঠিক যে জায়গায় আর্জানেরা ছিল, সেখানেই বাঘ ছুটে এল। ছট্‌ফট্ করছে। একবার ডাকছে, একবার গোঁ গোঁ করছে। কোথাও একমুহূর্ত দাঁড়ায় না। এই এদিকে মুখ বাড়িয়ে অপর পারে তাকায়, আবার ওদিকে ছুটে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে।

আর্জান অনুমান করল,—আর দেরি করা উচিত হবে না। দেরি করলেই আবার ঘুরে খালপার হয়ে এপারে আসবে।

কিন্তু গুলি করবে কি করে। ছট্‌ফট্ করছে। শরীরের সর্ব অঙ্গ যেন ওর দুলছে। একসেকেণ্ড ও স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। মত্ত হয়ে উঠেছে। এ-কে আর্জান রুখবে কি করে! ঘায়েল করার মত গুলি না করতে পারলে রক্ষা নেই—এই মদমত্ত বাঘের সামনে!

আর্জান বেপরোয়া হয়ে উঠল। ওকে আবার ঘুরে খাল পার হতে দেব না! একই মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐ মত্ত বাঘের মুখোমুখি হলে রক্ষে নেই! তাড়াতাড়ি বন্দুক রেখে দিল মাটিতে। হাঁড়িটা ঘটকের হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজেই বেতে টান দিয়ে আওয়াজ তুলল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ……

বাঘিনীর দেখা পাবার আশায় বাঘ উন্মত্ত! ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ঘটক জলের শব্দ শুনেই আর্জানের পেছনে আড়াল নিল। আর্জান তবুও বন্দুক হাতে নেয় না। তীরবেগে সাঁতরে আসছে। জলের উপর নাক-মুখ-চোখ দেখা যায়। গুলি করলেও করা যেত! কিন্তু যদি, ………না, কোনও 'যদি' নিয়ে এই উন্মত্ততার সামনে খেলা করতে আর্জান রাজি নয়! সেও বেপরোয়া—সেও উন্মত্ত! বন্দুক মাটিতেই

পড়ে রইল। হাঁড়িতে আবার টান দিল। বাঘ যেন একটুও এদিক-ওদিক না যায়! সোজা তার কাছেই আসে।……খালের অর্ধেক সাঁতরে এসে গেছে।

এবার আর্জান হাঁড়ি ফেলে দিয়ে নিজের মুখেই ব্যাঘ্র-গর্জনের মত আওয়াজ করতে লাগল। আর্জান গর্জন করতে করতে বন্দুক হাতে নিল। ঘোড়া তুলতে তুলতে হিংস্র উন্মত্ত জানোয়ার এপারের মাটি স্পর্শ করেছে। তা করুক! জল থেকে আরও উপরে উঠুক! সামনেই পলিমাটির কাদা। বাঘের গতি একটু মন্থর। আর্জানের থেকে মাত্র পনেরো হাত দূরে!

আর্জানের চোখোচোখি হতেই মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য যেন মদমত্ত বাঘ অবাক হয়ে তাকায়,—হিংস্র চোখের চঞ্চল ভ্রূ যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায়! আর্জান টিপে টান দিল। গুলির আঘাতে একটু টলতেই আর্জান দ্বিতীয় গুলি করল। চোখের ধার দিয়ে মাথার খুলির একটা অংশ ছিটকে পড়ে গেল। চার হাত পা কাদায় দেবে ছিল ; সেখানেই ঢলে পড়ে গেল।

আর্জানের গা-হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। সে আর দাঁড়াতে পারে না। যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল।

……আর্জানকে স্থির হতে দেখে ঘটকের সাহস ফিরে আসে। প্রশ্ন করল,—কি হলো আর্জান ?

—সাবাড়!—আর্জানের এর বেশি কথা বলবারও যেন শক্তি নেই।

ঘটক একবার ভাল করে শায়িত বাঘকে দেখে নিয়ে আর্জানকে বলল,—নাও, একটু বিশ্রাম করে নাও।

—না না, বিশ্রাম করলে হবে না। ওখানে পড়ে থাকলে কোন্ সময় কুমির এসে নিয়ে চলে যাবে তার ঠিক নেই!

একটু পরেই দুজনে মিলে বাঘের লেজ ধরে টেনে খালের জলে ফেলে টানতে টানতে বড় নদীর মুখে নিয়ে এল।

দুজনে মিলে এবার টেনে চরের উপরে তুলবার চেষ্টা করে।

পারে না। কোনমতে জলের একটু উপরে তুলে আর্জান বলল,—থাক্, এইখানেই থাক্। এবার বসে একটু অপেক্ষা করা যাক।

—কিন্তু ডিঙি আনতে হবে না?

—না, ডিঙি এনে এ বাঘ ডিঙিতে তুলবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তার চেয়ে একটু অপেক্ষা করি। নদীতে জো এসেছে। কাঠুরে-নৌকা দু-একখানা এ-পথ দিয়ে এখন যাবেই। তাদের ডাকলেই হবে।

বন্দুকটা ঘটকের হাতে দিয়ে আর্জান বলল,—তবে গুলি ভরে রাখতে হবে। জলের ধারেই পড়ে রইল। বড় নদী তো, কুমিরের ঠাহর পেতে আর কতক্ষণ।

আর্জান ও মহেন্দ্র ঘটক পাশাপাশি বসল। নদীর বুকে তখনও ঘন অন্ধকার নেমে আসেনি। বনে কিন্তু অন্ধকার। বাঘের তর্জন-গর্জনে এ মুল্লুকে আর কোন জীবজন্তু নেই। আর্জান তাই নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শান্ত হয়ে থাকবার পর ঘটক বলল,—কি দুর্জয় সাহস তোমার, আর্জান! কি লড়াইটাই না তুমি করলে এই হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে! কোথাও এতটুকু পিছপা হলে না! কিন্তু কোথায় তোমার এই সাহস লুকানো আছে? আবাদে তোমার এই চেহারা তো কোনও দিন দেখিনি! বাদায় তুমি দুর্দমনীয় কিন্তু,······

দুজনেই চুপচাপ। আর্জানের মুখে তৃপ্তির প্রশান্ত হাসি। আর্জানের কানে 'কিন্তু' কথাটা বিঁধে ছিল। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল,—কিন্তু কি?···

—বাদায় তুমি দুঃসাহসী কিন্তু আবাদে তুমি অমন নিরীহ কি করে হও?

—ও। থাক্ ওসব কথা।······এখন যে রাত হয়ে এল। কোনও নৌকার যে দেখা নেই! তার চেয়ে এক কাজ করুন,—আমি ডিঙিখানা এনে দিচ্ছি। আবাদে গিয়ে লোকজন আর একখানা বড় নৌকা নিয়ে আস্থন।

*　　　*　　　*

ঘটক ডিঙি নিয়ে ডাক্তার-আবাদে যেতেই হৈচৈ পড়ে গেল। দেখতে দেখতে গ্রামের প্রায় সকলেই জড় হয়ে পড়েছে আর্জানের ঘাটেই। সবার মুখে আর্জান ও মদমত্ত বাঘের কথা। যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। সবাই বনে আসতে চায়। একখানা,—দুখানা,—তিনখানা নৌকা ভরে গেছে লোকে। এ যেন জয়যাত্রা!

ফতিমা দাঁড়িয়ে ছিল তুফোকে কোলে করে বাঁধের উপর। ঘটক ফতিমার কাছে ছুটে এসে তুফোর গালে হাত দিয়ে বলল,—জানিস্! তোর বা'জান এ—ই এ—তো বড় বাঘ মেরেছে। ভী—ষ—ণ বাঘ। তোর বা'জান মেরেছে। যাবি? যাবি?

তুফো চিৎকার করে ওঠে,—বা'জান! বাঘ! বা'জান! বাঘ! —সে যেন থামতেই চায় না। জোর করে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়ল। গুটিগুটি পায়ে ছুটে যেতে চায় নৌকায়। সে-ও আজ বনে যাবে!

ফতিমা? সে-ও বুঝি পারে না নিজেকে সামলাতে! পরাজয়! সে-ই না চেয়েছিল বনের বন্ধনকে ছিন্ন করতে? চেয়েছিল না আর্জানকে বন থেকে ছিনিয়ে নিতে? পরাজয়ের প্লাবনে মনের বাঁধ আজ বুঝি ধ্বসে যায়! চোখ দিয়ে তার দু-ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে। আনন্দে না পরাজয়ে, তা সে জানে না। সারা বন,—গোটা আবাদের মানুষ যেন আজ তাকে বনের দিকে ডাকে!

নৌকার পাশেই চরের কাদায় ঘটক দাঁড়িয়ে ছিল। তুফো ছুটে গিয়ে কাদার মধ্যে তার হাত জড়িয়ে ধরেছে। সে যাবেই বনে!

ফতিমা দূর থেকেই দেখে। এই ঘটকই না ছিল বনের মায়া কাটাবার তার শেষ ভরসা! হঠাৎ সে ঝাঁকি দিয়ে আঁচল গুটিয়ে ছুটে যায় তুফোর কাছে। পরাজয়ের গ্লানি মুখ থেকে মুছে ফেলে দিয়ে তুফোকে জড়িয়ে ধরে ঘটককে শুনিয়েই বলে,—চল্ তুফো! আমিও যাব!

* * *

ঘটক চলে যাবার পর আর্জান এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে একা চুপচাপ বসে আছে। সামনেই রক্তাক্ত বাঘ পড়ে আছে। ঘটকের প্রশ্ন তার মনে পড়ে যায়—'বাদায় তুমি দুঃসাহসী কিন্তু আবাদে তুমি এমন নিরীহ কি করে হও!'—এ-প্রশ্ন তো আগে কেউ তাকে করেনি। নিরীহ? সে সত্যিই তো নিরীহ! তার জমির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে তার ভিটের কথা, হেঁতাল গাছের কথা, মায়ের কবরের কথা। হ্যাঁ, সে নিরীহ। সবই তার গেছে, তবুও কাউকে কিছু বলেনি।······না—না—না—সে নিরীহ নয়! ঘটকই না তাকে বলেছিল মাকড়সার জালের কথা! একলা কেউ একে ছিন্ন করতে পারে না। সে-ও বুঝি একলা বলেই হারিয়েছে তার ভিটে, তার মাটি। না—না, সে নিরীহ নয়। বাঘ হিংস্র, বাঘ দুর্জয় সাহসী। একা পেয়েই সে তাকে শিকার করেছে। বাঘ একা তাই সে মরে—তাই সে ফাঁদে পড়ে!······না—না, সে নিরীহ নয়! বাঘের লেজটা সামনে পড়ে ছিল। হাতের মুঠোয় তা শক্ত করে চেপে ধরে আর্জান অনুভব করে নিজের পরাক্রমের শিহরন!······ না—না, সে ভীরু নয়!